৭ নবেম্বর ইতিহাসের মোড়

সংকলন ও সম্পাদনা
আমানুল্লাহ কবীর
ও
ড. সাঈদ-উর রহমান

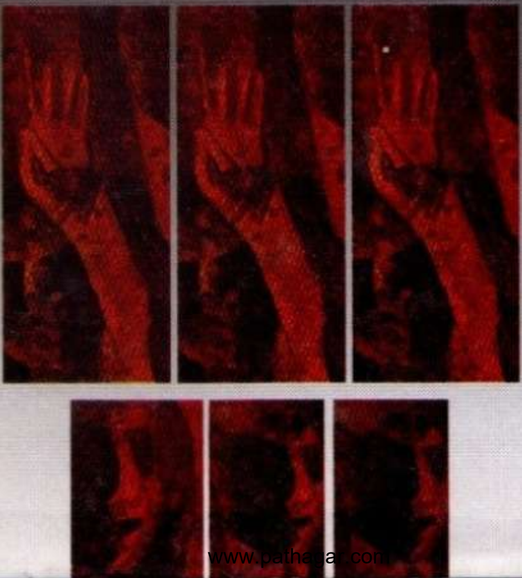

www.pathagar.com

আমানুল্লাহ কবীর পেশায় সাংবাদিক। শুরু পাকিস্তান আমলে ১৯৬৯ সালে। বাংলা পত্রিকায় আরম্ভ হলেও ১৯৭১ সাল থেকে জড়িত ইংরেজী সাংবাদিকতার সাথে। অধুনালুপ্ত 'দি পিপল'-এ যখন কাজ করেন তখনই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী হামলা করে 'দি পিপল' অফিসেও। অল্পের জন্য বেঁচে যান। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ঢাকা নগরী ছেড়ে আত্মগোপন করেন জামালপুরের গ্রামের বাড়িতে। এরপর সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে।

স্বাধীনতার পর 'দি পিপল' আবার আত্মপ্রকাশ করলে তিনি যোগদান করেন সেখানে। এরপর বাংলাদেশ টাইমস্, নিউ নেশন, টেলিগ্রাফ, ডেইলি স্টার ও সর্বশেষে ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এ কাজ করেন। রাজনীতির শিকার হয়ে তাঁকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছাড়তে হয়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক। গত বছরের অক্টোবরে বেগম খালেদা জিয়া সরকার তৃতীয় বারের মতো ক্ষমতায় এলে তিনি এ পদে নিয়োগ পান।

তার লেখালেখির সূচনা সাহিত্য-চর্চার মধ্য দিয়ে। প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন, এখনো মাঝে-মধ্যে লিখেন। গল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন বেশ কিছু। পরবর্তীকালে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখালেখির ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েন – বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই। আমানুল্লাহ কবীর দীর্ঘদিন সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। প্রথম জীবনে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি সে অনুরাগ এখনো আছে।

ড. সাঈদ-উর রহমানের জন্ম কুমিল্লা জেলার সদর থানার শিমপুর গ্রামে, ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ (প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি)। লেখাপড়া করেছেন গ্রামের পাঠশালা, কুমিল্লা জিলা স্কুল, সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেধার ছাপ রেখেছেন সর্বত্র ঃ বাংলা কবিতার সঙ্গে রাজনীতি-সংস্কৃতির সম্পর্ক অনুসন্ধান করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৭৯ সালে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা সম্পর্কে কৌতূহলীদের কাছে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য আকর হিসেবে বিবেচিত। অনুবাদ, সম্পাদনা ও মৌলিক বই মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা এক ডজনের অধিক।

বাকশালী দুঃশাসনে নির্যাতিত সাঈদ-উর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর– বাকশালের পতনের পরপর। প্রফেসর পদে উন্নীত হন ১৯৯১ সালে, বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিন বছর, ১৯৯৭ থেকে ২০০০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে–১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে।

সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশার বাইরের লেখা মূলত সেসব বিষয় নিয়ে। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য তথ্যনির্ভরতা, সারল্য ও সংক্ষিপ্তি।

www.nagorikpathagar.org

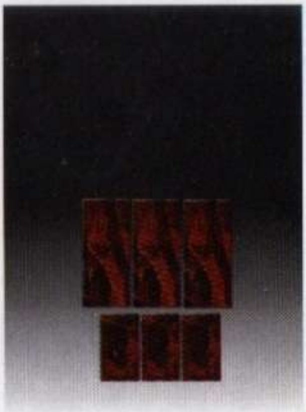

বাংলাদেশের ইতিহাসে ৭ নবেম্বরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ঐ দিনের সিপাহী-জনতার মিলিত আন্দোলন আমাদেরকে ও বিশ্ববাসীকে সচেতন করেছে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে। সেজন্য, বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী মহল বিচলিত হয় ঐ দিনের উল্লেখে। পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) ধরে ক্ষমতায় থাকার সুবিধা ও সুযোগের অপব্যবহার করে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ৭ নবেম্বরের শুধু গুরুত্ব বিনষ্ট করতে নয়, বরং একে কলংকিত করতে! তারা সফল হয়নি।

সেই পটভূমিতে খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ব্যাখ্যা নতুনভাবে করতে। সেকারণেই এই সংকলনের পরিকল্পনা। এদেশের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও অভিমত একত্রে জানার জন্য তাঁদের রচিত রচনাগুলো একত্র করা হয়েছে। এদের বাইরেও অনেক রয়ে গেছেন, সময়ের অভাবে যাঁদের রচনাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। তবু, সংকলনের রচনাগুলো পাঠ করে মোটামুটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করি। ৭ নবেম্বরের প্রেক্ষাপট, শ্বাসরুদ্ধকর চার দিনের কাহিনী, আন্দোলনের গূঢ় তাৎপর্য, ভবিষ্যতের দিশা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা যাতে পাওয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংকলনটি পরিকল্পিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৭ নবেম্বর
ইতিহাসের মোড়

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ

আমানুল্লাহ কবীর

ও

ড. সাঈদ-উর রহমান

ঝিনুক প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

ঝিনুক প্রকাশ সংস্করণ ● এপ্রিল ২০০২

প্রকাশক ● জীবন নাহার ● ঝিনুক প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, (মান্নান মার্কেট) ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস ● ইয়াশা কম্পিউটার, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ● সুবর্ণা প্রিন্টিং প্রেস ১৯, কাজী আব্দুর রউফ রোড, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব ● সম্পাদক
প্রচ্ছদ ● নাসিম আহমেদ

মূল্য ● ৩০০ টাকা মাত্র।

পরিবেশক ঃ জ্ঞান বিতরণী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট), ঢাকা-১১০০

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

পঁচাত্তরের সিপাহী-জনতা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

বাংলাদেশের হাজার-দেড় হাজার বছরের ঘটনাসংকুল দ্বন্দ্বসংঘাতমুখর ইতিহাসের গতি কখনোই একমুখী ছিল না। শতকে-শতকে, এমনকি কখনো-কখনো দশকে-দশকে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে, ঘটনাপ্রবাহ দুর্দমনীয় বেগে নতুন পথে মোড় নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সে ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ মোড় ফেরার দিন ১৯৭৫ সালের ৭ নবেম্বর। দিনটির সঙ্গে জড়িত আছে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় এক অবিনাশী চেতনা।

বঙ্গভূমি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের ভূগোলের নবীনতম অংশ। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পলিতে এই বদ্বীপের জন্ম। এখানে বসতি গেড়েছে সেই সব ভাগ্যান্বেষীর দল, যারা বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে চায় নিজেদের পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে। বন্যা-প্লাবন-ঘূর্ণিঝড়, প্লেগ-মারী-মন্বন্তর ও রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়ার প্রতিকূল পরিবেশেও এরা জয়ী হয়ে টিকে আছে, এবং এভাবে নিজেদের চেতনায় আত্মস্থ করেছে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা। সংগ্রাম ও স্বাধীনতার চেতনা তাই এদেশের ভূমিপুত্রদের অন্তর্গত উত্তরাধিকার।

ভারত উপমহাদেশ বহুজাতির বাসভূমি। বহিরাগত আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়, শক-হুন-মোগল-তুর্কী-পাঠান এই অঞ্চলে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছে, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে-মিশে নতুন-নতুন জাতির জন্মসম্ভব করেছে। এর ফলে ভারত ভূখন্ডে ঐক্য আসেনি, বরং ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। সভ্যতার বিকাশের ধারায় এখানে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে ঃ একটি জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীন রাজ্য গঠনের স্বপ্ন—অপরটি জাতিগত-রাষ্ট্রগত স্বাতন্ত্র্য বিনাশ করে এককেন্দ্রিক ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। প্রথমটিই প্রধান ধারা এবং লিখিত ইতিহাসের প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে সেই স্বপ্ন, এমনকি উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের গৌরবোজ্জ্বল দিনেও ভারতবর্ষে কয়েকশ স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। দ্বিতীয় ধারাটি গৌণ হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়নি। অন্তত তিন-তিনজন সম্রাট—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রী. পূঃ ৩২৪-৩০০), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮০-৪১৩), আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)—সমগ্র ভারতকে এক শাসনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল সর্বসাকুল্যে একশ সাত বছর।

বিশ শতকের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ সরকার ধর্মের ভিত্তিতে দুটি প্রধান রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে—একটি মুসলমানপ্রধান পাকিস্তান, অপরটি হিন্দুপ্রধান ভারত। পাকিস্তান-অর্জনে বাঙালী মুসলমানের অবদান ছিল সর্বাধিক। জমিদারদের—যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের— শোষণ থেকে পরিত্রাণের আশায় বাঙালী শ্রমিক-

www.nagorikpathagar.org

কৃষক-জনতা পাকিস্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু জমিদারদের স্থান পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক ভূস্বামী ও পুঁজিপতিরা দখল করে নিলে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়নি। বায়ান্ন, বাষট্টি ও উনসত্তরের রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় নতুন মানচিত্র—আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। সহস্র বছরের ইতিহাসে এটাই বাঙালীর প্রথম নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ফলে এর গুরুত্ব অপরিসীম, এবং স্বভাবতই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সারা বাংলাদেশ ছিল অবিস্মরণীয় আনন্দ-উল্লাসে টালমাটাল।

সেই বিজয়ের মধ্যেও বিষাদ ও আশঙ্কার কাঁটা খচখচ করছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বই উপস্থিত ছিলেন না—মওলানা ভাসানী ভারত সরকারের 'অতিথি', শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী, প্রবাসী সরকার কলকাতায়, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম. এ. জি. ওসমানী ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান সিলেটে। তাঁদের কেউ আজ জীবিত নেই বরং কেন আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে থাকেননি, তা মৃত্যুর আগে বলে যাননি। এমনকি সিলেটে থাকা সত্ত্বেও সিলেটে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তাঁরা থাকেননি। 'সারেন্ডারের সময় আমরা কেউ ছিলাম না। ইন্ডিয়ান আর্মি সারেন্ডার কন্ডাক্ট করে। আমাদের বাংলাদেশ ফোর্সকে সিলেটে ঢুকতে দেয়া হয়নি', বলেছেন মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৭২৭) প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের ১৬ ডিসেম্বর মুক্ত জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে কি বলা উচিত, সেটাও টেলিফোনে দিল্লী থেকে বলে দেয়া হয়েছিল। ভারত-প্রবাসী বুদ্ধিজীবীদের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল—'তবে কি আমরা নতুন বন্ধনে জড়াতে যাচ্ছি নিজেদের।'

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে লন্ডন-দিল্লী হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেনি, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে বোঝা গেল তিনিও দেশের মানুষের মনের গভীরে প্রবহমান বেদনা ও শঙ্কা অনুধাবনে শুধু ব্যর্থ হননি, বরং নিজের জন্মদিনে ইন্দিরা গান্ধীকে ঢাকায় নিমন্ত্রণ করে এনে ২৫ বছরের মেয়াদের 'মৈত্রী' চুক্তি স্বাক্ষর করে কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হলো দেশশাসনে তাঁর বিপুল ব্যর্থতা। সুতরাং অস্বাভাবিক নয় যে ১৫ আগস্টের এত বড় রক্তপাতেও কেউ অশ্রুবিসর্জন করেনি।

আরেক হতভাগ্য ছিলেন খালেদ মোশাররফ। সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, সেকটর কমান্ডার। ৩ নবেম্বর তিনি একটি অভ্যুত্থান ঘটালেন। কারণ কেউ জানেনা, শুধু অনুমান করা যায়। মনে হলো তিনিও দাঁড়িয়েছেন ভারতের স্বার্থের অনুকূলে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বাস দেখা দিলো তাঁকে নিয়ে, কিন্তু যখনই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হলো তখন ভারতীয় সংবাদপত্র— যেগুলি ভারত সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত করে—ঢাকা সম্পর্কে আজগুবি বীভৎস সংবাদ পরিবেশন শুরু করল। প্রেস ট্রাষ্ট অব ইন্ডিয়া খবর প্রচার করলো

www.nagorikpathagar.org

যে, চার নেতার হত্যার পাশাপাশি জেলে আরো হত্যা করা হয়েছে আবদুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, কোরবান আলী, আব্দুল মান্নান, তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনকে। 'বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনায় ভারত নির্বিকার থাকতে পারেনা' বলে পর-পরই হুমকি দিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সেদিন রাত্রে শুরু হয় দেশকাঁপানো অবিস্মরণীয় বিস্ফোরণ। বিদেশী হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায় লক্ষ লক্ষ সিপাহী-জনতা। বের হয় মিছিলের-পর-মিছিল। ৭ ও ৮ তারিখের পত্র-পত্রিকা ধারণ করে আছে সেই অভূতপূর্ব গণজাগরণ, বিপ্লব ও সিপাহী-জনতার মহামিলনের জীবন্ত ছবি। সেদিন নতুন করে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার লৌহকঠিন বুনিয়াদ। বিপ্লবমুখর বাংলাদেশের ঐতিহ্যে যুক্ত হয়েছে আরেকটি গৌরবময় যাত্রা। সে-কারণেই ৭ নবেম্বরের গুরুত্ব অনন্য ও আকাশস্পর্শী; এদেশের ইতিহাসে দিনটি অপরিসীম মহিমায় ভাস্বর।

দুই

এই সংকলন প্রকাশের একটি প্রেক্ষাপট আছে। ১৯৭৬ সাল থেকে ৭ নবেম্বর জাতীয় পর্যায়ে—সরকারী ও বেসরকারীভাবে—'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ সরকার ৭ নবেম্বরের মহিমায় কালিমা লেপন করতে শুরু করে। তার প্রতিক্রিয়ায় দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পত্র-পত্রিকায় বেশ কটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের পটভূমি তাৎপর্য ও অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একইসঙ্গে সংকলিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ৭ ও ৮ নবেম্বর ঢাকার তিনটি প্রধান দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাক, সংবাদ ও দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ছবি, রিপোর্ট ও সম্পাদকীয়। সেগুলি থেকে সামান্য ভাবে হলেও অনুভব করা যাবে ঐকালের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের বিপ্লবস্পন্দিত হৃৎকম্পন।

সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে অনেকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ড. মাহবুব উল্লাহ্‌র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাসমূহ পুস্তকাকারে ছাপতে অনুমতি দিয়ে লেখকগণ আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। ছবিগুলি পাওয়া গেছে জনাব আব্দুর রশিদ তালুকদার, জালালউদ্দিন হায়দার ও খালেদ হায়দারের সৌজন্যে। অত্যন্ত আগ্রহভরে প্রচ্ছদ তৈরী ও অঙ্গসজ্জা করে দিয়েছেন সৈয়দ লুৎফুল হক। দ্রুত মুদ্রণের জন্য 'আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল আমিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সাঈদ-উর রহমান
ও
আমানুল্লাহ কবীর

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ঝিনুক প্রকাশ সংস্করণের ভূমিকা

'৭ই নবেম্বর, ইতিহাসের মোড়' শিরোনাম নিয়ে ক্ষীণ শরীর এই সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে ধারাবাহিক প্রকাশনী থেকে; লেখা ছিল ১২টি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৮। সেই ছোট্ট বইটিকে সহ্য করতে পারেনি তৎকালীন সরকার—তারা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল প্রকাশকের জীবন, তছনছ করে দিয়েছিল তাঁর প্রকাশনার নেশা। তাতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৭ নবেম্বর সম্পর্কে সরকারের মনোভাব। পরবর্তীকালে ৭ নবেম্বরের সরকারী ছুটি বাতিল করা হয়; *'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি 'দিবস'*-কে অভিহিত করা হয় 'সৈনিক হত্যা' দিবস রূপে। লীগের মনের বাসনা জানতে পেরে আওয়ামী সরকারের পোষ্য বুদ্ধিজীবীরা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে থাকেন সংহতি দিবসের অবিনাশী চেতনার বিরুদ্ধে, কুৎসা রটনা শুরু হয় ঐ দিনের সংগে জড়িত বিপ্লবী সৈনিকদের নিয়ে।

আজ ভাল লাগছে দেখে যে, আমরা যে ক্ষীণকায় প্রবন্ধ-সংকলনটি প্রকাশ করেছিলাম, সেই বিষয় সম্পর্কে লেখার জোয়ার এসেছে ইদানীং। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি সংকলন—কাজী সিরাজের সম্পাদনায় '৭ নবেম্বর পটভূমি ও বাস্তবতা' (ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৩২); আবদুল হাই শিকদারের সম্পাদনায় 'অবিস্মরণীয় ৭ নবেম্বর (ঢাকা, বাড কম্পিস্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃঃ—৪৮০ + ১৬), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা সম্পাদিত '৭ নভেম্বর, যেদিন নতুন সূর্যোদয়' (ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ২০০১, পৃঃ—১৮০), '৭ নবেম্বরের বিপ্লব ও জিয়াউর রহমান' (ঢাকা, অ. আ. প্রকাশন, ২০০২ পৃঃ সংখ্যা—৩২০)। বইগুলির ব্যাপক চাহিদাই প্রমাণ দেয় ৭ নবেম্বরের চেতনার প্রতি এদেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর্নিহিত আনুগত্যের।

৭ নবেম্বরকে আমরা বার-বার স্মরণ করি জাতীয় মর্যাদা ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার দিবস হিসেবে, মাতৃভূমির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিনিময়যোগ্য করার বিরুদ্ধে সৈনিক ও জনতার অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঐক্যের দিন হিসেবে, চারপাশের দেশগুলিকে দুর্বল, দিল্লীর ওপর নির্ভরশীল, এবং পদানত করে রাখার জন্য ভারত সরকারের বিদেশনীতির প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে।

'৭ নবেম্বর ইতিহাসের মোড়' বইটির পরিবর্ধিত ঝিনুক সংস্করণে সংকলিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আছে, কিন্তু মিল রয়েছে ঐ এক মৌল চেতনায়। নানা দৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

কোণ থেকে আমাদের লেখক, বুদ্ধিজীবী, পন্ডিত ও গবেষকগণ বিষয়টিকে দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। সব কিছু মিলিয়েই প্রতিভাত হবে ৭ নবেম্বরের অনন্যতা ও ঐতিহাসিকতা।

বাংলা বানানে সমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। নবেম্বর/ নভেম্বর দুটি বানানই চালু আছে। আমরা প্রথম বানানটি ব্যবহার করি, দ্বিতীয় বানানে কেউ লিখলে আপত্তি করি না। তবে একটি প্রবন্ধে একটি বানান থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ঝিনুক প্রকাশের মালিক জীবন নাহার-এর একান্ত আগ্রহেই পরিবর্ধিত সংস্করণটি বেরোল। তাঁর আগ্রহ ও উদ্যমের কাছে আমরা হার মেনেছি।

অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন পুস্তকটি ভাল করার জন্য। বিশেষ করে উদয়ন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র শ্যামলের নাম বলতে হয়। বানান করে পড়তে গিয়ে সে অনেক ভুল আবিষ্কার করে আমাদের আনন্দের কারণ হয়েছে। তাকে দিয়ে সবটা বই পড়াতে পারলে বেশ উপকৃত হওয়া যেত।

আমানুল্লাহ কবীর
ও
সাঈদ-উর রহমান

ঢাকা
মার্চ, ২০০২

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

জিয়াউর রহমানের ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এর ভাষণ ১৭
বিপ্লব দিবস–ভাষ্যকার ২০
বিপ্লব ও সংহতি দিবস–দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২৩
পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বরের অজানা কাহিনী
–শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম) ২৫
পঁচাত্তরের নভেম্বরে যা ঘটেছিল–ড. আবদুল লতিফ মাসুম ৪৭
খালেদ–তাহের গং বনাম সিপাহী-জনতার বিপ্লব-সংহতির মূলধারা
–মারুফ কামাল খান ৫৭
৭ নভেম্বরের চেতনা ঃ প্রেক্ষিত ও ঘটনাপ্রবাহ–ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক ৬৫
৭ নভেম্বর যা ঘটেছিল–রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ৬৯
নভেম্বর বিপ্লব, কিছু স্মৃতি–বোরহান আহমদ ৭৫
৭ নভেম্বর ও কিছু অজানা কাহিনী–মেজর (অব.) আসাদুজ্জামান ৭৮
পঁচাত্তরের নভেম্বরের কয়েকটি দিন–খায়রুল আনাম ৮২
সিপাহী বিদ্রোহের দিনগুলি–লে. কর্নেল এম এ হামিদ পিএসসি (অব.) ৮৫
৭ নভেম্বরের ঘটনা, রটনা ও বাস্তবতা–আমিনুর রহমান সরকার ৮৯
৭ নভেম্বর ঃ আমার অনুভূতি–সৈয়দ আলী আহসান ৯৪
প্রেক্ষাপট ৭ নভেম্বর ঃ সংহতি কাদের মধ্যে এবং কেন ?
–মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম ৯৭
৭ নভেম্বর ভারত-নির্ভর দায়বদ্ধতার মুক্তি দিবস–সাদেক খান ১০২
৭ নভেম্বর ঃ স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ–উইং কমান্ডার এম হামিদুল্লাহ খান বিপি (অব.) ১০৬
প্রয়োজন ৭ নভেম্বরের চেতনায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা
–কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম ১১২
৭ নভেম্বর কেন?–মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা ১১৫
কেন ঘটেছিল বিপ্লব–মহিউদ্দিন খান মোহন ১১৯
অবিস্মরণীয় সাতই নভেম্বর–সমদর্শী ১২৩
আমাদের চেতনায় ৭ নবেম্বর–আখতার উল আলম ১২৬
৭ নভেম্বর–আনোয়ার জাহিদ ১৩৩
চেতনায় ৭ নভেম্বর ও শহীদ জিয়া–সুশীল তরফদার ১৪০
৭ নভেম্বরের চেতনা–ড. জসীমউদ্দিন আহমদ ১৪৪
৭ নভেম্বরের তাৎপর্য–ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ১৪৮
৭ নভেম্বরের শিক্ষা–ড. মাহবুব উল্লাহ ১৫৩
৭ নভেম্বরের শপথ–সাদেক খান ১৫৬
৭ নভেম্বরের শিক্ষা এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন–ড. তারেক শামসুর রহমান ১৬০
৭ নভেম্বরের প্রেরণা–নাগরিক ১৬৪
৭ নভেম্বরের কিছু কথা–মোবায়েদুর রহমান ১৬৭
মুক্তির মিছিলে ৭ নবেম্বর–ড. নজরুল ইসলাম ১৭১

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ৭ নভেম্বর–সিরাজুল হোসেন খান	১৭৭
৭ নভেম্বর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের উদ্দীপ্ত দিন–ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী	১৮২
ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ভাস্বর ৭ নভেম্বর–গাজীউল হাসান খান	১৮৭
৭ নভেম্বর ঃ স্বদেশ চেতনায় উদ্ভাসিত আলো–কাজী সিরাজ	১৯১
৭ নভেম্বর ঃ ষড়যন্ত্র ও নাশকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম –শাহ আহমদ রেজা	১৯৫
৭ নভেম্বর নিয়ে বিতর্ক ঃ আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রের নীল-নক্শা –লেঃ আবু রুশদ (অব.)	২০০
৭ নভেম্বর আছে ৭ নভেম্বর নেই–জাভেদ জহীর	২০৭
৭ নভেম্বর ও সাম্প্রতিক প্রচারণা–আহমেদ মুসা	২১০
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি ও প্রেরণার উৎস ৭ নবেম্বর –ড. খলিলুর রহমান	২১৪
৭ নভেম্বর না ঘটলে যা হতে পারত–এডভোকেট বদরুদ্দিন আহমদ	২১৮
৭ নভেম্বর ভারতীয় পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে স্বাধীনতা ও আলোর পথে যাত্রার শুভদিন–সুরঞ্জন ঘোষ	২২১
৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য–অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	২২৫
তাৎপর্যমণ্ডিত ৭ নভেম্বর ঃ ফিরে আসা, ফিরে দেখা–ড. আফতাব আহমাদ	২২৯
আজকের বাংলাদেশ ও ৭ নভেম্বর-এর তাৎপর্য–ড. আফতাব আহমাদ	২৩৩
ইতিহাসে পেছন ফেরার কোনো পথ নেই–আমানুল্লাহ কবীর	২৪৫
৭ নবেম্বরের পটভূমি, তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা–ড. সাঈদ-উর রহমান	২৪৯
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের লক্ষ্য–অনিরুদ্ধ	২৫৬
৭ নবেম্বর ও উৎপাদনমুখী রাজনীতির ধারা–অনিরুদ্ধ	২৬০
৭ নভেম্বর ঃ দেশপ্রেম-চেতনাদীপ্ত মহাদিবস–রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী	২৬৪
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস–কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বীর প্রতীক	২৬৬
৭ নভেম্বর ও পরবর্তী অধ্যায় ঃ জিয়া ও তাহেরের ভূমিকা –আমিনুর রহমান সরকার	২৬৯
বিপ্লব ও সংহতি দিবস ঃ একটি মূল্যায়ন–ড. তারেক শামসুর রহমান	২৭৬
৭ নভেম্বর–এ্যান্থনী মাসকারেনহাস	২৮০
ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবোধ–সানাউল্লাহ নুরী	২৮৭
বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও উত্থান–বিচিত্রা ভাষ্যকার	২৯৪
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ–এনায়েতুল্লাহ খান	৩০২
৭ নভেম্বর কি কোনো অবদান রেখেছিল?–মাহবুব আনাম	৩০৫
৭ নভেম্বরের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য–ড. কে. এ. এম. শাহাদত হোসেন মণ্ডল	৩০৯
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঃ কিছু স্মৃতি–কাজী আবদুর রউফ	৩১৫
Indo-Soviet Reaction to the change—Achintya Sen	৩২০
The rignificance of Novvember 7—Achintya Sen	৩৩৩
পরিশিষ্ট ঃ এক (জনগণের প্রতিক্রিয়া)	৩৪১
পরিশিষ্ট ঃ দুই (কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকীয়)	৩৫০
পরিশিষ্ট ঃ তিন–(কয়েকটি প্রচারপত্র)	৩৫৯

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

- **দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ** (১৯০৬–৯৯), শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক।
- **শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম) ঃ**
  মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার অন্যতম নায়ক।
- **ড. আবদুল লতিফ মাসুম ঃ** জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
- **মারুফ কামাল খান ঃ** প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপ তথ্য সচিব।
- **ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক ঃ**
  অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রাক্তন উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- **রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ঃ**
  সাংবাদিক, কিছুকাল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তথ্য উপদেষ্টা ছিলেন।
- **বোরহান আহমদ ঃ** সাংবাদিক, দৈনিক জনকণ্ঠ।
- **মেজর (অব.) আসাদুজ্জামান ঃ**
  অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা; বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মেজর পদে ছিলেন।
- **খায়রুল আনাম ঃ** সাংবাদিক, দৈনিক জনকণ্ঠ ।
- **লে. কর্নেল এম এ হামিদ পিএসসি (অব.) ঃ** সাবেক সেনাকর্মকর্তা
- **সৈয়দ আলী আহসান ঃ** বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২–৭৫) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭৫–৭৭) উপাচার্য ছিলেন।
- **মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম ঃ** অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা।
- **উইং কমান্ডার এম হামিদুল্লাহ খান বিপি (অব.) ঃ**
  মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা।
- **কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম ঃ**
  মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ। বি এন পি সরকারের সাবেক মন্ত্রী।
- **মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা ঃ** শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৯০–৯২) ও সেনেগালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।
- **মহিউদ্দিন খান মোহন ঃ** সাংবাদিক, দৈনিক দিনকাল।
- **আখতার উল আলম ঃ** প্রবীণ সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক।
- **আনোয়ার জাহিদ ঃ** সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ, জাতীয় পার্টি সরকারের মন্ত্রী, পরবর্তীকালে বেগম খালেদা জিয়ার তথ্য-উপদেষ্টা ছিলেন।
- **ড. জসীমউদ্দিন আহমদ ঃ**
  বিজ্ঞানী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ও বর্তমানে উপাচার্য।
- **ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ঃ** শিক্ষাবিদ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (১৯৮৬–৯০), উপাচার্য (১৯৯২–৯৬) ও অধ্যাপক ছিলেন।
- **ড. মাহবুব উল্লাহ ঃ** নামকরা ছাত্রনেতা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ছিলেন, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত।
- **সাদেক খান ঃ** সাংবাদিক, সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার নিয়মিত লেখক।
- **ড. তারেক শামসুর রহমান ঃ** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

www.nagorikpathagar.org

- **মোবায়েদুর রহমান ঃ** সাংবাদিক, নিয়মিত কলাম লেখেন।
- **ড. নজরুল ইসলাম ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক।
- **সিরাজুল হোসেন খান ঃ** রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী।
- **ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী ঃ** সাংবাদিক, অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপ তথ্যসচিব পদে কর্মরত ছিলেন।
- **গাজীউল হাসান খান ঃ** প্রাক্তন কূটনীতিবিদ।
- **কাজী সিরাজ ঃ** সাংবাদিক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক দিনকাল।
- **শাহ্ আহমদ রেজা ঃ** সাংবাদিক, দৈনিক ইনকিলাব।
- **আমিনুর রহমান সরকার ঃ** সাংবাদিক, দৈনিক দিনকাল।
- **লেঃ আবু রুশদ (অব.) ঃ** অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা।
- **আহমেদ মুসা ঃ** সাংবাদিক ও গবেষক ঃ সোনার গাঁও-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের পরিচালক।
- **ড. খলিলুর রহমান ঃ**
  বিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য।
- **এডভোকেট বদরুদ্দিন আহমদ ঃ** এডভোকেট।
- **সুরঞ্জন ঘোষ ঃ** বিএনপি-র নেতা, জাতীয় ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
- **অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম ঃ** পরিচালক, হাজী ক্যাম্প, ঢাকা।
- **ড. আফতাব আহমাদ ঃ**
  ছাত্রনেতা, সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
- **আমানুল্লাহ কবীর ঃ**
  সাংবাদিক,বাংলাদেশ সংবাদসংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক।
- **ড. সাঈদ-উর রহমান ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।
- **অনিরুদ্ধ ঃ** দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কর্মরত, শ্রীসন্তোষ গুপ্তের ছদ্মনাম।
- **রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী ঃ**
  সাংস্কৃতিক কর্মী, বিএনপি-র সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।
- **কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বীর প্রতীক ঃ**
  রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী।
- **এ্যান্থনী মাসকারেনহাস ঃ** ব্রিটিশ সাংবাদিক, বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ক The legacy of Blood নামক বিখ্যাত বইয়ের লেখক।
- **সানাউল্লাহ নুরী ঃ** সাংবাদিক ছিলেন।
- **এনায়েতুল্লাহ খান ঃ** সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী, সম্পাদক, সাপ্তাহিক হলিডে।
- **মাহবুব আনাম ঃ** সাংবাদিক, The Bangladesh Times-এর সম্পাদক ছিলেন
- **প্রফেসর ড. এ. এম. শাহাদত হোসেন মণ্ডল ঃ**
  বিজ্ঞানী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য।
- **কাজী আবদুর রউফ ঃ** সাবেক সেনা কর্মকর্তা
- **অচিন্ত্য সেন ঃ** সাংবাদিক, সাপ্তাহিক হলিডে।

www.nagorikpathagar.org

জিয়াউর রহমানের ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এর ভাষণ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আস্‌সালামু আলাইকুম,

গত ৭ ও ১১ নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন থেকে আমি গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছি জনসাধারণ কিভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক আইন প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করছে।

এই ঘটনা সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিছু লোক বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় নিয়োজিত হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তি তাদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এখনো সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের নাম ব্যবহার করে চলেছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করছি। আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক। সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের প্রশাসনকে দৃঢ় ও কার্যকরী রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এই উদ্দেশ্য হাসিলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন হস্তক্ষেপ— তা যে কোন মহল থেকেই আসুক না কেন আমরা বরদাস্ত করব না। আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মৌলিক প্রয়োজন দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা। বেআইনী অস্ত্রধারীরাই এই শান্তি ও শৃংখলার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রতিটি শান্তিকামী নাগরিকের কাছে আমাদের আবেদন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে আপনারা সহযোগিতা করুন।

www.nagorikpathagar.org

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক জোটনিরপেক্ষ নীতির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন, আমরা আমাদের সকল বন্ধুদের আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব—কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়—এই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব।

গত কয়েক মাস আমাদের জনগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সামরিক বাহিনী ও সামরিক আইন প্রশাসনের প্রতি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ ভাল করেই জানেন, কারা দেশের বন্ধু ও কারা দেশের শত্রু। কারা দেশের স্বার্থে ও কারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত। এ সম্পর্কেও আমাদের জনগণ সজাগ রয়েছেন। জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, যারা হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত এবং যে সমস্ত বহিঃশক্তি আমাদের ধ্বংস করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

আমাদের অঙ্গীকার পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা অনেক রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়েছি এবং আরও অনেকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন কোন মহল আমাদের এই সদিচ্ছাকে দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছেন এবং আমাদের সদিচ্ছাকে নস্যাৎ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোন মহল তাদের অতীত হীনকার্যকলাপের কথা ভুলে গিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী চক্রের সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টায় লিপ্ত। বহিঃশক্তির সহায়তায় এই মহল পুনরায় তৎপর হওয়ার সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

এরা কারা আমাদের তা বলে দিতে হবে না। আপনারা তা জানেন। আপনারা জানেন তারা কি করতে চায় এবং তাদের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে আসে। জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধনের জন্যই তারা তৎপর। আমরা দেশে আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দেব না, আর রক্তপাত সহ্য করব না। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী চক্র। এদের পেছনে জনসমর্থন কতটুকু তা সবার জানা আছে। আপনারা জানেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সামরিক বাহিনীর নাম পর্যন্ত ব্যবহার করছে। আমরা তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণের ইচ্ছার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের সামরিক বাহিনী রাজনীতির উর্ধ্বে—জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষাই

www.nagorikpathagar.org

এদের একমাত্র লক্ষ্য। যারা দেশের স্বার্থবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত তাদের সম্বন্ধেও সামরিক বাহিনী সজাগ। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা জড়িত তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, আপনারা নির্ভয়ে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। কোন মহলের হস্তক্ষেপ আপনারা বরদাস্ত করবেন না। জনগণ আপনাদের সঙ্গে। দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে আপনারা জনগণের সাথে সহায়তা করুন। এইসব ব্যক্তিদের কঠোর হস্তে দমন করুন। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সহায়তায় বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আপনাদের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব রটিয়ে এবং প্রচারপত্র ছড়িয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের জনগণ এদের পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আপনারা একতাবদ্ধ থাকুন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পরিশেষে, আমি আপনাদের জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সামরিক বাহিনী ও জনগণ এবং প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা বজায় আছে। আমরা যদি এরূপভাবে একতাবদ্ধ থাকি, তা'হলে কোন বিদেশী শক্তি বা প্রভাব আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি এবং আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে প্রতিটি নাগরিকই একটি সৈনিক। আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত বিদেশী চরদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে—তাদের সমস্ত অপচেষ্টা বাংলাদেশের বীর জনগণ নস্যাৎ করে দেবে। আমাদের মাটিতে মীরজাফরের কোন স্থান নেই। সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আমাদের আহ্বান, মীরজাফর এবং বিদেশী দালালদের খুঁজে বের করুন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সক্রিয় সহায়তা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায়।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব দিবস

ভাষ্যকার

বাংলাদেশের উৎস কি ? সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর দেশপ্রেম ও তার ঐক্য ও স্বাজাত্যবোধ। মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা। আপন ভাষা ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। পরাধিকারের প্রতি ঘৃণা। স্বাধীন আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা। গণতন্ত্র স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত সমাজ গঠনের কামনা।

॥ ২ ॥

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মানচিত্র চিরকাল এক রকম থাকেনি। অঙ্গ বঙ্গ আমলের, পাল ও সেন রাজাদের আমলের কিংবা পাঠান বা মোঘল আমলের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানা অভিন্ন নয়।

ইতিহাসের বন্ধুর পথ বেয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমানা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত। বাংলাদেশের বাইরে বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণ রয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের অংশবিশেষে। বাংলাদেশের ভেতরেও রয়েছে নানান উপজাতির বাস। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বলতে একটা নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় আদল আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে।

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশের মানসগঠনে হাজার বছরের বিকাশ ও বিবর্তনের ছাপ থাকলেও এর রাজনৈতিক মূল নিহিত সমকালীন ইতিহাসে। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের পর বাংলার যে অংশ পূর্ববাংলা বা পূর্বপাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তাই নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ —এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাঙালীদের বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথমাবধি যে নীতি অনুসরণ করতে থাকে, তাতে বাঙালীদের অবাধ ও স্বাধীন বিকাশ দূরে থাক, বাঙালী জাতির নাম-নিশানা

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়। লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দেখা দেয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জবরদস্তিমূলকভাবে বর্তমান বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন অধিকারই কেবল হরণ করেনি, গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও বাংলাদেশীরা দেশের নীতিনির্ধারণ ও দেশ পরিচালনায় কোন ভূমিকা নিতে পারেনি। নিজ বাসভূমি থাকতেও তারা ছিল পরবাসীর মত। এ রাজনৈতিক স্বৈরশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয় জাতিগত নিপীড়ন ও নির্মম অর্থনৈতিক শোষণ। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান হয় এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের শিকার। এর বিরুদ্ধে বাঙালীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় আজকের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানের প্রথম যুগেই। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের শুরু। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেদিন দম্ভভরে ঘোষণা করেন, "উর্দু—একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা; সেদিন ঢাকার ছাত্র-জনতা তার মুখের উপর জবাব ছুঁড়ে দিয়েছিলেন "না, না, না ।" সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন ১৯৫২ সালে জাতীয় সংগ্রামের রূপ নেয়। ঢাকার ছাত্র-জনতা বুকের রক্তে সেদিন লিখে দিয়েছিল ইতিহাসের রায়। ১৯৭০ সালে একমাত্র সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হয় যে, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য। তাই শুরু হয় চক্রান্ত—গণরায়কে বানচাল করার ষড়যন্ত্র। যার পরিণতি রক্তাক্ত ২৫ শে মার্চ। পরবর্তী ইতিহাস সকলের জানা। বাঙালী জাতি তথা ছাত্র-জনতা, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, মিলিটারী, পুলিশ, বিডিআর সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিযুদ্ধে। রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে জন্ম নিল বাঙালীর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

॥ ৪ ॥

১৬ ডিসেম্বর যে জাতীয়তাবাদ স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিছুদিন যেতে না যেতেই তাতে ঘুণ ধরলো। ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ, গোষ্ঠীগত লিপ্সা দুর্নীতিকে ছড়িয়ে দিল সমাজ-জীবনের রন্দ্রে রন্দ্রে যাতে করে তাদের প্রতিষ্ঠা লোপ না পায়। দেশী-বিদেশী চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এই দেশের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়। হানাহানি খুনাখুনি—সারাদেশ শান্তিতে ঘুমানো ভুলে গেল।

জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও দেশের বীর জনতা ও সেনাবাহিনী প্রতীক্ষায় ছিল তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সার্থক করার সুযোগের অপেক্ষায়।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর সেই সার্থক দিন। এ দিন জনতা ও বীর সেনাবাহিনীর সম্মিলিত বিপ্লব আবার বাংলাদেশের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে প্রকাশ করে পৃথিবীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ তার সামগ্রিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবেই। বাংলাদেশীয় জাতীয়তাবাদ মরেনি, মরবে না।

সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ এই উপমহাদেশের রাজনীতি ও সমাজ জীবনকে বার বার তছনছ করেছে। আমাদের জাতীয়তাবাদকে দাঁড়াতে হয়েছে এর বিরুদ্ধে লড়াই করে। এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায়নি।

জাতীয়তাবাদের আর একটা বিশিষ্ট দিক সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদেশী শোষণ ও আধিপত্যের বিরোধিতা। আমরা অন্যের ব্যাপারে যেমন নাক গলাতে চাইনা, তেমনি নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে দিতেও নারাজ। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জাতীয়তাবাদী চেতনা শুধুমাত্র একটা ভূখণ্ড বা মানচিত্র নিয়ে তৃপ্ত নয়। সে চায় অভাব ও দারিদ্র্য থেকে, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশ ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এই নিয়েই বাংলাদেশের জনতা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জনতা দেশ গড়ার লড়াইয়ে নিয়োজিত।

॥ ৫ ॥

জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ও বিবর্তনের এ ধারা সম্পর্কে উপলব্ধি এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাই বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথ দেখাবে। আরও দৃঢ়ভাবে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করবে গোটা জাতিকে। শক্তি যোগাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলা রূপে গড়ে তোলার সংগ্রামে।

[দৈনিক সংবাদ : ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭]

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব ও সংহতি দিবস

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে নভেম্বর একটা চিরস্মরণীয় দিবস। এ দিবসেই একটা মস্তবড় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষের মধ্যেও এক অনন্য সংহতির সৃষ্টি হয় এবং প্রায় দু'শতাব্দীর মত সময়ে এদেশীয় মুসলিম সমাজ একদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল অচিরেই দেখা গেল তাতে রয়েছে এক মস্তবড় ফাটল। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হলেও উক্ত প্রস্তাব অনুসারে একাধিক রাষ্ট্র না হওয়ায় পরবর্তীকালে দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা এ অঞ্চলকে তাদের শোষণের ও শাসনের এক ভূখণ্ড বলে গণ্য করে। তারা বিজয়ী ইংরেজ বণিকদের স্থলবর্তী হয়ে এদেশবাসীর ওপর শোষণ ও শাসনের রোলার চালাতে চায়। ফলে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। প্রথমে ভাষা আন্দোলন, পরে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদের শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষার জন্য শেরে বাংলা ফজলুল হক, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, জনাব শামসুল হক, আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম, জনাব অলি আহমদ, আতাউর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান খান বিভিন্ন পর্যায়ে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন তা ছিল ঐতিহাসিক। বিশেষ করে ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানী অবিচার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ভাসানী ও মুজিব যে সংগ্রাম করেছেন তাও এদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েই রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ফলে এদেশীয় জনসমাজের মানুষের জীবনে যে ঐক্যচেতনার সৃষ্টি হয় তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ দেখা দেয়। সে ঐক্য আরও দৃঢ় হয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করে। পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে ফিরে এসে এদেশের জনসাধারণের নিকট একচ্ছত্র নেতারূপে রচিত হন এবং দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করেন। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধে প্রভূত সাহায্য করায় তিনি এদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ভারতের ইচ্ছাক্রমে রক্ষীবাহিনীকে প্রচুর কর্তৃত্বদান করেন। ভারতীয় বাহিনী দীর্ঘকাল এদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সমরাস্ত্র ভারতে চালান দেয়। তার ওপর তিনি

www.nagorikpathagar.org

এদেশের ধর্মীয় অনুভূতির মূল্য না দিয়ে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বলেও ঘোষণা করেন। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুসলিম বা ইসলামের যোগ ছিল সেগুলো থেকে তা মুছে ফেলেন। এভাবে দেশের সর্বত্র বাঙালী জাতীয়তার নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নানা প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এসবের ফলে এদেশবাসী মুসলিম সমাজ তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করতে থাকে। তাছাড়া শেখ মুজিব সরকারী ৪টি পত্রিকা বাদে সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের মূলে এক হিসেবে কুঠারাঘাত করেন। তবুও এদেশীয় জনসমাজ তার পূর্বকৃত আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জন্য তার এ গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল। তবে তার অনুচর ও সহকর্মীগণের নানা বিষয়ে স্বৈরাচারী কার্য-কর্ম প্রকাশ পাওয়ায় তার শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশ বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পায়। এই পটভূমিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। অভ্যুত্থানের নেতা কর্নেল রশিদ প্রেসিডেন্ট পদে বসালেন খন্দকার মোশতাক আহমদকে। এদের পরামর্শ মতো মোশতাক জেনারেল জিয়াকে করলেন চীফ অব স্টাফ, তবে পদটির মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেক কমিয়েছিলেন, সবার উপরে ডিফেন্স উপদেষ্টা হিসেবে বসানো হল জেনারেল এম, এ, জি, ওসমানীকে। এরপর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলের পাল্টা ক্যু'র প্রচেষ্টা শুরু হল। তারা ২ নভেম্বর রাতে জিয়াকে গৃহবন্দী করলেন এবং ২ নভেম্বর মোশতাক সরকারের পতন ঘটালেন। বিপ্লবের শুরুতে ২ নভেম্বর রাত্রিতে জিয়াকে বন্দী করা হলেও, জিয়া ছিলেন যেমন নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ, তেমনি নিঃস্বার্থ ও নিরহংকার। বিক্ষুব্ধ সিপাইরা এতে বিদ্রোহ করল। জিয়ার গুণে মুগ্ধ বিদ্রোহী সেপাইরা জিয়াকে ৭ নভেম্বর বন্দীদশা থেকে অযাচিতভাবে মুক্ত করে এবং অযাচিতভাবেই তাকে করে বিপ্লবের নেতা। এরপরে প্রেসিডেন্ট সায়েমের সরকারও অযাচিতভাবেই তাকে করে সেনাবাহিনীর প্রধান (জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ, ছদরুদ্দীন পৃঃ ৩-৩ ও ৩০৬)। এ জন্যই ৭ নভেম্বর এদেশের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন হিসেবে রয়েছে। সেদিন যদি বিদ্রোহী সিপাইরা তাকে মুক্ত না করতো এবং তাকে তাদের নেতারূপে বরণ না করতো তাহলে সেদিনই এই নেতৃত্বহীন সিপাই অভ্যুত্থান থেকে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়ে এদেশ ছারখার হয়ে যেতো। এ বিদ্রোহী সিপাইদের আস্থাভাজন নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা ঘোষণাকারী জিয়ার নেতৃত্বে এদেশবাসীর জীবনে যে সকল মঙ্গল সাধিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দৃঢ় করা, দেশকে স্বনির্ভর করার সকল রকমের চেষ্টা করা, সার্ক গঠন করে প্রতিবেশী ও অপরাপর দেশের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মকে রক্ষা করে সমাজ জীবনের নৈতিক উন্নতি সাধন করা প্রভৃতি কার্যাবলী। এজন্যই আমাদের জাতীয় জীবনে ৭ নভেম্বর এক অবিস্মরণীয় স্থান রয়েছে যা এদেশবাসী জনসাধারণের কাছে মহান দিন বলে গণ্য।

www.nagorikpathagar.org

পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর থেকে সাতই নভেম্বরের অজানা কাহিনী

শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম)

২ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। গত বেশ কয়েকদিন কাজের চাপে বাসায় যাওয়া হয়নি। ঠিক করলাম দুপুরের পর কিছু সময়ের জন্য বাসায় যাব। প্ল্যানমাফিক লাঞ্চের পর এক ফাঁকে চলে এলাম মালিবাগে। বেশ কয়েকদিন বিরতির পর হঠাৎ আমার আগমনে বাসার সবাই খুব খুশি হল। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় করা হল আনন্দঘন পরিবেশে। সন্ধ্যায় নিম্মীকে নিয়ে গেলাম মিনু ফুপ্পুর বাসায়। রাতের খাওয়া ওখানেই খেতে হল। বেশ রাত অব্দি গল্প-গুজব করে আমি আর নিম্মী ফিরছিলাম মালিবাগে। হঠাৎ নিম্মী বলল, "আজ আমি তোমার সাথে বঙ্গভবনে থাকব।" ১৫ আগষ্টের পর থেকেই বেচারী ভীষণভাবে neglected. একদম সময় দিতে পারছিলাম না ওকে। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। দু'জনে ফিরলাম বঙ্গভবনে। সময় তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। তেমন কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় আমার কামরার দিকে এগুচ্ছি, ডিউটিরত হাবিলদার এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল সাহেব বঙ্গভবন ছেড়ে চলে গেছেন। ১ম ইস্টবেঙ্গলের গার্ড replacement ও এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি ঢাকা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স থেকে। সবাই আপনাকে খুঁজছে। কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক এবং অন্যান্য সব অফিসারই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে বৈঠক করছেন।" আচমকা খবরটা পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেভাবে অবস্থা গড়াচ্ছিল তাতে এমন কিছু একটা ঘটতে পারে সেটা অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বিগত দিনগুলোর ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই ধরে নিয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাকে। নিম্মীকে কামরায় যেতে বলে দ্রুত গিয়ে হাজির হলাম প্রেসিডেন্টের স্যুইটে। প্রেসিডেন্ট সাহেব বেশ কিছুটা বিরক্ত এবং উত্তেজিতভাবে একটা সোফায় পা গুটিয়ে তার নিজস্ব স্টাইলে বসে তার পাইপে তামাক ভরছিলেন। কর্নেল রশিদ রেড টেলিফোনে কার সাথে যেন যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। কর্নেল ফারুক আরেকটি সোফায় নিশ্চুপ বসেছিল। ঘরে ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সালাম জানিয়ে কর্নেল রশিদের কাছে জানতে চাইলাম,

www.nagorikpathagar.org

— ব্যাপার কি রশিদ, কি হয়েছে ?

— যা এতদিন সন্দেহের পর্যায়ে ছিল তাই হয়েছে। তোর দুই বন্ধু হাফিজ এবং ইকবাল ১ম ইস্টবেঙ্গলের সব troops withdraw করে নিয়ে গেছে বঙ্গভবন থেকে। প্রথমে সবাই মনে করেছিলাম এটা routine replacement -এর ব্যাপার। কিন্তু সন্ধ্যার পরও যখন replacement এসে পৌঁছালো না তখন থেকেই ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে চীফ জেনারেল জিয়া, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত কাউকেই contact করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে অস্বাভাবিক troops movements হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই কিছু পরিষ্কার করে বলতে পারছে না ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটেছে। জেনারেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি কিন্তু তিনিও সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। তিনি বঙ্গভবনে আসছেন। জেনারেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খলিলকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন বিডিআর-এর দুটো রেজিমেন্ট বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দিতে। হাফিজ এবং ইকবালকেও পাওয়া যাচ্ছে না টেলিফোনে। আমার সাথে কথা শেষ করে কর্নেল ফারুককে বলা হল রেসকোর্সে তার ট্যাংক রেজিমেন্টের কাছে চলে যেতে। কর্নেল ফারুক রেসকোর্সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আমি বললাম, "ফারুক, তুই অবশ্যই রেসকোর্সে যাবি তবে you would not move under any provocation or circumstances whatsoever. সব বিষয়ে পরিষ্কার হবার পরই আমাদের করণীয় কি হবে সেটা বিবেচনা করা হবে। এর আগে আমাদের তরফ থেকে কোন move নেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রথমত চেষ্টা করতে হবে এই সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় কিনা। এর জন্য আমি নিজেই যাব ক্যান্টনমেন্টে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা আমার কোন কিছু না-হওয়া পর্যন্ত no action at all, is that clear ?' ইতিমধ্যে জেনারেল ওসমানীও এসে পৌঁছেছেন। তিনিও আমার অভিমতকে সমর্থন জানালেন। আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত তখন বিডিআর-এর দুটো রেজিমেন্ট এসে পৌঁছে গেছে। সে খবর নিয়ে এল মেজর পাশা, মেজর শাহরিয়ার এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। নিম্মীই গিয়ে তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেজর শাহরিয়ার চলে গেল তার রেডিও বাংলাদেশের কন্ট্রোল সেন্টারে। ক্যাপ্টেন হুদা প্রেসিডেন্ট, জেনারেল ওসমানী এবং কর্নেল রশিদকে সাহায্য করার জন্য বঙ্গভবনেই থাকবে সেটাই সাব্যস্ত হল। বাকিরা সবাই প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট এবং deployed ইউনিটগুলোর কমান্ড নেবার জন্য যার যার পজিশনে চলে গেল। আমি বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় কর্নেল রশিদ আন্তরিকভাবেই বলেছিল,

— ডালিম ভেবে দেখ, এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া ঠিক হবে কিনা ? সেই তরল অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়াটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছিলাম,

www.nagorikpathagar.org

— এই ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে someone has to clean the dirty linen, then why not me ?

প্রেসিডেন্টের স্যুইট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম আমার কামরায়। বেচারী নিম্মী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল,

— এখন কি হবে ? আমি বললাম,

— তুমি বঙ্গভবন ছেড়ে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। ঠিক বুঝতে পারছি না ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। যাই হোক না কেন ; বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। ড্রাইভারকে ডেকে এনে নির্দেশ দিলাম, বেগম সাহেবের হুকুম মত তার সাথেই থাকবে তুমি যতক্ষণ তিনি চান। নিম্মী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিশি রাতে একা একা বেরিয়ে গেল একরাশ আশঙ্কা মনে নিয়ে অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে। যাবার সময় অশ্রুসিক্ত চোখে ধরা গলায় শুধু বলে গেল,

— আল্লাহর হাতেই তোমাকে সোপর্দ করে দিয়ে গেলাম। সাবধানে থেকো। নিম্মী চলে যাবার পর আমিও ইউনিফর্ম পরে নিয়ে আমার বিশ্বস্ত গার্ড এস্কট, অয়্যারলেস অপারেটার এবং ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম আজিমপুরে মিসেস মোয়াজ্জেম কহিনূর ভাবীর বাসায়; মেজর নূর রয়েছে সেখানে। সব শুনে নূর বলল,

— রক্তপাত বন্ধ করার একমাত্র উপায় মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে সরাসরি দেখা করা। এছাড়া রক্তপাত কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হবে না। আমিও নূরের সাথে একমত হয়ে বললাম,

— সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য। ঠিক করলাম, ক্যান্টনমেন্টে যাবার আগে সার্বিক অবস্থাটা সরেজমিনে আরো একটু ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। আমরা জিপে করে গিয়ে উপস্থিত হলাম ফুলার রোডে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের বাসায়। ওখানে তখন মহুয়া এবং লিটু থাকত। উদ্দেশ্য খাকি পোষাক বদলে সাধারণ কাপড় পরে নেবো। ঘুম থেকে মহুয়াদের ডেকে তুললাম। সংক্ষেপে মহুয়া এবং লিটুকে অবস্থা বুঝিয়ে লিটুর কয়েকপ্রস্থ কাপড় চেয়ে নিয়ে আমরা সবাই ড্রেস পরিবর্তন করে নিলাম। মহুয়া জিজ্ঞেস করল,

— নিম্মী কোথায় ? বললাম,

— বঙ্গভবনে ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বলে এসেছি ও যেন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। তুই আত্মীয়-স্বজনদের ফোন করে সতর্ক করে দিস। এরপর আমরা বেরুলাম শহর প্রদক্ষিণ করতে। পুরো ভার্সিটি এলাকা, পিলখানা, নিউ মার্কেট, সেকেন্ড ক্যাপিটাল, রামপুরা টিভি স্টেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, রাজারবাগ পুলিশ লাইন।

www.nagorikpathagar.org

কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের সুরক্ষিত চেকপোষ্টগুলোই নজরে পড়ল। strategicaly deployed tanksগুলোও দেখলাম ঠিকমতই রয়েছে। প্রায় সারা শহরটাই ঘুরে এলাম শাহরিয়ারের control room-এ। ঘরে ঢুকতেই দেখি ও কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলছে। আমাদের দেখে সংক্ষেপে কথা সেরে জানতে চাইলো,

— কি অবস্থা স্যার, কি বুঝছেন ! আমরা ঘুরে ফিরে যা দেখেছি তাই বললাম। শাহরিয়ার জানাল, তার খবরা-খবরও প্রায় একই রকম ; তবে সাভারের বুস্টার স্টেশনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অজানা কারণে। ফলে রেডিও স্টেশন থেকে কোন কিছু প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। টিভির প্রচারণাও একই কারণে সম্ভব নয়। তাকে আমরা জানালাম,

— আমরা ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করার চেষ্টায়। নিজেদের মধ্যে যে কোন প্রকার সংঘর্ষ বন্ধ করতেই হবে at any cost যাতে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ না পায়। শাহরিয়ার আরো জানিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও জেনারেল জিয়ার সাথে সে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। শাহরিয়ারের ওখানে যাবার আগেই সোনাটেঙ্গরে আমার প্রিয় মেঝো ফুপ্পুর (বিভা ফুপ্পু) বাসায় গিয়েছিলাম কতকগুলো বিশেষ জরুরী টেলিফোন কল সেরে নেবার জন্য। তাদের ফোনটা খারাপ ছিল কিন্তু ইমান আলী ফুপ্পা পাশেই তার এক কলিগের বাসা থেকে ফোন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই আমাদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন ইউনিটের সেনা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে বুঝলাম তারা প্রায় সবাই অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তাদের সংক্ষেপে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশংকার কথা জানিয়ে অবস্থার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল জিয়ার বাসায় ফোন করে বুঝতে পারলাম তার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের সাথেও যোগাযোগ করেছিলাম সেই বাসা থেকেই। যোগাযোগের পর বুঝতে পারলাম ঘটনাটা ঘটানো হচ্ছে অতি সীমিত পরিসরে ঢাকাভিত্তিক। এতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে।

শাহরিয়ারের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চললাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে একটু এগুতেই দুই ট্রাক সৈনিক দেখতে পেলাম মাউন্টেড অবস্থায়। কাছে যেতেই দেখলাম তারা ৪র্থ ইস্টবেঙ্গলের। Contingent commander -কে জিজ্ঞাসা করলাম,

— তোমরা এখানে কেন ? জবাবে সুবেদার সাহেব স্যালুট করে জানাল,

www.nagorikpathagar.org

— আগামীকাল আওয়ামী লীগের প্রসেশন বের হবার সম্ভাবনা আছে ; তাই হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের এয়ারপোর্ট এলাকায় deployed থাকতে হবে আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য। তার জবাব শুনে বুঝতে পারলাম, খালেদ চক্র ট্রুপসদের কাছে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলেনি সৈনিকদের সমর্থন না-পাওয়ার ভয়ে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত তার অধীনস্থ ৪র্থ বেঙ্গলকে চতুরতার সাথে মোতায়েন করেছে just as show of force হিসাবে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য। সৈনিকদের কাছে খুলে বলা হয়নি সরকার এবং জিয়া-বিরোধী পাল্টা অভ্যুত্থানের কথা। মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেনারেল জিয়াকে প্রায় বন্দী করা অবস্থায় রাখা হয়েছে এ কথাটা বলার মত সাহস হয়নি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতেন, এ ধরনের কোন পদক্ষেপকে কিছুতেই মেনে নেবেনা সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক বেশিরভাগ অফিসার ও সৈনিক। সবকিছু দেখে শুনে বুঝলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরাসরি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সাথেও আলোচনা করা সম্ভব। তার বাসাতেই গেলাম প্রথম। বাসায় তাকে পাওয়া গেল না। বাসা থেকে বলা হল, তিনি সেনাসদরে গেছেন। পৌঁছালাম সেনাসদরে। সেখানেও কেউ নেই। সেন্ট্রি, ডিউটি অফিসার ও ক্লার্ক ছাড়া পুরো সেনাসদরটা নিস্তব্ধ। সেখান থেকে গেলাম মেজর হাফিজের বাসায়। হাফিজ বাসায় নেই। ইকবালের খোঁজ করে তাকেও পাওয়া গেল না। এরপর গেলাম কর্নেল শাফায়াত জামিলের বাসায়। সেখান থেকে জানানো হল তিনি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স-এ গেছেন। সেখান থেকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স-এ যাবার পথে দেখলাম জেনারেল জিয়ার বাসার সামনে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। ডিউটিরত গার্ডরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্সেও নেই তারা। সেখান থেকে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের গেইট দিয়ে ঢুকতেই দেখি ট্রুপসরা সেখানে সব stand to অবস্থায় পজিশন নিয়ে আছে। এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কেন জানতে চাইলে আমাদের বলা হল যে, সন্ধ্যার পর রাতের আঁধারে ৪র্থ বেঙ্গল ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের দিকে তাক করে তাদের RR (Recoiless Rifle) এবং সৈন্য মোতায়েন করেছে : তাই তারাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৪র্থ বেঙ্গল এবং ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট পাশাপাশি দু'টি ইউনিট। তাদের মধ্যে এ ধরনের উত্তেজনা যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। উত্তেজনা কমানোর জন্য সেনাপরিষদের সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বুঝিয়ে তাদের বললাম, এই অবস্থায় সতর্ক অবশ্যই থাকতে হবে সবাইকে। আরো জানালাম, আমরা ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে খুঁজছি। ওদের পেলেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক কার্যক্রম বন্ধ করার বন্দোবস্ত করব। সেখানেই জানতে পারলাম মহারথীরা সব ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স এ রয়েছেন। ৪র্থ বেঙ্গলের গেইট দিয়ে ঢুকতেই নজরে পড়ল সাজ সাজ রব। ভীষণ ব্যস্ততা ! সৈনিকদের রণসজ্জায় সজ্জিত করে রাখা হয়েছে। কিছুদূর এগুতেই ক্যাপ্টেন কবিরের দেখা পেলাম।

www.nagorikpathagar.org

একটি এসএমজি কাঁধে ঝুলিয়ে সে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল কবির। তাকে জিজ্ঞাস করলাম,

— Where is brig. Khaled and Col. Shaffat ?

— They are all here Sir. জবাব দিল কবির। কবিরের সাথে কথা বলছিলাম। এমন সময় ল্যান্সারস-এর ক্যাপ্টেন নাছের এসে উপস্থিত হল।

— Assalamu alaikum, welcome Sir. বলেই করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন নাছের। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই করমর্দন করলাম আমি ও নূর।

— স্যার, মোশতাক এবং জিয়াকে দিয়ে আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সফল করা সম্ভব হবে না। Both of them are self centred and hypocrite. They are not the right kind of people Sir. তাই আমরা ওদের অপসারণ চাই and I am sure both of you would be definitely with us. ওকে অনেকটা থামিয়ে দিয়েই বললাম,

— Is Brig. Khaled arround ?

— সবাই এখানেই আছেন। মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালও রয়েছেন এখানে।

— Naser do me a favour. please find out Hafiz and tell him I would like to talk to him.

— Ok sir. আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে নিয়ে আসার জন্যে। আপনারা ততক্ষণ এ্যাডজুটেন্টের অফিসে অপেক্ষা করুন বলে চলে গেল নাসের। এ্যাডজুটেন্টের ঘরে ঢুকে দেখি ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় কর্নেল **আমিনুল হক, বীর উত্তম,** ও লেফটেন্যান্ট মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী বিষণ্ন হয়ে চুপচাপ বসে আছে। কর্নেল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম,

— কি ব্যাপার স্যার, আপনাদের এই দশা কেন ? What's up ?

— You must be jocking at our miserable plight, is'nt it Dalim ? তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছ না ইউনিট কমান্ডার এবং এ্যাডজুটেন্ট হয়েও নিজেদের ব্যাটালিয়ানেই আমাদের এমন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসে থাকতে হচ্ছে, তার মানেটা কি ?

— কিছু মনে করবেন না, স্যার। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে ? এমন কিছু যে ঘটতে পারে সেটাতো অজানা ছিল না আপনাদের অনেকেরই। সময়মত action না নেবার ব্যর্থতার জন্যই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় কি ? আমার প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝে কর্নেল আমিন চুপ করে রইলেন। বস্তুত কর্নেল আমিন ও লেফটেন্যান্ট মুন্নাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করায় তাদের প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাখা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে তাদের নিজস্ব ইউনিটেই। খবর পেয়েই হাফিজ এবং ইকবাল এল। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালো পাশের একটি খালি কামরায়।

— এ কি করলে হাফিজ ! শেষ পর্যন্ত অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লে ?

— অঘটন বলছ কেন ? জিয়া এবং মোশতাকের ঘোড়েল মনের পরিচয় পাবার পরও তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে মোটেও আন্তরিক নয় সেটা তোমরা বুঝেও মেনে নিতে পারছ না কেন ? Both of them are betraying our cause. উল্টো প্রশ্ন করল হাফিজ। ওদের বাদ দিয়েই এগুতে হবে। আওয়ামী লীগের গড়া সংসদকেও আর কালবিলম্ব না করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এই সঠিক উদ্যোগে বিশেষ করে তোমার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, শাহরিয়ার-এর মাধ্যমে সেনা পরিষদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাব আশা করছি আমরা। আমি জানি ব্রিগেডিয়ার খালেদ সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত reservations আছে ; সেগুলোকে আমিও অস্বীকার করছি না কিন্তু এরপরও ব্রিগেডিয়ার খালেদের চীফ হবার lifelong ambition fulfill করে দিলে জিয়ার তুলনায় তাকে দিয়ে more efficiently কাজ করানো যাবে।

— দেখ হাফিজ, আমি স্বীকার আগেও করেছি এখনো করছি, আশানুরূপভাবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হতে হচ্ছে জেনারেল জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাকের জন্য। শুধু তাই নয় ; অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করছেন তারা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, কিন্তু তাই বলে হঠাৎ করে এ ধরনের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর্মির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে অপশক্তিকে সুযোগ করে দিতে হবে to stage back and reverse the process সেটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তা যাক, এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে ; আমার ধারণা-—এ সমস্ত বোঝাবুঝির সময় পার হয়ে গেছে কারণ যে অঘটন কখ্নোই সম্ভব হত না সেটাই ঘটিয়ে বসেছো তোমরা। এই অবস্থায় কোন রক্তপাতের সূত্রপাত যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছি। এখন চলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে সঙ্গে করে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক এই সংকটের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে কি করে উদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে সেটাও বলো পরিষ্কার করে। সেক্ষেত্রে আমরা ফিরে যাব। এরপর যা হবার তা হবে। সার্বিক অবস্থায় বিশ্লেষণের পর আমার এবং নূরের বিশ্বাস জন্মেছিল, আলোচনার প্রস্তাব কিছুতেই না-মানা সম্ভব না খালেদ চক্রের কাছে ; কারণ তাদের, বিশেষ করে হাফিজ এবং ইকবালের অজানা ছিল না, ঢাকায় তো বটেই অন্যান্য সেনানিবাসে সেনা পরিষদের শক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে অনেক বেশি। কি যেন ভাবল হাফিজ, এরপর বলল,

www.nagorikpathagar.org

— ঠিক আছে, তাই হবে। চলো আমাদের সাথে। হাফিজ, আমি, নূর এবং ইকবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার মঈন, ক্যাপ্টেন নাছের, ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, কর্নেল রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ সবাই অফিস ব্লকের সামনে লনে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে অভিবাদন জানাইতে তিনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

— আরে এসো এসো, welcome. আমি জানতাম তোমরা দু'জন আসবেই। তার কথা শেষ হতেই বললাম,

— শেষটায় অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লেন।

— What do you mean ? It's not my doing. Believe you me Dalim it is their's doing, these young officers. They think Zia can't deliver. They also think he will do nothing to achieve the goals of the 15th August revolution, at the sametime he is also totally incapable to protect the interest of the armed forces. Therefore they want a change.

— বুঝতে পারলাম স্যার, জেনারেল জিয়ার জায়গায় বসে সেই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্যই এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন অথবা করানো হয়েছে।

— No no, not at all. I don't want to be the Chief. Believe me. I have no such ambition. ছেলেরা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে তাই আমি এসেছি। That's it. কথার মাঝেই কে একজন বলে উঠল,

— We don't mind to accept Brig. Khaled's leadership

— Come on, keep quite ব্রিগেডিয়ার খালেদ সেই কণ্ঠকে চুপ করিয়ে দিলেন।

— যাক স্যার, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার সময় এটা নয় ; এতে কোন লাভও নেই। আমি ও নূর এসেছি কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যাতে শুরু না হয়—সেটা নিশ্চিত করতে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। রশীদ এবং ফারুককে বলে এসেছি আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার ফলাফল জানার আগ পর্যন্ত বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংক কিংবা ট্রুপস-এর কোন মুভমেন্ট করা হবে না। এখন বলেন, আলোচনায় আপনারা রাজি আছেন কিনা? আমার কথার ধরণে তারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সবাই। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ঠিক

www.nagorikpathagar.org

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল হাফিজ। সে নীচু স্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কিছু বলল। হাফিজের কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

— তোমাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা। আলোচনা হবে।

— কিন্তু আসার পথে দেখলাম এয়ারপোর্টের কাছে কিছু সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। অবশ্য তাদের যে কথা বলে deploy করা হয়েছে, তার সাথে আপনাদের কার্যকলাপ সঙ্গতিহীন। যাক, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক deployment-কে কেন্দ্র করে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে যে ভয়ংকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে—সেটা প্রশমিত না করলে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, আর সেটা ঘটলে আমাদের আলোচনার কোন সুযোগই থাকবে না। তাই আমার অনুরোধ, খালেদ ভাই আপনি আলোচনায় বসার আগে ৪র্থ বেঙ্গলকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে stand down করার। আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াতকে নির্দেশ দিলেন ৪র্থ বেঙ্গলকে stand down করানোর জন্য। কর্নেল শাফায়াত চলে গেলেন নির্দেশ কার্যকর করতে। এরপর আমরা সবাই গিয়ে বসলাম কমান্ডিং অফিসারের ঘরে। প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম জেনারেল জিয়া সম্পর্কে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জানালেন তিনি তার বাসাতেই আছেন এবং ভালোই আছেন। তার নিরাপত্তা এবং দেখাশুনার জন্য কিছু অতিরিক্ত সৈনিককে তার বাসার কাছে অবস্থান নিতে বলা হয়েছে এবং কাউকে তার সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হচ্ছে না সাময়িকভাবে ; এর বেশি কিছুই নয়। তার মানে হল, তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে এবং এই কথাটাও সৈনিকদের জানাবার সাহস হয়নি খালেদ চক্রের। আলোচনার আগেই জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। আমি সোজা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বললাম,

— স্যার কোন আলোচনায় বসার আগে একটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই—জেনারেল জিয়ার সাথে এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে এর বেশি কিছু করা হলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে you have to give me your .explicit assurance. বুদ্ধিমান লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। কোন সময় না নিয়েই তিনি জবাব দিলেন,

— Be rest assured no harm would be done to him. At the most be may be removed as the chief of army staff that's all. Nothing more than that.

আলোচনা শুরু হল। একদিকে আমি ও নূর, অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে ওদের তরফের উপস্থিত প্রায় সবাই। শুরুতেই আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম,

www.nagorikpathagar.org

— দেশে একটি জনপ্রিয় সরকার থাকতে এ ধরনের একটা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি ? আমার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেমন যেন থমকে গেলেন। মনে মনে সবাই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কর্নেল শাফায়াত বলে উঠলেন,

— We want to dismiss the Mushtaq government and the present parliament because the present parliament is the parliament of Awami-Baksalites. জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম.

— তারপর ?

— We don't want Gen. Zia to remain as our Chief.

—দেশ চালাবে কে ? প্রশ্ন করলাম।

— We shall form a 'Revolutionary Council'. ক্যাপ্টেন ইকবাল জবাব দিল। কর্নেল শাফায়াত আবার বলে উঠলেন,

— Khandoker Mushtaq will handover power to the Chief justice. ব্রিগেডিয়ার খালেদ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন।

— Continution must be maintained and therefore, Khandoker Mushtaq will remain as the president but three Chiefs must be removed.

বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না কোন নির্দিষ্ট blue print ছাড়াই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন তারা। কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা কিংবা মতৈক্য কোনটাই নেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের। আলোচনা চলছে হঠাৎ আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ার বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠলাম। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম,

— Sir, why the MIGS are up ? For heaven's sake stop this provocative act. Otherwise, it would be simply impossible to holdback col. Farooq. He will roll his tanks towards the cantonment. ব্রিগেডিয়ার খালেদ টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে নিয়ে এয়ারফোর্স কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত নিজের উদ্যোগেই মিগ নিয়ে আকাশে উড়েছে। খবরটা জেনে তক্ষুণি Air traffic control-এর মাধ্যমে লিয়াকতকে অবিলম্বে নেমে আসার নির্দেশ দিয়ে তাকে ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স-এ আসার জন্য বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখার পরপরই মেস ওয়েটার এসে জানাল প্রাতঃরাশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গরম গরম আলুভাজি, ডালপুরি ও চায়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে রেজিমেন্টের ফিল্ড মেসে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমন্ত্রণ

www.nagorikpathagar.org

জানালেন নাস্তার জন্য। নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এসেছি, হঠাৎ নজরে পড়ল কর্নেল মান্নাফ ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রিগেডিয়ার বেরিয়ে আসামাত্র তিনি ত্রস্তপায়ে এগিয়ে এসে সেল্যুট করে বললেন, " Khaled you are the Boss, I salute you as a deciplined soldier and I am with you." ১৫ আগষ্ট সকালে ঠিক একই কায়দায় তিনি আমাকে একই কথা বলেছিলেন। সেদিন একজন সিনিয়র অফিসার হিসাবে তার ঐ ধরনের ব্যবহারে আমি বেশ বিব্রতবোধ করেছিলাম। সামান্য একটা চাকুরির জন্য আত্মসম্মানও যারা বিকিয়ে দিয়ে গিরগিটির মত রূপ পাল্টাতে পারেন সেই সমস্ত দুর্বল চরিত্রের অফিসারদের পক্ষে কখনোই তাদের অধিনস্ত সহকর্মীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করা সম্ভব নয়। তার ঐ ধরনের গায়ে পড়া মোসাহেবীপনা সবার কাছেই হাস্যকর মনে হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। মুচকি হেসে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন,

— Let's get down to business, we have to discuss a lot.

আমরা সবাই আবার গিয়ে বসলাম আলোচনায়। আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার পর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন এসে আলোচনায় শরিক হলেন।

— তুমি অযৌক্তিকভাবেই সব ঘটনার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছ। যা ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র একা আমি দায়ী নই। জিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছে কোন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। মোশতাক এবং জিয়ার উপর ভীতশ্রদ্ধ; তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে এদের বিরুদ্ধে। বলেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাখায়াত, মেজর হাফিজ,ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন কবির প্রমুখের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এদের অনুরোধেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

বুঝলাম, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী চতুর ব্রিগেডিয়ার খালেদ অতি কৌশলে গা বাঁচিয়ে অন্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

— জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বটা কি আপনিই নিবেন স্যার? আমার প্রশ্নের জবাবে নিজের সাফাই দেবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

— তুমি কি মনে কর চীফ হওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি?

— আমি কিছুই মনে করছি না, শুধু জানতে চাইছি, আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? কি আপনাদের দাবি-দাওয়া। আপনাদের দাবিগুলো পরিষ্কারভাবে জানার পরইতো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা সম্ভব, তাই নয় কি স্যার? ক্ষমতার লড়াই এবং রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যেইতো ছুটে এসেছি আমি ও নূর। ইনশাল্লাহ্ দেশ ও জাতিকে

www.nagorikpathagar.org

ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবোই যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে। আমার বক্তব্য শেষ হতেই ল্যান্সারস-এর ক্যাপ্টেন নাসের উঠে বলল.

— Yes, we want Brigadier Khaled to be our Chief. 'Yes' Yes' উৎসাহী সমর্থন শোনা গেল কিছু তরুণ অফিসারের গলায়। ঠিক সেই সময় duty officer খবর নিয়ে এল স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত এসেছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ duty officer-কে বলল লিয়াকতকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে। লিয়াকত ঘরে ঢুকে সেল্যুট করতেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ জিজ্ঞাসা করলেন,

— What's up man ! Why did you took off ?

— Sir, I got Information that Col. Farooq had started up his tanks at the racecourse and was moving towards the cantonment that's why I went up.

ডালিম, তুমি বলছ রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যই তোমরা এখানে এসেছ অথচ তোমাদেরই একজন ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। Is itn't a contradiction ? How can you justify this ?

— Sir, please have trust on me. Let me check what is happening. I assure Sir nothing of that kind would ever happen. বলেই পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলাম কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগের জন্য। ঘরে ঢুকেই দেখি এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবকে ইতিমধ্যেই ধরে আনা হয়েছে। বিমর্ষ চিত্তে নির্বাক হয়ে বসেছিলেন তিনি। পাশেই নেভ্যাল চীফ রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খানও বসে আছেন দেখলাম। তারও একই অবস্থা। শংকা-উদ্বেগে দু'জনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তারা দু'জনেই যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। এয়ার চীফ ত্রস্তে উঠে এসে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

— ডালিম, তুমি এখানে ! কি হচ্ছে বলতো ? তার প্রশ্নের জবাবে শুধু বললাম,

— স্যার, ঘাবড়াবেন না। Take it easy. চুপচাপ বসে দেখেন কি হচ্ছে। টেলিফোন তুলে নিয়ে বঙ্গভবনে কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগ করলাম।

— রশিদ, ডালিম বলছি ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। এখানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল এবং অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব এবং রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খানও আছেন। জেনারেল জিয়াকে তার বাসাতেই রাখা হয়েছে। আমার সাথে নুরও রয়েছে। আলোচনা চলছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদের নির্দেশে লিয়াকত মিগ উড়ানো বন্ধ করে এখানে ফিরে এসেছে। তারা অভিযোগ করছেন কর্নেল ফারুক নাকি তার ট্যাংক বহর নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ; যদি খবর সত্যি হয়ে থাকে তবে তাকে এ

www.nagorikpathagar.org

ধরনের উদ্যোগ নিতে নিষেধ কর। No tanks should roll down the street whatsoever. ওদের দাবি-দাওয়া জেনে নিয়ে আমি আসছি বঙ্গভবনে as soon as possible. ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলেছি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশে আলোচনার জন্যই আমি ও নূর এসেছি। তারা আলোচনায় যখন রাজি হয়েছেন এবং আলোচনা চলছে, সেক্ষেত্রে you have to ensure that no provocative action is initiated from our side. Please talk to Farooq and tell him to restrain himself.

— আমি এক্ষুণি কর্নেল ফারুকের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বলছি এ ধরনের কোন উদ্যোগ না নিতে। জবাব দিল কর্নেল রশিদ। কন্‌ফারেন্স রুমে ফিরে এসে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— Don't worry Sir, Col. Farooq will not move his tanks. আমার কথা শোনার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাস করলেন,

— Where is air Vice marshal Towab ?

— He is here Sir জবাব দিল অফিসার।

— Bring him in. নির্দেশ দিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ। এভিএম তোয়াবকে নিয়ে আসা হল কন্‌ফারেন্স রুমে। ভিতরে ঢুকে সবাইকে দেখে তিনি কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন,

— Well Khaled, would you please tell me why the airchief has been brought here in such a disgraceful way! What's happening ? Where do I stand ? Am I still the Chief ? তার কথা শেষ না হতেই ক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে গর্জে উঠল স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত,

Shut up you ! You are no more the Chief. I have taken over the command of the airforce. লিয়াকতের কথার ধরণে স্লিপিং স্যুট পরিহিত এভিএম তোয়াব কুঁকড়ে গিয়ে বসে পড়লেন খালি একটা চেয়ারে।

— Make him sit in someother place বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তার আদেশে জনাব তোয়াবকে আবার পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এই ড্রামার পর আবার আমাদের আলোচনা শুরু হল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন.

—ডালিম, আমাদের দাবি চারটি ঃ

১। খন্দকার মোশতাকই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

২। বর্তমানের তিন চীফ অফ স্টাফকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের জায়গায় গ্রহণযোগ্য নতুন চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে আর্মি, এয়ারফোর্স এবং নেভীতে।

www.nagorikpathagar.org

৩। আর্মিতে Chain of command re-establish করতে হবে। বঙ্গভবন এবং শহরে deployed সমস্ত ট্রুপস এবং ট্যাংকস ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

৪। বাকশালী শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে বর্তমানের সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। বহুদলীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

বুঝতে পারলাম, বর্তমানে জনগণের মানসিকতা এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করেই দাবিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার সাথে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে উল্টে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এ ধরনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের কাজ নয় এবং এর পিছনে যে অজানা চানক্যরা রয়েছেন সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না আমার। যাই হোক, সব শুনে আমি বললাম,

—ঠিক আছে খালেদ ভাই। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন, তবে বঙ্গভবনে যাওয়া যাক। আমার প্রস্তাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যরা কেন জানি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কর্নেল শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদের হয়ে জবাব দিলেন,

— ব্রিগেডিয়ার খালেদ বঙ্গভবনে যাবেন না। তার প্রতিনিধি পাঠানো হবে। জবাব শুনে রসিকতাচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— আমরাতো নিজেরাই ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সাথে কোন আলোচনা করতে আদৌ রাজি হবেন কিনা সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তবু এসেছি। আপনাদের সাথে বসে আলোচনা করতে আমাদেরতো কোন ভয় হচ্ছে না; সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিধি পাঠাতে চাচ্ছেন কেন? নিজেই চলুন না আমাদের সাথে। ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার? For heaven's sake have a heart! We must have mutual trust and confidence and that is the only basis on which we shall succeed to find out a way to salvage the nation from this uncalled for crisis. Don't you agree with me Sir? আমার রসিকতার কোন জবাব দিলেন না খালেদ ভাই। ঠিক হল, তাদের তরফের প্রতিনিধি হয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক যাবেন আমাদের সাথে বঙ্গভবনে। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দু'জনকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম বঙ্গভবনে।

www.nagorikpathagar.org

আসার পথে দেখলাম রাস্তাঘাটে মানুষজন নির্লিপ্তভাবে চলাফেরা করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকা শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক অবস্থার আড়ালে কি ভীষণ বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে জনগণ এখন পর্যন্ত বে-খবর। অন্যান্য দিনের মতই আজও তারা বেরিয়ে পড়েছে জীবিকার তাড়নায়।

বঙ্গভবনের গেটেই নজরে পড়ল বিডিআর-এর সশস্ত্র সৈনিকরা পজিশন নিয়ে আছে। মিলিটারি সেক্রেটারীর কামরায় কর্নেল মান্নাফ ও মেজর মালেককে বসিয়ে আমি ও নূর গিয়ে ঢুকলাম প্রেসিডেন্টের কামরায়। সেখানে প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল ওসমানী ও কর্নেল রশিদকে আলাপরত অবস্থায় পেলাম। হুদা ব্যস্ত ছিল নোট নেয়ায়। আমরা ঢুকতেই তারা জানতে চাইলেন, ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা কি ? আমি বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলে জানালাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বেই ঘটেছে সব কিছু। তাদের সবার তরফ থেকে চারটি দাবি নিয়ে এসেছেন কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। এরা দু'জনেই জেনারেল ওসমানীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ; তাই নাম শুনতেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন,

— How could they give their allegiance to Khaled ! জবাবে আমি বললাম,

— স্যার, মানুষের চরিত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীল। এ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই এখন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূল সমস্যা নিয়েই ভাবতে হবে। সবাই আমাদের অভিমত কি সেটা জানতে চাওয়ায় নূর ও আমার পক্ষ থেকে আমিই আমাদের অভিমত জানালাম।

— প্রথমত, আমি মনে করি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের এই Putch কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমরাই বেশি শক্তিশালী। জনগণ এবং সৈনিকরা যখন তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে তখন এই ক্যু' তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। শুধু তাই নয় ; তখন তারা এর বিরোধিতা করার জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের তরফ থেকে কোন প্রকার সামরিক অভিযানের তৎপরতা হবে আত্মঘাতী। তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়ার আগে কোন প্রকার সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে দেশের জনগণ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের সৈনিকরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়বে, ফলে দেশে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটবে ; জনগণ এটাকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই হিসাবে বিবেচনা করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সব কিছু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়েও রাখতে পারে। এই দুই ধরনের অবস্থারই পূর্ণ সুযোগ নিবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ত্রাণদাতা হিসাবে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরাজিত শক্তিকে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে দেশকে আবার নিয়ে যাবে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্বাবস্থায় ; জনগণের কিছু বোঝার আগেই। এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত

www.nagorikpathagar.org

হবে না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি এই সময় কোন প্রকার দ্বন্দ্বে না গিয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরে দাঁড়াই, তবে আমার বিশ্বাস, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খালেদ চক্রের নিজস্ব কীর্তিকলাপের মাধ্যমেই খসে পড়বে তাদের মুখোশ; ফলে দেশবাসী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা জানতে পারবে তাদের আসল পরিচয়। সবাই যখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে, পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসন এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিনিময়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তাদের উস্কানি এবং মদদ নিয়েই পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন ; তখন যদি কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় খালেদ চক্রের বিরুদ্ধে, তবে সেই উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সমর্থন জানাবে দেশবাসী। ঠিক একইভাবে যেমনটি তারা জানিয়েছিল ১৫ আগষ্ট বিপ্লবকে। সেক্ষেত্রে জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের যে কোন হুমকির মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে জাগ্রত জনতা। সিপাহী-জনতার ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে ; যেমনটি হয়নি আগষ্ট বিপ্লবের পর।

দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি জাতিকে ধোঁকা দেবার জন্য কৌশল হিসাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা প্রেসিডেন্ট মোশতাককে সামনে রেখে আমাদের নিয়োজিত চীফ অফ স্টাফদের অপসারণ করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার হীন প্রচেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এই কাজটি হাসিল করার পর অতি সহজেই তাঁকে সরিয়ে তাদের রাজনৈতিক দোসরদের ক্ষমতায় পুনর্বহাল করবে তারা। তাই আমি মনে করি, জাতীয় বেঈমানদের নীল নক্শা বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কোনরূপ ভূমিকা রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যদি রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হয় তবে সেটা তাকে করতে হবে আগষ্ট বিপ্লবের চেতনার আলোকেই" তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেই। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের হাতে ক্রীড়নক হয়ে নয়। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রকে পরিষ্কার করে বলে দেয়া উচিত। তারা যদি প্রেসিডেন্টের শর্ত মেনে নিতে রাজি না হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের ছেড়ে দেয়াই উচিত হবে বলে মনে করি আমি। আমার বক্তব্যের আলোকে রুদ্ধদ্বার অবস্থায় আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করা হল। আমার যুক্তি মেনে নিয়ে সবাই একমত হলেন এই মুহূর্তে কোনরূপ সামরিক সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের প্রতিনিধিদের কি বলা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া হল। এরপর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেককে ডেকে পাঠানো হল প্রেসিডেন্টের অফিস কক্ষে। তারা দু'জনেই কামরায় ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সেল্যুট করে দাঁড়াল। ভাবগম্ভীর পরিবেশ। আমরাও রয়েছি একপাশে। প্রেসিডেন্ট মোশতাক জানতে চাইলেন,

— বলো, তোমাদের কি বলার আছে ? কর্নেল মান্নাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদের তরফের দাবিগুলো একটা একটা করে ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্টের জবাব জানতে চাইলেন।

www.nagorikpathagar.org

সব কিছু শুনে খন্দকার মোশতাক ধীরস্থিরভাবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বললেন,

Well I have heard you patiently. Go back and tell the people at the cantonment, if they want me to continue as the President then I shall execute my responsibilities at my own terms for the best interest of the nation and the country. I am not at all prepared to remain as the head of state and government to be dictated by some Brigadiers. Before anything I want the chain of command be restored immediately and Khaled should allow my three chief of staffs to comeover to Bangabhaban without any further delay. Khaled should also withdraw the troops from the relay station so that the national radio and TV can resume normal broadcasting at the soonest possible time. My priority at this time is to bring back normaley in the country. আমার নির্দেশ যদি খালেদ মানতে রাজি না হয় তবে তাকে বলবে he should comeover to Bangabhaban and takeover the country and do whatever he feels like. আমি একটা রিক্সা ডাইকা আগামসী লেনে যামুগা।

প্রেসিডেন্টের জবাব শুনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেকের সঙ্গে ফিরে এলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স-এ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যান্য সবাই আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। কর্নেল মান্নাফ সবার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খন্দকার মোশাতাকের কাঁধে বন্দুক রেখে তার অভিসন্ধি হাসিল করা সম্ভব হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের চাল যে করেই হোক না কেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী জনাব মোশতাক ধরে ফেলেছেন এবং তাই তিনি তার ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। মুহূর্তে চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ল সবাই। কর্নেল শাফায়াত ক্ষোভে বলে উঠলেন.

— How dare he speak's like that ? তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বলে উঠলেন,

— Allright, we shall see. বলেই কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মঈন, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, কর্নেল রউফ, মেজর মালেক প্রমুখকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের রুমে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসলেন। খালেদ চক্রের মূল সমস্যা ছিল, সেনা পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার এবং জাতীয় পরিসরে

www.nagorikpathagar.org

মোশতাক সরকারের জনপ্রিয়তা। আমাদের সমস্যা ছিল খালেদ চক্রের বাকশালপন্থী চেহারা উন্মোচিত না-হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় ভারতীয় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ না করে দেয়া। মিনিট বিশেক পর তারা ফিরে এলেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা শেষ করে।

— ডালিম, খন্দকার মোশতাক যখন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে তাকে প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বললেন, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

— জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটা হবে সংবিধান বিরোধী। তাছাড়া, আইনের মানুষ হয়ে জাষ্টিস সায়েম কি অসাংবিধানিকভাবে এভাবে রাষ্ট্রপতি হতে সম্মত হবেন ? জবাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

— Well, যে ভাবেই হোক না কেন ; এই হস্তান্তরকে আইনসম্মত করে নিতে হবে। জাষ্টিস সায়েমকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা থেকে আঁচ করতে অসুবিধা হল না কোন অদৃশ্য সুতার টানে তিনি এ ধরনের সংবিধান বহির্ভূত একটা সমীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ; কোন একটা বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।

— এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপ না করে আমরা কিছুই বলতে পারব না স্যার। আপনি আপনার প্রতিনিধিদের আমাদের সাথে দিয়ে দেন: বঙ্গভবনে ফিরে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের পর তার জবাব তারা আপনার কাছে নিয়ে আসবেন।

— বেশ তাই হবে। সম্মত হলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

— Well Sir if there is nothing else from your side, then I think we should leave now. বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেই ক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে খালেদ ভাই বললেন,

— ডালিম, একটা কথা আমরা জানি—তুমি, নূর, পাশা, শাহরিয়ার, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন ও অন্যান্যরা সবাই নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা যুদ্ধকাল থেকেই দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণাও প্রায় এক। আমাদের তরফ থেকে আমি পরিষ্কারভাবে বলছি। কর্নেল রশিদ এবং কর্নেল ফারুক ছাড়া কারো বিরুদ্ধেই আমাদের তেমন কোন অভিযোগ নেই। Rather we expect your co-operation to fulfil our dreams. I request earnestly, please join us strenthen our hands for the cause.

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা শুনে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অভাবনীয় প্রত্যাশা! বুঝতে পারছিলাম না তার এ প্রস্তাবে কতটুকু আন্তরিকতা রয়েছে। পাল্টা ক্যু'দেতার তাৎপর্য কি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসররা বুঝতে পারছেন না? এটা অসম্ভব! আর সব বুঝে শুনে এ ধরনের প্রস্তাব রাখার মানে হল এটাও একটি অতি সূক্ষ্ম চাল।

www.nagorikpathagar.org

প্রেসিডেন্টের মত আমাদেরও এই রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন চক্রান্তকারীরা। একটু ভেবে নিয়ে আমি জবাব দিলাম,

— স্যার, এখন পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কে ভাববার কোন সময়ইতো পেলাম না। তাছাড়া ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া আমাদের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব। স্যার, আপনার স্বপক্ষে যারা রয়েছে তাদের অনেকেই ১৫ আগস্টের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় আমাদের স্বপক্ষেই ছিল। এ সম্পর্কে আপনিও অবগত রয়েছেন। আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলছি, জেনারেল জিয়া আমাদের কিংবা আগষ্ট বিপ্লবের তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অথবা সেনাবাহিনীর স্বার্থ রক্ষা করে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এর কোনটাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। এ ধরনের অভিযোগ এবং প্রচারণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করি আমরা। বিনা কারণে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে তার উপর অনাস্থা আনার অজুহাতে এই ধরনের একটা জাতীয় সংকট সৃষ্টি করার উদ্যোগ কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এতটুকুই বলবো, ১৫ আগস্টের চেতনা এবং ৩ নভেম্বরের উদ্দেশ্য এক নয়। ১৫ আগষ্ট এবং ৩ নভেম্বরের ঘটনা কোন দিনই বাংলাদেশের ইতিহাসে একইভাবে লেখা হবে না।

স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের নাগপাশ এবং বিদেশী প্রভুদের যাঁতাকল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীনতার চেতনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল ১৫ আগস্টের মহান বিপ্লব। আগষ্ট বিপ্লবের সফলতা এবং এর প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন একটি উজ্জ্বল-অবিস্মরণীয় মাইলফলক হয়ে চিহ্নিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। আপোসহীন সংগ্রামী বাংলাদেশীদের জন্য জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিভূ হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। পক্ষান্তরে, ৩ নভেম্বরের ঘটনা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর জাতীয় স্বার্থবিরোধী চক্রান্তের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হবে ইতিহাসে। জানি, আমার এই বক্তব্য ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের কারো কাছেই গ্রহণীয় নয়; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতই আমার কথার সত্য-মিথা যাচাই করবে। আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করি সেটা যথাসময়ে আপনারা জানতে পারবেন।

এভাবেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে বঙ্গভবনে ফিরে এলাম। সঙ্গে এসেছিলেন তাদের দুই প্রতিনিধি কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। পথে নূর আমায় বলল,

— স্যার, আপনি যেভাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কথাগুলো বলছিলেন তাতে আমি কিন্তু বেশ কিছুটা শংকিতই হয়ে উঠেছিলাম। নূরের কথার কোন জবাব না দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম—

www.nagorikpathagar.org

যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে নূর। এতটা খোলাখুলিভাবে ঐ ধরনের কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কথাগুলো বেফাঁস বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে automatically. নিঃস্বার্থভাবে কোন সঠিক এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা হয়তো বা আল্লাহ্ তায়ালাই যুগিয়ে দেন।

বঙ্গভবনে ফিরে এসে প্রেসিডেন্টকে জানালাম। চক্রান্তকারীরা জাষ্টিস সায়েমের মাধ্যমে ক্ষমতা পুনর্দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সব শুনে প্রেসিডেন্ট মোশতাক জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার এ সিদ্ধান্তের কথা জেনে নিয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক বঙ্গভবন থেকে ফিরে যান।

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পর সেনা পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠক হয়। বৈঠকে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের exposed নেতারা কৌশলগত কারণে দেশ ত্যাগ করে দেশের কাছাকাছি কোন রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে অবস্থান নেবে। সার্বিক বিবেচনায় ব্যাংককেই সর্বোত্তম জায়গা হিসাবে বিবেচিত করা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কি করে খালেদ চক্রের পতন ঘটাতে হবে সেই বিষয়ে। জাতীয় বেঈমান পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠী এবং তাদের মুরুব্বী ভারতের হাতে ক্রীড়নক খালেদ চক্রকে উৎখাত করার জন্য সেনাপরিষদ কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী এবং জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক অন্যান্য দল ও গ্রুপ ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে খালেদ চক্রের মুখোশ উন্মোচিত হবার পর উপযুক্ত সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট মোশতাক এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সম্পর্কে। সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ চক্রের পতনের পর সর্বপ্রথম কাজ হবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাঁকে আবার সেনাপ্রধান হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, নেতৃবৃন্দের যে অংশ ব্যাংককে অবস্থান করবে তার সাথে প্রয়োজনমত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে সেনাপরিষদ। জরুরী বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের ইউনিটগুলোকে জানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। কর্নেল তাহেরও তখন বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। বৈঠক যখন শেষ হয় তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংককে যাবার সব ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েট থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে আমাদের দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য ফোন করলাম,

— স্যার, আমাদের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি হয়তো বা জেনেও থাকতে পারেন। তবুও কথা দিয়ে এসেছিলাম তাই কথা রক্ষার্থে জানাচ্ছি ঃ রশিদ, ফারুক, শাহরিয়ার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ , মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, মোসলেম, হাশেম, মারফত এবং আমি সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতেই চলে যাব আমরা। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েটের মাধ্যেমে। আপনার সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না স্যার। দেশ ও জাতির জন্য ভবিষ্যতে আর কিছু করার তৌফিক আল্লাহ্পাক যদি নাই দেন সেটা মেনে নিতে পারব; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে '৭১ -এর চেতনা এবং নীতির প্রশ্নে আপোস করে জাতীয় বেঈমান হিসাবে পরিচিতির যে গ্লানি সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়; হবেও না কোনদিন।

— রশিদ-ফারুক সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মনোভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে যেতে চাইতে পারে, কিন্তু তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ কেন, সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আবার কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

মুখে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও বুঝেছিলাম আমাদের দেশ ত্যাগের খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়েই বেঁচেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা এটা ভেবে যে, তাদের প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর threat থেকে রেহাই পেলেন তারা।

এভাবেই দেশ ও জাতিকে একটি সম্ভাব্য আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে খালেদ চক্র ও নব্য চানক্যদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করে কৌশলগত কারণেই ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটি স্পেশাল ফ্লাইটে আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমাদের দেশ ত্যাগের মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে মূলত সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধীনস্ত গণবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লব। ক্ষমতাচ্যুত হয় খালেদ চক্র। জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেয় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা। দেশের আপামর জনসাধারণ ৭ নভেম্বরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়ে সেনাবাহিনীর বীর জোয়ানদের সাথে যোগ দেয় ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা সমর্থন জানিয়েছিল আগষ্ট বিপ্লবকে। এই দুই ঐতিহাসিক দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগ্রামী জনতার ঢল নেমেছিল পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে, শহরে-গ্রামে। নামাজে শুকরানা আদায় করেছিলেন

www.nagorikpathagar.org

মুসল্লিরা মসজিদে-মসজিদে। শহর-বন্দরে খুশীতে আত্মহারা জনগণের মাঝে মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং জনগণের একাত্মতায় সৃষ্টি হয়েছিল এক দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য। সেই দুই ক্রান্তিলগ্নে সম্মিলিতভাবে তারা বাংলাদেশকে পরিণত করেছিল এক দুর্জয় ঘাঁটিতে। সমগ্র জাতি প্রস্তুত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন আগ্রাসন কিংবা হুমকির বিরোধিতা করার জন্য। সফল বিপ্লবের পর কুচক্রীদের নেতা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ এবং তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। কর্নেল শাফায়াত জামিল ও অন্যান্যদের বন্দী করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে আবার তাঁকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আবেদন জানান কিন্তু জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ জেনারেল জিয়াউর রহমানের আবেদনে পুনরায় রাষ্ট্রপতি হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি ঐদিনই জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দান করে ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৫ আগষ্ট এবং ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনা দুইটি একই সূত্রে বাঁধা। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল এই দুইটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ১৫ আগষ্ট অগ্রণীর ভূমিকায় ছিল সেনা পরিষদ আর ৭ নভেম্বর একই দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেছিল সেনাপরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্ত গণবাহিনী। এই দুইটি ঐতিহাসিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনা, ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার চেতনা, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার চেতনা—এক কথায় বলতে গেলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর এই সময়ের আমার এ ঘটনা বিবরণের পক্ষে প্রমাণ হয়ে আছে ৭ নভেম্বর সফল বিপ্লবের পর সৈনিক-জনতার মুখে ধ্বনিতে শ্লোগানগুলি। সেদিন ঢাকর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল গগনবিদারী শ্লোগানে,

— নারায়ে তাক্‌বীর। আল্লাহু আক্‌বর।

— খন্দোকার মোশতাক জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

— মেজর ডালিম জিন্দাবাদ। কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ।

— ডালিম তাহের ভাই ভাই। বাকশালীদের রক্ষা নাই।

— রশিদ-ফারুক জিন্দাবাদ। খালেদ মোশাররফ মুর্দাবাদ।

— জেনারেল জিয়া যেখানে, আমরা আছি সেখানে।

www.nagorikpathagar.org

পঁচাত্তরের নভেম্বরে যা ঘটেছিল

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

স্থান বঙ্গভবন। তারিখ ২ নভেম্বর, ১৯৭৫। সময় রাত ১২-৩০টা। কর্নেল রশিদ ঘুমাতে যাচ্ছেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ অফিসার। স্যার সর্বনাশ হয়েছে বঙ্গভবন প্রহরারত সৈন্যরা চলে যাচ্ছে। সমূহ বিপদের আশংকা। আর সবাইও চলে যেতে চাচ্ছে। কর্নেল রশিদ বুঝলেন সংকট শুরু হয়েছে। ক'দিন ধরে যে বারুদের গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে এখন তা নাকে ঢুকছে। রহস্যাবৃত '৭৫-এর নভেম্বর-এর সঙ্কটময় দিনগুলোর শুরুটা এরকম। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকেই সেনানিবাস ও ঢাকা শহরে জোর গুজব রটেছিল একটা কিছু হতে যাচ্ছে। খোদ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদও জানতেন একটা কিছু হতে যাচ্ছে [Anthony Mascaranhas : Bangladesh : A Legacy of Blood, পৃঃ ৯০] কিন্তু ঘটনার ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মোটামুটিভাবে সেনাবাহিনী বনাম বঙ্গভবন স্নায়ুযুদ্ধের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল।

টাগ অফ ওয়ার

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীর কারণে সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব তথা নিয়ন্ত্রণের সঙ্কট দেখা দেয়। একটি সফল অভ্যুত্থানের স্বাভাবিক অনিবার্যতায় সেনাবাহিনীর 'চেইন অফ কমান্ড' ভেঙ্গে পড়ে। আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবনে স্থান নেন। তারা সেখান থেকে সফলভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেও সেনাবাহিনীর সাথে সঙ্গত কারণেই বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা মেজরদের এই আচরণকে 'মেজর জেনারেলের' আচরণের মত মনে করেন। (এমাজউদ্দীন আহমেদ, পৃঃ ৭৩) সিনিয়ররা চাচ্ছিলেন মেজররা সেনানিবাসে ফিরে এসে তাদের কমান্ড মেনে চলুক। কিন্তু রশিদ-ফারুকরা নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষমতা গ্রহণের উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সেনানিবাসে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। ৬ জন ক্যু নেতা তাদের ট্যাঙ্ক বহর ও সেনা সামন্ত নিয়ে বঙ্গভবন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। অপরদিকে সেনাবাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ (সিজিএস)

www.nagorikpathagar.org

খালেদ মোশাররফ এবং ঢাকা ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিল সেনানিবাস নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এই দুই সিনিয়ার অফিসার প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, তারা এক দেশে দুই সেনাবাহিনী এই অবস্থাকে কোনক্রমেই মেনে নেবেন না। খালেদ ও জামিল রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়ে আগস্ট বিপ্লবকে মেনে নিতে পারেননি। খালেদ ছিলেন অনেক সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আর শাফায়াত জামিলের 'হট হেডেট' বলে বদনাম ছিল। (পরবর্তী ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ মেলে)।

বিবদমান এ দু'পক্ষের মাঝে অবস্থান করছিলেন মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান। জাতির এই দু'জন অভিভাবকই চাইতেন দু'পক্ষের সমঝোতা। তাই কোন গ্রুপকে বিরূপ করতে পারে এরকম কার্যব্যবস্থা গ্রহণে তারা উভয়ই বিরত ছিলেন। জিয়া তার উত্তরাধিকার এবং আচরণের কারণেই উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন। সেনা সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষতা বা সমদূরত্ব বজায় রাখেন। পরবর্তীকালে তার এই ভারসাম্যের কারণে উভয় পক্ষের অনাস্থার সম্মুখীন হন। জেনারেল ওসমানীও প্রায়ই একই অবস্থার সম্মুখীন হন। তবে ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসাবে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন। ১৫ আগষ্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে কিছুটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে। পরস্পর অবিশ্বাস, সন্দেহ, হানাহানি চরমে উঠে। শান্তি-সম্প্রীতির পরিবর্তে হিংসা ও শত্রুতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩ নভেম্বর ক্যু

২ নভেম্বর গভীর রাতে পাল্টা অভ্যুত্থান প্রক্রিয়া শুরু হয়। বঙ্গভবন থেকে সেনা প্রত্যাহারের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে খন্দকার মোশতাকের সাথে ক্যুর নেতারা সলাপরামর্শে বসেন। কর্নেল ফারুক চাইলেন বিমানবন্দর, ঢাকা সেনা সদর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে। ধীরস্থির মানুষ কর্নেল রশিদ রক্তপাত এড়িয়ে সঙ্কটমুক্তির কথা বললেন। খন্দকার মোশতাকও আপস-রফার পরমর্শ দিলেন। কর্নেল ফারুক ত্বরিত গতিতে তিনটি কাজ করলেন ঃ

১। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ,

২। ব্যক্তিগতভাবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত ট্যাঙ্ক বহরের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং

৩। বঙ্গভবনে অবস্থানরত ট্যাঙ্কগুলোকে প্রধান ফটকের বাইরে ডিফেন্সিভ অবস্থানে স্থাপন।

এদিকে কর্নেল রশিদ সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াকে ফোন করলেন। জিয়া তখন ঘুমে। বেগম জিয়া তাঁকে ডেকে তুললেন। কর্নেল রশিদ জিয়াকে তখনই বঙ্গভবনে আসার

www.nagorikpathagar.org

অনুরোধ জানালেন। জিয়া এবারও মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে বিচ্যুত হলেন না। তিনি বঙ্গভবনে না এসে কর্নেল রশিদকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন। তারপর কর্নেল রশিদ খালেদ মোশাররফকে ফোন করলেন। খালেদ মোশাররফ তাকে বললেন, যা প্রত্যাশিত তাই হচ্ছে। তিনি রশিদের সাথে ফোনে আলাপ সংক্ষিপ্ত করলেন। তারপর বিপদাপন্ন মেজররা একে-একে অনেককে ফোন করলেন। বিডিআর, এয়ার চীফ, নেভি চীফ— সবাই তাদের হতাশ করলেন। কিন্তু কেউ না এলেও সেনাবাহিনীর 'ঐক্যের প্রতিভূ' ওসমানী এলেন। তিনি এসেই জিয়াকে ফোন করলেন। ততক্ষণে জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওসমানী খালেদকে ফোন করলেন। খবর পাওয়া গেল খালেদ মোশাররফ ক্যু-এর নেতৃত্ব স্বহস্তে পরিচালনা করেছেন। কর্নেল শাফায়াত জামিল প্রধান মিত্র হিসাবে তার সাথে রয়েছেন। ইতোমধ্যে পাল্টা অভ্যুত্থানকারীরা বেতার, টিভি, এয়ারপোর্ট টেলিফোন ভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলে নিয়ে আসে। জিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করে। একটি গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি অত্যাসন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এমনি এক পরিস্থিতিতে রাত ৩ টার পরে খালেদ নিজে রশিদকে, ফোনে 'নরম-গরম' কথা বলেন। রশিদ আপসের কথা না বলে মোকাবেলার কথা বলেন। ভোর হওয়ার আগেই শাফায়াত জামিলের ৪৬ ব্রিগেড বঙ্গভবন ঘেরাও করে। সেখানে এক নিদারুণ ভীতিজনক পরিস্থিত বিরাজ করছিল। রশিদ নিজেই ট্যাঙ্ক বাহিনীর তদারকি করছিলেন। বঙ্গভবনে যখন এই ভীতিজনক অবস্থা তখন কেন্দ্রীয় কারাগারে আরও ভীতিজনক ঘটনা ঘটে যায়। আওয়ামী লীগের চার নেতা তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী এবং সৈয়দ নজরুল নিহত হন। এই চার নেতা বিশেষত তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে ভারতের সহায়তায় পাল্টা সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন এমন একটি গুজবের তাঁরা পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা নিহত হন। (সূত্র ঃ Lawrence LifsChultz : Bangladesh . The Unfinished Revolution) ৩ নভেম্বর সকাল হতে না হতেই পরিস্থিতি আরও গরম হয়ে উঠে। বিমান বাহিনী প্রধান তোয়াবের নির্দেশে (তোয়াবকে সেপ্টেম্বরে রশিদরাই বিমান বাহিনী প্রধান নিয়োগ করেন) দুটো মিগ বঙ্গভবনে বোমাবর্ষণের মহড়া দেয়। খন্দকার মোশতাক ভূগর্ভস্থ বাংকারে আশ্রয় নেন। জেনারেল ওসমানী উস্কানির মুখে সবাইকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ জানান। সকালের দিকে খালেদ মোশাররফের পক্ষ থেকে একটি ছোট প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে এসে হাজির হন। এদের মধ্যে ছিলেন দু'জন কর্নেল। খালেদ মোশাররফের দাবী ছিল ৩টি–

১। ট্যাঙ্কবহরকে সেনানিবাসে ফেরত দিতে হবে।

২। জিয়ার বদলে একজন নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ করতে হবে।

৩। খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসাবে বহাল থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বন্ধু দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রাখতে হবে। (স্পষ্টত ভারত এবং রাশিয়ার কথা বলা হয়েছে)। খন্দকার মোশতাক দাবীসমূহ অগ্রাহ্য করেন এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তার পদত্যাগ ৩ নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে কার্যকর হবে বলেও তিনি প্রতিনিধি দলকে জানিয়ে দেন। দু'ঘন্টা পর প্রতিনিধি দল আবার ফিরে আসে। তারা এবার তৃতীয় দাবীটি উহ্য রাখে। ট্যাঙ্ক প্রত্যাহারের চেয়েও তারা একজন নতুন সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের জন্য চাপ প্রয়োগ করে কিন্তু প্রতিনিধি দলের কেউই খালেদ মোশাররফের নাম প্রস্তাব করেনি। খন্দকার মোশতাক আবার একই কথা বলেন। তিনি যেহেতু প্রেসিডেন্ট হিসাবে পদত্যাগ করেছেন, সুতরাং তিনি কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না। জেনারেল ওসমানীকে প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে জানালে তিনি ক্ষেপে যান। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করায় স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসাবে কার্যকারিতার অবসান ঘটেছে। বৃদ্ধ জেনারেল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, “তোমরা গোল্লায় যাও, যা ইচ্ছা তাই করো, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।” এর পরেও কয়েক ঘন্টা ধরে ঐ লোকেরা বঙ্গভবন-সেনানিবাস দৌড়াদৌড়ি করেন। কিন্তু তাদের দূতিয়ালী ব্যর্থ হয়। রশিদ অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। অনেক টানাপোড়েনের পরে মেজর হাফিজের মধ্যস্ততায় একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয়, মোশতাকের অনুরোধে উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে আগস্ট ক্যু নেতারা বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে যাবেন। সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয়সহ সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবেন। বিমান বাহিনীর প্রধান এমজি তোয়াবকে এসব নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ৩ তারিখে মাগরেব ওয়াক্তে আগস্ট ক্যু-এর নেতৃবৃন্দ তাদের পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকারে করে ব্যাঙ্ককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক তাঁর নিজ বাসভবনে যাওয়ার জন্য তৈরী হন। খালেদ মোশাররফ তাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। সবার অনুরোধে মোশতাক রাজি হন। তিনি দুটো শর্ত দেন। ১৫ আগস্টের পরে যেমন তিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনী তার প্রতি অনুগত থাকতে হবে, এবারও তেমনই বললেন। আরও বললেন, মন্ত্রিসভাকে খোলামেলা আলাপ-আলোচনার পর তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। খালেদ মোশাররফ দুটো শর্তই মেনে নেন। তার পরদিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক আহুত হয়। ২৬ সদস্যের কেবিনেট বঙ্গভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কেবিনেট রুমে বৈঠকে বসে জেল হত্যার তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেন। মন্ত্রীদের অনেকেরই কথাবার্তায় নতুন সুর। তারা প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাককে হত্যাকারীদের বিদেশ যেতে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। মন্ত্রিসভা খালেদ, জেনারেল খলিল, তোয়াব এবং কমোডার খানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে।

www.nagorikpathagar.org

আকস্মিক ঘটনা

মন্ত্রিসভা যখন এমনতর অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিল তখন ঘটে সেই নাটক। যা ঘটনাবলীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আকস্মিকভাবে সজোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। হাতে সেনাসুলভ বেতের ছড়ি। সাথে স্টেনগানসহ ৫ জন অফিসার। এতে মন্ত্রীরা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করেন। একজন খন্দকার মোশতাকের মাথায় স্টেনগান ঠেকায়। ওসমানীর হস্তক্ষেপে মোশতাক বেঁচে যান। শাফায়াত জামিল খন্দকার মোশতাককে জাতির পিতার হত্যাকারী এবং মীরজাফর ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেন। তিনি তার পদত্যাগ দাবী করেন। ওসমানীও মোশতাককে পদত্যাগের পরামর্শ দেন। মোশতাক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। মোশতাক লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন। শাফায়াত জামিলরা মোশতাককে দিয়ে আরও দু'একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিয়ে রাখেন। এবার শাফায়াত জামিল প্রস্তাব করেন প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন। মন্ত্রিসভার কে-একজন পরামর্শ দেন—প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট উভয়ই মৃত। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা স্পীকারের কাছেই হস্তান্তরিত হওয়া উচিত। এতে শাফায়াত জামিল রেগে যান এবং তার কথামত দু'জন করিৎকর্মা মন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জেম এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হয়।

৫ নভেম্বর সায়েম প্রেসিডেন্ট

প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে ৫ নভেম্বর বেলা একটার সময় বঙ্গভবনে নিয়ে আসা হয়। ওসমানী তাকে সুসংবাদটি দিলে তিনি আমতা-আমতা করতে থাকেন। অবশেষে অনুরোধে ঢেঁকি গেলেন। তাঁর সম্মতির ভিত্তিতে পরদিন অর্থাৎ ৬ নভেম্বর তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত চার বছরে দেশের ৫ম প্রেসিডেন্ট হলেন 'সায়েম'। ৬ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

ক্যু ঃ রাজনৈতিক চরিত্র

৩ নভেম্বরের ক্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু সংবেদনশীল ঘটনা ঘটে। রুশ-ভারতপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলো ৪ নভেম্বর 'মুজিব দিবস' হিসেবে পালন করেন। তারা ঢাকা শহরে মুজিব স্মরণে শোক মিছিল বের করেন। একটি মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধ মাতা এবং ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ এমপি। দেশের ডান-বাম সব রাজনৈতিক শক্তিই ৩ নভেম্বর ক্যুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করে।

www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনী পরিস্থিতি

১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর ক্যুকে সাধারণ সৈনিকরা অফিসারদের ফায়দা হাসিলের কারসাজি হিসাবে চিহ্নিত করে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সময়ে তদানীন্তন সরকারের সেনাবাহিনীর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণে সৈনিকরা ছিল ক্ষুব্ধ। তারা খালেদের ক্যুকে ভারতপন্থী বলে মনে করে একে রুখে দাঁড়াতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। জাসদ-এর নেতৃত্বাধীন সৈনিকদের সংগঠন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' খালেদ মোশাররফের ক্যুকে প্রো-ইন্ডিয়ান ক্যু বলে প্রচার করে। তারা খালেদকে অপসারণের আহবান জানিয়ে ক্যান্টনমেন্টে লিফলেট বিতরণ করে। এসব লিফলেট সৈনিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কর্নেল শাফায়াত জামিল ৪৬ ইনফেনট্রি ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করা সত্ত্বেও নিজেকে নিরাপদবোধ করছিলেন না। তিনি ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সার এবং রশিদের ২নং ফিল্ড আর্টিলারীকে অস্ত্রহীন অবস্থায়ও বিপজ্জনক মনে করেছিলেন। তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি রংপুর থেকে ১০ম এবং ১৫শ ইস্ট বেঙ্গলকে ডেকে পাঠান কিন্তু এ দুটো রেজিমেন্ট সময়মত ঢাকা আসতে ব্যর্থ হয়। মুজিব হত্যার সাথে জড়িত এবং অন্যান্য সাধারণ সৈনিকরা বদরাগী ও কঠোর শাফায়াত জামিলকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পক্ষান্তরে জিয়াউর রহমান সৈনিকদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তার গ্রেফতার সৈনিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ছিলেন সৈনিকদের কাছে পিতৃতুল্য। নানা কারণে খন্দকার মোশতাকও সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দেশ পরিচালনায় এসব নেতার অনুপস্থিতি সৈনিকদের মধ্যে হতাশা ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়।

বিপ্লবের প্রস্তুতি

কর্নেল তাহের তখন অসুস্থ ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের বাসায় ছিলেন তিনি। তিনি বলেন, ৩ তারিখ ভোর ৪টায় আমি একটি টেলিফোন কল পাই। অপরপ্রান্তে ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি তার হাউসএরেস্ট হওয়ার কথা আমাকে জানালেন। সাহায্য চাইলেন। এরপর টেলিফোন লাইন কেটে গেল। ঐদিন বেশকিছু এনসিও এবং জেসিও আমার বাসায় আসে। তারা জানায়, খালেদের ক্যু-এর পিছনে ভারত আছে। বাকশালীরা আবার ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে। তারা আরও জানায়, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অন্যান্য কোর ট্রুপস-এর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় গুলি শুরু হতে পারে। (Col. Taher : last Testament) তাহের এসব সৈনিকদের কাজে লাগান। সৈনিকদের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৬ নভেম্বর সন্ধ্যারাতে যে কোন নির্দেশের জন্য সৈনিকরা প্রস্তুত থাকবে। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১টায় বিপ্লব শুরু হবে। বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ ঃ

www.nagorikpathagar.org

(ক) খালেদ মোশাররফদের অপসারণ, (খ) জিয়াউর রহমানের মুক্তি, (গ) বিপ্লবী সৈনিক কমান্ড কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, (ঘ) দল-মত নির্বিশেষে সকল বন্দীর মুক্তি, (ঙ) সর্বদলীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা (বাকশাল বাদে), (চ) বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা বাস্তবায়ন। (সূত্র ঃ Lawrence LifsChultz : পূর্বোক্ত পৃঃ ৯০)।

৭ নভেম্বর ঃ দিনলিপি

রাত ১টা ঃ ঢাকা সেনানিবাস। পরিকল্পনামাফিক সমস্ত সৈনিক ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্রগুদাম ভেঙ্গে অফিসারদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সৈনিকরা মিছিলে হাজির হয়। তাদের মুখে শ্লোগান ছিল "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর", "সিপাহী-জনতা এক হয়েছে এক হয়েছে" "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ", "জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ", "খোন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ।" তারা কিছু ক্ষতিকর শ্লোগানও দেয়। যেমন ঃ সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই, সুবেদারের উপরে অফিসার নাই ইত্যাদি। তারা রেডিও স্টেশন, টিভি, টেলিফোন ভবন, পোস্ট অফিস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

রাত ৩টা ঃ তারা অবরুদ্ধ জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারী সদর দপ্তরে জিয়াকে কাঁধে করে নিয়ে আসে সৈনিকরা। সৈনিকরা আনন্দ আপ্লুতভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে। অসংখ্য সৈনিক তাকে ফুলের মালা দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। তাকে কাঁধে নিয়ে নাচতে থাকে। জিয়া তখনও নাইটড্রেসে ছিলেন। জিয়া মুক্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে তাহের সেখানে পৌঁছেন। জিয়া আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেন। সৈনিকরা জিয়াকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করলে জিয়া তা তাহেরকে দিয়ে বলেন, এগুলো তাহের ভাইকেই মানায়।

রাত ৪টা ঃ তাহের গ্রুপের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক জিয়াকে রেডিও ভাষণের নামে শহরে নিয়ে আসার একটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে রাত দেড়টা নাগাদ সিপাহী-বিপ্লবের খবর বেতার মারফত দেশবাসীর কাছে পৌঁছে গেছে। জিয়াকে ঐসব ঘোষণার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জিয়া এ সময় বেতারে একটি ছোট ভাষণ দেন। (ভাষণটি সেনানিবাসেই রেকর্ড করা হয়।) ভাষণটি নিম্নরূপ ঃ

আমি জিয়া বলছি,

"প্রিয় দেশবাসী, আস্সালামু আলাইকুম। আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে অফিস-আদালত, যানবাহন, বিমান বন্দর, নৌ-বন্দর ও কল-কারখানাগুলো পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন।"

www.nagorikpathagar.org

খালেদ মোশাররফের কথা

সিপাহী-বিপ্লবের কথা খালেদ প্রথম জানতে পারেন ৬ তারিখ রাতে। ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে তাকে এ খবর দেয়া হয়। খালেদ বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন আগে থেকেই। এর আগের দিন তিনি তার স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনকে অজ্ঞাত নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। রাত ১১-৩০ টায় খালেদ শাফায়াত জামিলকে সাথে নিয়ে বঙ্গভবনে আসেন। সেখানে শীর্ষ পর্যায়ের একটি বৈঠক নির্ধারিত ছিল। বিপ্লবের খবর পেয়ে খালেদ বঙ্গভবনেই থেকে যান। পরে বিপদ বুঝে খালেদ তার নিজস্ব কারে কর্নেল হুদা, কর্নেল হায়দারসহ শেরেবাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ম ইস্টবেঙ্গল সদর দফতরের দিকে রওয়ানা হয়। পথে ফাতিমা নার্সিং হোম-এর কাছাকাছি এলে কারটি বিকল হয়ে যায়। খালেদ নার্সিং হোমে প্রবেশ করে একটি ফোন করেন। ওদিকে থেকে 'ওকে' সিগন্যাল পান। তারা তিনজন ১০ম ইস্টবেঙ্গলে উপস্থিত হন। সেখানেই রাত কাটান। ৭ নভেম্বর সকালের দিকে বিপ্লবী সিপাহীরা ১০ম ইস্টবেঙ্গলে যায়। তারা সিপাহীদের যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। সিপাহীরা দ্রুত মত পাল্টে ফেলে। খালেদকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বিপ্লবে যোগ দেয়। কমান্ডিং অফিসারের রুমে বসা ছিলেন তারা। সিপাহীদের বিপ্লবী তৎপরতায় ঐ ইউনিটের অফিসাররাও চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতিবিপ্লবী সাজার জন্য হোক অথবা তাহেরের প্রভাবেই হোক, দু'জন ক্যাপ্টেন খালেদসহ ঐ দু'জন অফিসারকে তখনই হত্যা করে। জিয়া যখন জানতে পারেন খালেদ ১০ম বেঙ্গলে রয়েছেন তখন তিনি কমান্ডিং অফিসারকে তার নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। অভিযোগ রয়েছে, টেলিফোনে ঐ নির্দেশটি দেয়ার সময় তাহের সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেটাই নাকি ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

www.nagorikpathagar.org

খালেদ-তাহের গং বনাম
সিপাহী-জনতার বিপ্লব-সংহতির মূলধারা

মারুফ কামাল খান

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি ছিলো ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসাবে এই তারিখটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে আছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের জবাব নতুন প্রজন্মের জানা দরকার। কারণ গত কয়েক বছর ধরেই ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বিকৃত করে এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে তুলে ধরছে একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল। সেই মিথ্যা, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির পর্দা সরিয়ে ৭ নভেম্বরের প্রকৃত উজ্জ্বল ইতিহাস তুলে না ধরলে দেশপ্রেমের শাণিত চেতনায় নতুন প্রজন্মের তরুণরা উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত হতে পারবে না। বিভ্রান্তির মেঘ এসে ঢেকে দেবে সত্যের প্রখর সূর্যকে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সুবহে সাদেকের সময় রাজপথে সূচিত সৈনিক-জনতার সংহতির মধ্যদিয়ে যে বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিলো তাতে পরাস্ত হয়েছিলো একদল কুচক্রী। সেদিন শুধু নয়, ওই ঘটনার পর অনেকদিন পর্যন্ত তাদেরকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাবার সাহস এদেশে কোনো রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছিলো না। সময়ের বিবর্তনে অনেক পরে এসে বিশেষ গোষ্ঠীটি ৭ নভেম্বরের ইতিহাস বিকৃতভাবে প্রচার শুরু করে। আরো পরে শুরু হয় সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতির বিরুদ্ধে বিষোদগার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭ নভেম্বরের বৈরী গোষ্ঠীটি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সরকারের সমর্থক এই চক্রটি সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে 'সৈনিক হত্যা দিবস' নামে অভিহিত করতে থাকে। অবশ্য ক্ষমতাসীন হবার প্রথম বছরেই এই সরকার ৭ নভেম্বর জাতীয় ছুটি বাতিল করার সাহস পায়নি। পরবর্তীকালে তারা কেবল ওই ছুটিই বাতিল করেনি, সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপনেও নানাভাবে বাধার সৃষ্টি এবং কর্মসূচিতে হামলা চালাতে শুরু করেছে। অর্থাৎ বর্তমান সরকার* এখন সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবসের প্রতিপক্ষে প্রকাশ্যেই অবস্থান

*১৯৯৬-২০০১ টার্মের আওয়ামী লীগ সরকার (সম্পাদক)

www.nagorikpathagar.org

নিয়েছে। একই সঙ্গে বর্তমান সরকার তাদের দালাল আরেকটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে ৭ নভেম্বরের ইতিহাস ও ঘটনাবলীকে বিকৃত করেও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। জাসদের এককালীন সশস্ত্র শাখা গণবাহিনীর নেতা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরকে ৭ নভেম্বরের 'হিরো' এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে চিত্রিত করাই ওই প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য। এ ধরনের বিভ্রান্তি, মিথ্যা প্রচার ও ইতিহাস বিকৃতি যখন চলছে এবং সিপাহী-জনতার বিপ্লবে পরাজিত শক্তির সমর্থকরা আজ যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে ৭ নভেম্বরের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চাইছে, সেই মুহূর্তে এই দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করা এবং এর শিক্ষা ও চেতনাকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

সংক্ষিপ্ত পটভূমি

৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতির স্বরূপ ও অনিবার্যতা বুঝতে হলে এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি জানা দরকার। এজন্য আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রাম এবং এর চূড়ান্ত পরিণতিতে সংঘটিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দিকে। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিলো এক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সামনে এগিয়েছে। ইতিহাসের নানা বাঁকে সেই প্রক্রিয়া থেকে অনেকে ছিটকে পড়েছেন, কেউ কেউ করেছেন বিশ্বাসভঙ্গ। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও অবসানের সময়েও এর সঙ্গে জনগণের নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ফলে সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। আবার শেষ মুহূর্তে এসে আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে থমকে দিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয় বিজয়ের গৌরব। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা 'ভারতের দয়ার দান' হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। অথচ এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অগণিত মানুষ জীবন দিয়েছেন, যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছেন, কোটি কোটি মানুষ সহ্য করেছেন অবর্ণনীয় নির্যাতন, অসংখ্য নারী হারিয়েছেন সম্ভ্রম। তাদের সীমাহীন ত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ভারত সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। ভারতের সঙ্গে গোপন এক অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে সই করে সেদিনের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তথাকথিত যৌথকমান্ডের নামে মুক্তিবাহিনীকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডের আওতায় ন্যস্ত করে। ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় বাহিনীর কাছে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ভারতের কর্তৃত্বে চলে যায়। তারপর প্রবাসী সরকারকে ঢাকায় এনে ক্ষমতায় বসানো হলেও তাদের কার্যকলাপ তদারকির জন্য মাথার ওপর বসিয়ে দেয়া হয় ভারতীয় উপদেষ্টাদের। মোটকথা, নয় মাস যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের শেষ প্রান্তে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাষ্ট্রটির সত্যিকার অর্থেই কোনো সার্বভৌমত্ব ছিলো না। ভারতীয়

www.nagorikpathagar.org

বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ্যেই ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলতেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয় স্বার্থ তথা সবকিছুই হবে ভারতীয় স্বার্থের পরিপূরক। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ লড়েছিলো একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েমের জন্য, ভারতীয় স্বার্থের পরিপূরক কোনো দেশ গড়ার জন্য নয়।

মুজিবের প্রত্যাবর্তন ঃ বিশ্বাস ভঙ্গ

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ রুশ-ভারত অক্ষবলয়ে প্রবেশ করেছিলো। মার্কিনীরা বিশ্বাস করতো, শেখ মুজিব আমেরিকার স্বার্থ-পরিপন্থী কিছু করবেন না। পাকিস্তানীরাও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আশা করতে থাকে যে, যা হবার হয়ে গেছে; এখন দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে কনফেডারেশন ধরনের একটা বন্ধন গড়ে তোলার ব্যাপারে শেখ সাহেবই পালন করতে পারবেন উপযুক্ত ভূমিকা। এসব প্রস্তাবে রাজী হয়েই মুজিব স্বদেশে ফেরেন। কিন্তু দেশে ফেরার পর থেকেই মুজিব তার স্বভাবসুলভ কায়দায় স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সাফল্যের সব কৃতিত্ব একাই আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। রুশ-ভারত বলয় থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে তিনি চাতুর্যের সঙ্গে কিছু পদক্ষেপ নিতে থাকেন। রুশ-ভারত ঘেঁষা বলে পরিচিত তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে তিনি সরকার পদ্ধতি বদল করে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাজউদ্দিনকে তিনি মন্ত্রিসভা থেকেও 'ড্রপ' করে দিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মার্কিনপন্থীদের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের জন্যও তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন এবং সফল হন। তিনি পাকিস্তান সফরে যান ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এবং পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকেও তিনি ঢাকায় স্বাগত জানান। চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি গোপনে লবি শুরু করেন। পাকহানাদার বাহিনীর সদস্যদের বিচারের দাবিও তিনি ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের জন্য ঘোষণা করেন সাধারণ ক্ষমা। এগুলো সবই ছিলো পাকিস্তান ও মার্কিন প্রশাসনকে দেয়া তার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ। কিন্তু বেশিদূর এগুনো সম্ভব ছিলো না তার পক্ষে। কেননা সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তখন রুশ-ভারত প্রভাব বলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং অবস্থানগুলো তখন ভারতপন্থীদের কব্জায়। ফলে শেখ মুজিবকেই তাদের কাছে আত্মসমর্পিত হতে হলো। ওয়াদা ভাঙ্গলেন শেখ মুজিব। ভোল পাল্টালেন। নিজের আজন্মলালিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাজলেন সমাজতন্ত্রী। ভারতীয়রা কখনোই তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। তার কিছু কর্মকান্ডে তারা ইতোমধ্যেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। এবার তিনি বিশ্বাস হারালেন মার্কিন প্রশাসনের। জনতার আস্থা তিনি আগেই হারিয়েছিলেন। শাসক দলের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, লুন্ঠন, শোষণ, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের কারণে মুজিবের পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে গিয়েছিলো। মার্কিন সমর্থন

www.nagorikpathagar.org

হারিয়ে মুজিব আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়লেন তদানীন্তন সোভিয়েত বলয়ের দিকে। ইতিহাসের পাতা এরপর দ্রুত উল্টে যেতে থাকে। সমাজতন্ত্র কায়েমের নামে গণতন্ত্র এবং মৌলিক মানবিক অধিকারকে হরণ করে মুজিব একদলীয় বাকশালী স্বৈরশাসন কায়েম করেন। হরণ করেন বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। চারটি দৈনিক সংবাদপত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণে চালু রেখে বাকি সকল দৈনিক ও অসংখ্য সাপ্তাহিক এবং সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় পেশাজীবীদের একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল-এ যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। সংসদ ও সরকারের মেয়াদ নির্বাচন ছাড়াই তিন বছরের জন্য বাড়িয়ে নেয়া হয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতার রদবদলের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের ধাঁচে একটি স্বেচ্ছাচারী প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

মার্কিনী প্রতিশোধ ঃ অস্থিতির জন্ম

ইতোপূর্বে সশস্ত্র বাহিনীর সমান্তরাল বাহিনী হিসাবে প্রভূত ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গঠন করা হয়েছিলো জাতীয় রক্ষীবাহিনী। এ কারণে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা নিজেদেরকে উপেক্ষিত ভাবতে শুরু করেছিলেন। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনায়ও সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তারা যখন দেখলেন যে, সরকার পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ীভাবে পাকাপোক্ত করার সব আয়োজন শেখ সাহেব সম্পন্ন করেছেন, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সেনাবাহিনীর এই উত্তেজিত অংশটিকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের মার্কিনপন্থী অংশটি এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। মুজিব এবং তার দু'জন নিকটাত্মীয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ অভ্যুত্থানে নিহত হন। মুজিবের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক সহচর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্টপতি পদে বসেন। আচমকা ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া এই পটপরিবর্তনকে দেশের সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছিলেন। কেননা আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনে তারা ছিলেন অতিষ্ঠ। কিন্তু এই অভ্যুত্থান শাসনব্যবস্থায় স্থিতি আনার বদলে আরো বেশি সংঘাত ও অস্থিতির জন্ম দিয়েছিলো। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত বাকশালের রুশ-ভারতপন্থী অংশটি এই পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। তারা পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে থাকে। মুজিব বাকশাল করে সব দল নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর সিভিল পলিটিশিয়ান মোশতাকের নেতৃত্বাধীন আধাসামরিক সরকার বাকশালও বাতিল করে। ফলে দেশ থেকে রাজনৈতিক দল তো বটেই, রাজনীতিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই রাজনীতিহীন সময়ে স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মহল সশস্ত্রবাহিনীকেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়। স্বাধীনতা-সাবভৌমত্বের প্রতীক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল শৃঙ্খলা এবং চেইন অব কমান্ড ভেঙে

www.nagorikpathagar.org

পড়ে। এ ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তার অনুগত কতিপয় অফিসারের সমর্থনে খন্দকার মোশতাককে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ করেন। ৩ নভেম্বর সংঘটিত ওই বিদ্রোহের হোতারা সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। চেইন অব কমান্ড ভেঙে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে অধঃস্তন কর্মকর্তা খালেদ সেনাপ্রধান পদ থেকে জিয়াকে অপসারিত এবং নিজেকে নয়া সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন।

খালেদের উদ্দেশ্য ফাঁস

উচ্চাভিলাষী খালেদ বিভিন্ন মতাবলম্বী পক্ষকে তাদের মনমতো কথাবার্তা বলে তার দলে ভেড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই তার কার্যকলাপে অনেকেই বুঝতে পারে যে, ক্ষমতা দখলই তার আসল উদ্দেশ্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পেছনে খালেদের সক্রিয় সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ৩ নভেম্বর তিনি মুজিবভক্তদের বুঝিয়েছিলেন যে, মোশতাকের সরকার অবৈধ। এই সরকারকে আঘাত করে মুজিব হত্যার বদলা নিতে চান তিনি। তার কথায় মুজিবভক্তরা বলেছিলেন, তাহলে মোশতাককে অপসারণের পর মুজিবের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুলকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। কিন্তু মোশতাককে অপসারণের সঙ্গে যুগপৎভাবে ঘটে যায় রহস্যঘেরা জেলহত্যাকান্ড। একদল সৈন্য জেলে ঢুকে নজরুলসহ বিলুপ্ত বাকশালের চার শীর্ষনেতাকে খুন করে। ওই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে খালেদ অজ্ঞতা প্রকাশ করলেও অনেকেই তাকে সন্দেহ করতে থাকে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সামরিক অফিসারদের সঙ্গে এই মর্মে সমঝোতায় পৌছান যে, তাদেরকে নিরাপদে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং পরে বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনে চাকরির বন্দোবস্ত করা হবে। সেই সমঝোতা অনুযায়ী ওই অফিসারদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসাবে খালেদের স্ত্রীকে তাদের সঙ্গে বিমানে তুলে দেয়া হয়। বেগম খালেদ তাদেরকে ব্যাংককে নিরাপদে পৌছে দিয়ে আসেন।

কিন্তু এতো সব কৌশল ও চাতুরির আশ্রয় নিয়ে খালেদ সবখানে তার কর্তৃত্বকে সংহত করতে পারেননি। তিন দিন ধরে রেডিও টিভি স্টেশন চালু করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সামরিক শাসন বলবৎ করা সত্ত্বেও ক্ষমতার শীর্ষ পদে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বসতে পারেননি। বঙ্গভবন দখল করতে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টেই তার কর্তৃত্ব আলগা হয়ে যায়। সাধারণ সৈনিক ও অফিসাররা খালেদের রহস্যজনক কার্যকলাপের ব্যাপারে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ, সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীতে রক্তক্ষয় ও সংঘাত এড়াতে জেনারেল ওসমানীর হস্তক্ষেপে একটি মাঝামাঝি

www.nagorikpathagar.org

পদক্ষেপ নেন খালেদ। প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বসানো হয়। সীমাহীন চাপের মধ্যে তড়িঘড়ি করে নেয়া এই সিদ্ধান্ত ছিলো সেনাপ্রধান পদে খালেদের বসার মতোই অবৈধ। মোশতাক সরকারকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে খালেদ নিজেও একই ধরনের অবৈধ কাজ করেন। তাকে সিএমএলএ* হিসাবে মেনে নিতে সেনা কমান্ডারদের আপত্তি বুঝতে পেরে তিনি একজন সিভিলিয়ান বিচারপতিকে সিএমএলএ বানান। কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হয়নি তার। খালেদের বিদ্রোহে উল্লসিত হয়ে উঠে তারা। মুজিবভক্তরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমবেত হয়ে সভা করে। সেখান থেকে মুজিবের ফটো নিয়ে মিছিল করে তারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে নিহত নেতার বাসভবনে গিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। ওই সমাবেশ থেকে খালেদের উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয় এবং মিছিলে খালেদের মা এবং ভাই (আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফ) শরিক হন। এই খবর প্রচারিত হলে সেনাবাহিনীসহ সবখানে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সৈনিক ও অফিসাররা বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার করে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন ও মত বিনিময় করে খালেদের ক্ষমতার স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

বিপ্লব ও সংহতি

৭ নভেম্বর প্রথম প্রহর থেকে সারা দেশের সেনা ছাউনিগুলোর চেহারা বদলে যায়। সৈনিকরা অস্ত্র হাতে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে আসেন রাজপথে। প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল সশস্ত্র সৈন্যকে পাঠিয়ে দেয়া হয় রাজধানীর দিকে। রাত্রির শেষ পর্বে তারা ঢাকায় এসে পৌঁছে। মধ্যরাত্রির পর ঢাকা সেনানিবাসেও শুরু হয়ে যায় সৈনিকদের অভ্যুত্থান। ব্যারাক থেকে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা বেরিয়ে আসেন। বন্দী সেনাপ্রধান জিয়াকে মুক্ত করে কাঁধে তুলে সাধারণ সৈনিকরা বেরিয়ে আসেন রাজপথে। অবস্থা বেগতিক দেখে বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে পালাতে গিয়ে সৈনিকদের হাতে নিহত হন খালেদ তার কয়েকজন দোসরসহ। এর অল্প কিছু আগে খালেদের সমর্থক কয়েকজন অফিসার পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাকে ছেড়ে নিরাপদে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, কুচক্রিরা নিপাত যাক, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সৈনিকরা ৭ নভেম্বর সুবহে সাদেকের সময়ে রাজপথে নেমে এলে তাদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাতে সারাদেশের জনগণ রাজপথে নেমে আসেন। শ্রেণীপেশা নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশরক্ষায় সৈনিকদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান তোলেন। সেনাদলগুলোকে বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করতে থাকে রাজপথের দু'পাশে

* CMLA = Chief Martial law Administrator (সম্পাদক)

www.nagorikpathagar.org

অপেক্ষামান লাখো জনতা। জনসমুদ্র থেকে বর্ষিত পুষ্পবৃষ্টিতে ছেয়ে যায় ট্যাংক, সাঁজোয়া যান। কামানের নলে সাধারণ মানুষ মালা পরিয়ে দেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর আর এমন দৃশ্যের অবতারণা কখনো হয়নি।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মিল

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ৭ নভেম্বরের ঘটনার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এক. জাতীয় ইতিহাসের এই দু'টি ক্রান্তিকালেই সৈনিক এবং সাধারণ জনতা মিলিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে বিপ্লবে নেমেছে।

দুই. উভয় সময়েই সাধারণ সৈনিক ও জনগণ এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন দায়িত্বশীল নেতারা ব্যর্থ হবার প্রেক্ষাপটে। একাত্তরে দোদুল্যমান শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা ও নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। পঁচাত্তরে বঙ্গভবনে থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদ ব্যর্থ হন জাতিদ্রোহী চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে।

তিন. উভয় ঘটনাতেই জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ছিলো অনন্য সাধারণ। '৭১-এর ২৫ মার্চের গণহত্যার প্রাক্কালে জনগণের নির্বাচিত নেতারা আত্মসমর্পণ ও পালানোর পথ বেছে নিলে নেতৃত্বশূন্য ও আক্রান্ত জনগণ অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। সেই ঘোর দুঃসময়ে আকাশে ভেসে এসেছিলো একটি কণ্ঠ ঃ 'আমি মেজর জিয়া বলছি ...।' চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিও স্টেশন মারফত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করে জিয়া জাতিকে দিয়েছিলেন বরাভয় আর পথনির্দেশ। শুধু মৌখিক ঘোষণা নয়, শুরু করে দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। একইভাবে '৭৫-এর ৭ নভেম্বর প্রত্যুষেও জনগণ আবার বেতার তরঙ্গে শুনলো সেই একই কণ্ঠ ঃ 'আমি জিয়া বলছি।' জাতীয় দুর্যোগের কাণ্ডারী জিয়ার নির্দেশনা কান পেতে শুনলো সবাই। এর আগে গোপনে কুচক্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে গুটিকয়েক উচ্চাভিলাষী এবং বিভ্রান্ত সামরিক অফিসার ক্ষণস্থায়ী এক ক্যুদেতায় সেনাপ্রধান জিয়াকে বেআইনীভাবে অপসারণ ও বন্দী করলে সাধারণ সৈনিকেরা ওই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। সেনাছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে রাজপথে নেমে এসে তারা জনসাধারণের সঙ্গে সংহতি রচনা করেন। তারাই বন্দী জিয়াকে মুক্ত করে তার হাতে তুলে দেন দেশ পরিচালনার ভার। অবশ্য দূরদর্শী ও দেশপ্রেমিক জিয়াউর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ না—করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতীক সশস্ত্রবাহিনীকে চক্রান্ত ও সংঘাতমুক্ত করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাটাকেই আশু কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছিলেন। দৃঢ়তা ও কঠোরতার সঙ্গে তিনি সেই জাতীয় কর্তব্য পালনে সফল হয়েছিলেন বলেই আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী আজ এতোটা শক্তিশালী হতে পেরেছে। তবে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। মূল কথা হচ্ছে একাত্তরে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং '৭৫-এ সিপাহী-জনতার বিপ্লব—এই উভয় ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন একজনই। তার নাম জিয়াউর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

ছদ্মবেশী চক্রান্ত

১৯৭৫-এ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে সংঘাত সৃষ্টির পেছনে দেশের ভেতর থেকে মহল বিশেষের উসকানি ছাড়াও সীমান্তের বাইরে থেকে ইন্ধন যোগানো হয়েছিলো। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ক্যুদেতার সাফল্য নিয়ে সংশয় দেখা দিলে সীমান্তের বাইরের চক্রান্তকারীরা তাদের সেকেন্ড ফ্রন্টকে সক্রিয় করে তোলে। খালেদের বিরুদ্ধে সাধারণ সৈনিকদের ক্ষোভ আঁচ করতে পেরে জাসদের 'গণবাহিনী' এবং তথাকথিত 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র গুটিকয়েক লোক তাদের অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সঙ্গে ভিড়ে যায়। তাদের নেতা ছিল সেনাবাহিনী থেকে বহু আগে অপসারিত কর্নেল তাহের। এই চক্রের উদ্দেশ্য ছিলো অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করা। সিপাহী-জনতার বিপ্লবের বন্ধু সেজে এরাই চক্রান্তমূলকভাবে সেনাবাহিনীকে নেতৃত্বহীন করার জন্য অফিসার হত্যা শুরু করে। ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহরে এদের কয়েকজন রেডিও থেকে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার শুরু করে যে, কর্নেল তাহের হলেন সিপাহী-জনতার বিপ্লবের নেতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাধারণ সৈনিকরা গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলে বিপ্লবের বাণী সঠিকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহের এরপর জিয়াউর রহমানের কাছে গিয়ে তাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক তৎক্ষণাৎ বাধা দেন এবং কর্নেল তাহেরকে ভারতের এজেন্ট ও বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে চলে যেতে বলেন। ব্রিগেডিয়ার হকের আশংকা ছিলো, তাহেরচক্র রেডিও স্টেশনে নেয়ার কথা বলে পথিমধ্যে জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিলো। কিছুদিন আগেই দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্মৃতিচারণে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মঈন এসব তথ্য তুলে ধরেছেন।

মোট কথা ৭ নভেম্বরের রাতেই তাহেরচক্রের অসৎ উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। চক্রান্তের দায়ে পরে তাদের বিচার ও সাজা হয়েছিলো।

এক সাপ দুই মাথা

বহুদিন প্রতিপক্ষ হিসাবে 'মক ফাইট' করার পর আওয়ামী লীগ ও জাসদ আজ এক হয়েছে। সাম্প্রতিককালে তাদের উভয় পক্ষের ভূমিকা ও কথাবার্তায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তাদের আসল গোড়া এক জায়গায়। ঠিক তেমনই খালেদ ও তাহেরও ছিলেন একই সাপের দু'টি মাথা। তাই আওয়ামী লীগ ও জাসদ মিলে আজ খালেদ ও তাহের উভয়ের স্তুতি করছে আর নিন্দাবাদ করছে জিয়াউর রহমানের। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, ৭ নভেম্বরে তাহের যদি খালেদের বিরুদ্ধে সত্যিই বিপ্লব সংঘটিত করে থাকেন, তাহলে দু'জনকেই সমর্থন করা যায় কি করে? তাদের দাবি অনুযায়ী তাহের যদি ৭ নভেম্বরের 'হিরো' হয়ে থাকেন, তাহলে খালেদ ছিলেন 'ভিলেন।' এই কথিত দুই প্রতিপক্ষকেই সমর্থন করার মাজেজাটা আসলে কি?

www.nagorikpathagar.org

আ. লীগ-জাসদের মিলিত ভাষা থেকে আজ খোলাসা হয়ে যাচ্ছে যে, ৭ নভেম্বরের বিপ্লবে তাহের গং অন্তর্ঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢুকেছিলো। তাহের ও খালেদ উভয়চক্রই ছিলো একই সূত্রে বাঁধা। তাদের উভয়ের তৎপরতার পেছনে যে অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিলো সেটা হলো ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' বন্ধক দেয়া।

অফিসার হত্যা দিবস

৭ নভেম্বরে তাহেরের অনুসারী কতিপয় বিপথগামী সৈনিক 'সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই' স্লোগান দিয়ে অফিসার হত্যায় মেতেছিলো। বিপ্লবের মূলধারা সাধারণ সৈনিকরা কেউ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। জিয়াউর রহমান মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মঘাতী তৎপরতা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। তার বীরোচিত ভূমিকায় সশস্ত্র বাহিনীতে রক্তক্ষয়ী তৎপরতা দ্রুত থেমে যায়। কাজেই ৭ নভেম্বরকে 'সৈনিক হত্যা দিবস' বলাটা সত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ সৈনিক নয়, ৭ নভেম্বরে সশস্ত্র বাহিনীর কিছু অফিসার নিহত হয়েছিলেন অন্তর্ঘাতকদের হাতে। এর জন্য দায়ী কর্নেল তাহের ও তার অনুগতরা। সে কারণেই তাদের বিচার ও সাজা হয়েছে। তাই ৭ নভেম্বরকে 'অফিসার হত্যা দিবস' বললেও তার একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আর এই অফিসারদের হত্যাকে সমর্থন না করলে কর্নেল তাহের গংয়ের বিচার ও বিচারে প্রদত্ত সাজার প্রতি সমর্থন জানাতে হয়। কিন্তু ৭ নভেম্বরের বিপ্লব-বিদ্বেষী মহল যুক্তির ধারেকাছে না গিয়ে প্রচারণার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বলে চলেছে, তাহেরও ভালো খালেদও ভালো এবং ৭ নভেম্বরের হত্যাও মন্দ আবার হত্যাকাণ্ড থামালেন যে জিয়া, তিনিও মন্দ। সত্যিই বড় বিচিত্র এ দেশ! এ দেশেই এক মুখে এতো কথা বলা সম্ভব।

অপহরণের সাজানো নাটক

৭ নভেম্বর কর্নেল তাহের ও গণবাহিনীর ভূমিকা বুঝতে হলে আগেকার আরেকটি ঘটনা মনে রাখা দরকার। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের শেষ দিকের কোনো এক দিন জাসদের গণবাহিনীর একটি দল ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে অপরহরণের চেষ্টা চালায়। দূতাবাসে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশী নিরাপত্তা বাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপে সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। গোলাগুলীতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। ওই অভিযানে কর্নেল তাহেরের দুই সহোদর ভাই অংশ নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জাসদের গণবাহিনীর ওই সশস্ত্র অ্যাডভেঞ্চারটি ছিলো সুপরিকল্পিত এবং গভীর ষড়যন্ত্রমূলক। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারত সামরিক অভিযান চালাতে পারেনি পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারির কারণে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক অভিযানের অজুহাত সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে অপহরণের ওই পাতানো খেলার আয়োজন করা হয়েছিলো। নিরাপত্তা বাহিনী সেটি ভণ্ডুল করে দেয়। এরপর

www.nagorikpathagar.org

সামরিক বাহিনীকে নেতৃত্বশূন্য করা, রক্তপাত ঘটানো ও দেশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে গণবাহিনীর লোকেরা সিপাহী-জনতার বিপ্লবের অনুগামী হয়েছিলো বন্ধু বেশে। কিন্তু তাদের সে চক্রান্তও সফল হয়নি।

নয়া মহাসড়ক রচনা

৭ নভেম্বরের শিক্ষা হচ্ছে, জাতীয় দুর্যোগে-দুঃসময়ে ব্যবধানের দেয়াল ভেঙে দিয়ে সৈনিক-জনতাকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। গড়ে তুলতে হবে লৌহদৃঢ় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি।

ওই মহান বিপ্লবের আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে, সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ পদ করায়ত্ত করেও জাতিদ্রোহী চক্রান্তে লিপ্ত হলে পার পাওয়া যায় না। এদেশের সাধারণ সৈনিকরা দেশপ্রেমের জ্বলন্ত বহ্নিশিখা বুকে নিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জাগ্রত প্রহরায় নিয়োজিত। তারা প্রয়োজনে ছাউনি ছেড়ে রাজপথে নেমে জনতার সঙ্গে মিতালি গড়তেও জানেন।

সশস্ত্র বাহিনীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রাজনৈতিক পক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টির বিরুদ্ধেও ৭ নভেম্বর এক চরম হুশিয়ারি। হত্যা-কু-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চাভিলাষী সেনা অফিসারদের ক্ষমতা দখলের প্রয়াসের বিরুদ্ধেও ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ছিলো এক মহাপ্রতিরোধ। ষড়যন্ত্র করে চেইন অব কমান্ড ও সেনাশৃঙ্খলা লংঘন করে খালেদচক্র ক্ষমতা দখলের যে চক্রান্ত করেছিলো সৈনিক-জনতার বিপ্লবে তা পরাজিত হয়। বিপ্লবী সৈনিক-জনতা সেনাপ্রধান জিয়াকে মুক্ত করে এনে এক অরাজক ও নেতৃত্বশূন্য পরিস্থিতিতে জিয়ার হাতে তুলে দেন দেশের শাসনভার। প্রকাশ্য রাজপথে লাখো সৈনিক-জনতার পুষ্পবর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে ক্ষমতার অভিষেক ঘটে তাঁর। বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে ভেসে যায় ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত।

৭ নভেম্বরের বিপ্লবের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে ফিরে আসে প্রকাশ্য রাজনীতি, গঠিত হয় রাজনৈতিক দল, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারা। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চক্রান্তমুক্ত হয়ে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবের ধারায় ভারতীয় স্বার্থের পরিপূরক অবস্থান থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নামের যে জাতিরাষ্ট্র বা নেশনস্টেটটি জন্ম নিয়েছিলো সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাষ্ট্রভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত এক জাতীয় পরিচয় অর্জন করে। আত্মপরিচয় লাভের মাধ্যমে নবউদ্দীপ্ত ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নবোত্থিত এই বাংলাদেশী জাতিসত্তার অভিষেকের দিন ৭ নভেম্বর। আর সিপাহী-জনতার মিলিত বিপ্লবের মহান শিক্ষা ও তাৎপর্যকে আত্মস্থ করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা, মর্যাদা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও গৌরব নিয়ে সামনের দিকে এই জাতিসত্তাকে এগিয়ে চলার প্রশস্ত নতুন মহাসড়ক গড়ে দিয়ে গেছেন জিয়াউর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের চেতনা ঃ প্রেক্ষিত ও ঘটনাপ্রবাহ

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এদেশ হানাদারমুক্ত হলে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে। ১৯৭২ সালের প্রারম্ভে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ক্ষমতাসীন হয়েই আওয়ামী লীগ ও তার অবিসংবাদিত নেতা তাদের স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন। অচিরেই গণমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে তারা হস্তক্ষেপ করেন। কোনোরূপ বিরুদ্ধবাদী মতামত তারা অপছন্দ করেন। পাকিস্তানী সামরিক স্বৈরাচারী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার অনুসারীরা এদেশকে 'এক নেতা এক দেশ, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ' রূপান্তরিত করে। নেতার মৌন সম্মতিতে আওয়ামী গোষ্ঠী এদেশে হত্যা, নিপীড়ন, লুটতরাজ ও খুন-খারাবির রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা করে। আওয়ামী জোর-জুলুমের শিকার হয়ে কত নিরীহ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। শেখ মুজিবের আশীর্বাদপুষ্ট মুজিব বাহিনীর অত্যাচারে বাংলাদেশের অসহায় মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই বিষাক্ত পরিবেশে এদেশের যুবসমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারকের পুত্র-সন্তানরা সন্ত্রাসের চরম পর্যায়ে গিয়ে ব্যাংক ডাকাতিতে পুলিশের গুলীতে আহত হয়ে ঘরে ফেরে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) ব্যানারে প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়।

শেখ মুজিবের যুববাহিনী তথা মুজিব বাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষীবাহিনীর হাতে কত হাজার বামপন্থী নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন তার কোনো সঠিক বিবরণ এখন আর পাওয়া যায় না। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা আওয়ামী সন্ত্রাস ও লুটপাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে ওঠেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানিকৃত বিদেশী মালামাল সাথে সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পাচার হচ্ছে দেখে

www.nagorikpathagar.org

মওলানা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। হাজার হাজার টাকার ত্রাণসামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পাচার হচ্ছে দেখে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে আখ্যায়িত করেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে।'

১৯৭৩ সালে ১ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সেই প্রথম নির্বাচনে সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি, জাসদ ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫টি আসন লাভ করে। প্রহসনের এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে সংবিধানের ওপর যেভাবে ইচ্ছা সংশোধনীর সুযোগ লাভ করে। ফলে '৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার-আলবদর যাদের বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট মামলা নেই ১৪ জুলাই তাদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়। এই সংশোধনীটিকে যতই মানবিক দেখাক না কেন পরবর্তীতে এটি এক বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ২০ সেপ্টেম্বর '৭৩-এর দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা বিষয়ক ক্ষমতা লাভ করে। বস্তুতপক্ষে সরকারের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে এই সংশোধনীটি আনা হয়। সংবিধানের এই দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা আওয়ামী দলীয় স্বার্থে বিরুদ্ধবাদী যে কোনো কণ্ঠ স্তব্ধ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিরতরে স্তব্ধ করা হয়। শ' শ' নেতা-কর্মীকে বিনা বিচারে জেলে পোরা হয়ে। সর্বহারা পার্টির অবিসংবাদিত নেতা সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে সংসদে দম্ভোক্তি করেন। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই জরুরি আইনে আটক করা হয়।

ব্যাপকহারে চোরাচালান, লুটপাট, বাড়ি দখল, গাড়ি দখল, খাদ্য পাচারের ফলে এবং সরকার কর্তৃক সময়মত খাদ্য আমদানিতে ব্যর্থতার ফলে দেশের খাদ্য গুদাম খালি হয়ে যায়। সরকারের সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না। হুঁশ হয় যখন ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেশের লক্ষাধিক লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। '৭৪-এর সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষকেও হার মানায়। পার্থক্য হলো '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় কর্তাব্যক্তিগণ দারুণ ছুটাছুটি করেন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য আর '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় প্রধানমন্ত্রী তার দু'পুত্রের পুত্রবধূ আনেন (এক পুত্র বধুকে আনা হয় কনের অমতে) মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে। ভক্তরা কত প্রকারের সোনার তৈরী উপহার হিসেবে প্রদান করেন তার হিসেব পাওয়া যায় ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা ভারতে নির্বাসন থেকে ফিরে এলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক শেখ হাসিনার নিকট প্রত্যার্পিত ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর মরহুম শেখ মুজিবের ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি থেকে প্রাপ্ত অলংকার ও টাকা-ডলারের তালিকা থেকে। বিয়ের দিন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির ঝলমলে আলোকসজ্জা যারা দেখেছেন তারা আজও সেই আলোকসজ্জার সাথে তুলনা করেন সেদিনের ঢাকার অলি-গলিতে পড়ে থাকা অনাহারক্লিষ্ট অসংখ্য মৃতদেহের।

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি বিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা সবাই জানেন, আর তাহলো ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত করে আর নিরংকুশ ক্ষমতা চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি তৃপ্তি পাননি। তাই তার মনে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির-প্রেসিডেন্ট হবার বাসনা জাগে। একটি বিষয় হলো—শেখ মুজিব একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে দেখেছেন, তার একনায়কত্বও দেখেছেন এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রতাপে সাম্রাজ্য (?) চালাতে দেখেছেন, যাকে যখন ইচ্ছা দমন করতে দেখেছেন। এগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি, রাজনৈতিক মঞ্চ গরম করেছেন—কিন্তু মনে মনে তিনি এগুলো অনুকরণ-অনুসরণ করার স্বপ্নও লালন করেছেন। নিজেকে আরেক আইয়ুব খাঁ বানাবার জন্য তাইতো তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মাথার ওপর ক্ষমতাহীন একজন প্রেসিডেন্টকে সহ্য করতে পারলেন না। নিজের অজান্তেই নিজের মধ্যে আইয়ুব খাঁ উঁকি মারতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আইয়ুব খানকে এক ডিগ্রি ডিঙ্গিয়ে তিনি দেশে একদলীয় 'বাকশাল' গঠন করেন। পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির গণতন্ত্র চালু করেন এবং জাতীয় সংসদে কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্টে উন্নতি লাভ করেন। কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি চারটি সরকারি পত্রিকা* ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ করে দেন এবং হাজার হাজার সংবাদপত্রসেবীকে বেকার করে দেন। এভাবে তিনি তার সমালোচনা বা ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করেন।

এভাবে স্বাধীনতা-পূর্ব সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বহুদলীয় চিন্তা-চেতনার অবলুপ্ত করে আওয়ামী লীগ এদেশে একনায়কতন্ত্র চালু করে। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর পর কোনো প্রকার সংসদীয় ক্ষমতা ছাড়াই সংবিধানে তারা রাষ্ট্রীয় চারনীতি সংযোজন করে। এগুলো হলো—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। যে সংবিধানের আওতায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়েছিল সে সংবিধানে এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল না। আওয়ামী লীগের প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতির ফলে দেশে এক চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান এক সেনা অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন এবং এভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলংকময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সেনা সদস্যরা অতঃপর আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদকে দেশের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত করেন। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার

* দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, The Bangladesh Tims, The Bangladesh Observor.

www.nagorikpathagar.org

খালেদ মোশাররফ আরেক সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং তৎকালীন চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। পুনরায় দেশ এক অনিশ্চয়তায় নিপতিত হয়। সামরিক আইনের মধ্যে খালেদ মোশাররফের মাতার নেতৃত্বে এক গণমিছিল বের হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাই কমিশনারকে এই মিছিলে খুবই উদ্যোগী দেখা যায়। এমতাবস্থায় সমগ্র বাংলাদেশের সিপাহীরা জেগে ওঠে। দলে দলে ঢাকায় সমবেত হয় এবং ৭ নভেম্বর '৭৫ সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফের পতন হয়। ক্রুদ্ধ সিপাহীদের রোষাণলে পড়ে তিনি প্রাণ হারান। সিপাহী-জনতা অতঃপর জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। পুনরায় দেশে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়। যে বিপ্লবের নাম 'সিপাহী-জনতার বিপ্লব।'

৭ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক এদিনে সিপাহী-জনতার এক সফল বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুনর্জন্ম লাভ করে। বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের নয়নের মণি, স্বাধীনতার ঘোষক জেনারেল জিয়াকে সেদিন সিপাহী-জনতা তার বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেশের কাণ্ডারী হিসাবে বরণ করে নেয়। সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে এইদিন এই দেশের মানুষ বাংলাদেশী জাতীয়তার প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছিল বলেই এ দিবস 'বিপ্লব ও সংহতি দিবস'।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর যা ঘটেছিল

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ

আজ ৭ নভেম্বর। সিপাহী-জনতার বিপ্লবের দিন। নানা দিক থেকে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনের ঘটনা পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

৭ নভেম্বরের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ দিনের গুরুত্ব আলোচনার সাথে সিপাহী-জনতার আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। তাহলে ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব, বিশেষত্ব ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ বিপ্লবের প্রভাব অনুধাবন করা সহজ হবে।

১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের ফলে রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। খন্দকার মোশতাকের সামরিক সরকার কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এগুলোর মধ্যে ছিল একদল বিলোপ, সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ সংশোধন, রক্ষীবাহিনী বাতিল এবং পিও ৯ (যার মাধ্যমে কোনো কারণ না দেখিয়েই যে-কোন সরকারি কর্মচারিকে চাকরিচ্যুত করা যেত) বাতিলকরণ। কিন্তু এ-সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তিনি তার রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করতে পারেননি।

তিনি মাত্র ৮০ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। তরুণ সেনা অফিসার ফারুক, রশিদ, ডালিম এরাই ছিল বঙ্গভবনের মূলশক্তি। কিন্তু তারা যেহেতু সেনাবাহিনীর মূল ধারার বাইরে ছিল সেজন্য সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড না-থাকায় অফিসারদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চেইন অব কমান্ড-এর মধ্যে অবশ্য একদল অফিসার ১৫ আগস্টের ঘটনা মেনে নিতে পারেন নাই। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ এসেও গেল।

৩ নভেম্বর সকালবেলা বাসা থেকে দেখলাম আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ছে। একটু অস্বাভাবিকই মনে হল। একটু পরে প্রেসক্লাবে গিয়ে শুনলাম কাউন্টার ক্যু হয়েছে।

কে করলেন, কার কি অবস্থা কিছুই বোঝা গেল না সহজে। দুপুর নাগাদ শুনলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে খন্দকার মোশতাক ও ফারুক-রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সারা ঢাকা শহরে থমথমে ভাব। রেডিও টেলিভিশনেও কোন খবর নেই।

www.nagorikpathagar.org

দেশটা কে নিয়ন্ত্রণ করছে ? পরদিন ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি মিছিল বের হল আওয়ামী-বাকশালীদের নেতৃত্বে। ছাত্ররাও যোগ দিল। মিছিল চলল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে। আমি রিপোর্টার হিসেবে মিছিলটি অনুসরণ করলাম। হঠাৎ দেখি শিপিং করপোরেশনের জনসংযোগ ম্যানেজার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রকিবউদ্দিন বাচ্চু গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। তার গাড়িতে উঠে পড়লাম। ফলো করতে লাগলাম মিছিল। শেখ মুজিবের পক্ষে আওয়াজ উঠল। মিছিল যখন ৩ নম্বরের মাথায় তখন দেখলাম সাদা শাড়ি পরা এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধা রয়েছেন মিছিলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মা। কারা বিদ্রোহ করেছে, কি তাদের উদ্দেশ্য জনগণ বুঝে ফেললেন। আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা যোগ দিয়েছেন একথা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। গুঞ্জন উঠল—বাকশাল শাসন আবার ফিরে আসবে।

চার তারিখ সকালে শোনা গেল জেলখানায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর রহিম সাহেব অবজারভার থেকে আমার বাসায় ফোন করলেন। রাত তখন প্রায় ৯টা। তিনি আদেশ করলেন অফিসে যেতে। গেলাম।

তিনি বললেন, 'চলেন বঙ্গভবনে যাই কি ঘটছে দেখি।' কিছুটা ভয় পেলাম। যাব কি যাব না ভাবছি। ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠে গেলাম। রহিম সাহেব খন্দকার মোশতাকের প্রেস সেক্রেটারি তাজুল ইসলামের মাধ্যমে সব ঠিক করলেন।

রাত তখন ১০টা। বঙ্গভবনে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখা পেলাম কয়েকজন তরুণ সেনা অফিসারের। তারা আমাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, সব স্বাভাবিক। আপনারা নির্ভয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বঙ্গভবনে আমরা কিন্তু একটা থমথমে ভাব লক্ষ্য করলাম। ঢুকেই বাঁ-দিকে দেখি সেনাবাহিনীর অফিসার সব দাঁড়িয়ে।

এদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, নৌ-বাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, বিমানবাহিনী প্রধান তাওয়াব ও অন্যরা। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তাপটি টের পেলাম। শুনলাম উপরে কেবিনেট মিটিং চলছে। খুব হৈচৈ শোনা গেল। এম এইচ খান সাহেব খালেদ মোশাররফকে লক্ষ্য করে বললেন, "খালেদ, প্লিজ সেভ দ্য সিচুয়েশন।"

খালেদ মোশাররফ নির্বিকার দাঁড়িয়ে। তিনি কিছুই বললেন না। এরপর সময় দ্রুত বয়ে চলল। আমরা প্রেস সেক্রেটারির ঘরে বসলাম কি হয় শোনার জন্য। এমন সময় হঠাৎ দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল।

কে যেন বললেন, বঙ্গভবনের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। প্রেস সেক্রেটারির ঘরের দরজা খুলতেই দেখা গেল ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ সেনাঅফিসার ও জওয়ানরা পজিশন নিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ! কে যেন বলল, কুমিল্লা থেকে খালেদ মোশাররফের বিরোধী সেনাদল আসছে। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাজুল ইসলামের ডাক পড়ল। তিনি বাইরে গেলেন। ভেতরে আমরা তিনজন সাংবাদিক। রহিম সাহেব, গোলাম তাহাবুর এবং আমি। এছাড়াও রয়েছেন তদানীন্তন প্রধান তথ্য অফিসার সাংবাদিক মরহুম শামসুল হুদা এবং আরো কিছু সরকারি কর্মকর্তা।

তাজুল ইসলাম ফিরে এলেন। এসেই রেডিওতে ফোন করলেন। বললেন, এখনই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হবে। আমরা তখনো জানি না কি ঘটছে ওপর তলায়। তবে এটুকু দেখিছি কয়েকজন মন্ত্রী খুব নার্ভাস। কেবলই উপর-নীচ করছেন।

একজন তো তার একান্ত সচিবকে বললেন, "প্লিজ টেক কেয়ার অব মাই ফ্যামিলি।"

তাজুল সাহেব আবার ওপরে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন একটি কাগজ হাতে করে। রেডিওতে খবরটি দিলেন। কাফী খানের কণ্ঠে ভেসে এল সে ঘোষণা।

ছোট্ট খবর, কিন্তু ৩ নভেম্বর থেকে যে অস্পষ্টতা শুরু হয় এ ঘোষণায় তার অবসান ঘটে। পরিষ্কার হল, "ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করা হল। আর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হল।"

এই ঘোষণার সাথে সাথে বঙ্গভবনের পরিবেশ একটু হালকা বোধ হয়। সেনাবাহিনী যে পজিশন নিয়েছিল তা তুলে নেয়া হয়। রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান ও এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব খালেদ মোশাররফকে জেনারেলের ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। খুব খুশি তিনি।

এর মধ্যে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার কয়েকজন জওয়ানসহ প্রেস সেক্রেটারির ঘরে ঢুকলেন। সবার হাতে দু-তিনটি করে অস্ত্র। মেশিনগান, স্টেনগান, রিভলবার এ-সব। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। অফিসারটি ঘরে ঢুকেই একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

তিনি ইংরেজিতে বললেন, " You all are CSP officers. You please co-operate with us. We have brought about a change and ended politics of killing. We are taking care of the killer president Khandaker Mostaque. Four leaders have been killed in the Jail" এ কথা বলে তিনি আমাদের বললেন, Follow me" মনে হল সবাই যাচ্ছে। আমি পেছনের দিকে ছিলাম। আস্তে আস্তে বললাম, " All are not CSP officers here. There are some Journalists too. তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। একজনকে ইশারায় ডাকলেন। বললেন, "আসুন আমার সাথে"।

www.nagorikpathagar.org

তিনি হলেন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী মোমেন উদ্দিন সাহেবের একান্ত সচিব জামাল উদ্দিন। তিনি গেলেন মিনিট কয়েক পর ফিরে এলেন। খুব হাসি হাসি ভাব মুখে।

কিছুক্ষণ আগে মহাবিপদের সময় এই লোকটিই বাসায় ফোন করে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি খুব বিপদে আছি। মাকে দোয়া করতে বল।" এখন তিনি খুব খুশি আর চঞ্চল। তাজুল ইসলামকে একটা ফাইল দিতে বললেন। আমরা জানতে চাচ্ছিলাম কি ঘটেছে।

মনে হলো একটু আগেই বিপদের সাথী জামাল সাহেব এখন আর আমাদের চেনেন না। আমাদের দিকে না তাকিয়েই বললেন, "I have been appoined private secretary to Gen. Khaled Mosharraf." যাহোক, তাকে বললাম, কি ভাই আমাদের যাওয়ার একটু ব্যবস্থা করতে পারেন কি ? কোন জবাব নেই।

গুঞ্জন শুনলাম, প্রধান বিচারপতিকে রাতেই বঙ্গভবনে আনা হবে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করানো হবে। সব বড় অফিসারকে ডাকা হল বঙ্গভবনে। আইজি প্রিজনকেও আনা হল। ইতোমধ্যে জেল কিলিং তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। এরই মধ্যে গম্ভীর ও থমথমে মুখে ফিরে এলেন জামাল সাহেব।

বললাম কি হলো ব্রাদার ? তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "I have been dismissed"। কেন? কারণ যে ঘোষণায় খালেদ মোশাররফ সাহেব জেনারেল এবং সেনাবাহিনী প্রধান হলেন সেটির মূলকপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানুষের চরম বিপদের সময়ও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা মানুষকে সাহস যোগায়। আর হালকা করে দেয় ভীতিকর ভয়ংকর পরিবেশ। বঙ্গভবনে সেদিন তাই ঘটল।

একটা সময় মনে হয়েছিল তখনি ফায়ারিং শুরু হবে আর আমরা ক্রস ফায়ারিং-এ মারাই যাব। কিন্তু এখন রহিম সাহেব, জামাল সাহেব ও শামসুল হুদা সাহেবের হাল্‌কা রসিকতা আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিছুটা হলেও প্রশমিত করেছে।

পরের দিন প্রধান বিচারপতি সায়েম সাহেবকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হল। একই সাথে তিনি হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ৫ তারিখে বিকাল বেলা তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। বঙ্গভবনে সবাই এলেন। সেখানে সবচেয়ে ব্যস্ত ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মি. সমর সেন। সমর সেন বাংলাদেশে খুব পরিচিত নাম।

কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি। তার কর্মব্যস্ততা গোটা পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে সন্দিহান করে তুলল। ৬ তারিখ সারা দিন খুব গুজব চলল। জিয়াউর রহমান কোথায় কেউ জানে না। তিনি কি বন্দী ? ইতিমধ্যে ১৫

www.nagorikpathagar.org

আগস্টের ঘটনার সাথে জড়িত অফিসারদের একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারা কোথায় যাবে কেউ জানে না। পরে অবশ্য তারা লিবিয়ায় আশ্রয় নেন।

এদিকে ৬ তারিখে ভোর রাতের দিকে গুলীর আওয়াজ আর স্লোগন শোনা গেল। রাত প্রায় তিনটার দিকে আমার সিনিয়র সহকর্মী রশিদ ফোন করলেন। তিনি থাকতেন নিউ মার্কেটের পূর্ব কোণে হোম ইকোনোমিক্স কলেজ সংলগ্ন ফ্লাটে।

ফোনে বললেন, নিউ মার্কেটের দিকে ট্রাক মিছিল যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গুলীর শব্দ আর আল্লাহু আকবর ধ্বনি। এরপর এলো বন্ধু রকিবের ফোন। রেডিও শুনলাম। ভোর রাতের দিকে রেডিও চলল।

ভোরের দিকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব রেডিওতে বললেন, "আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি ..." ইত্যাদি ইত্যাদি। "আমি জিয়া বলছি" এটা একটা অস্ত্র ছিল জিয়াউর রহমানের হাতে।

১৯৭১ সালে কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তিনি একই ভাষায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেন। সেদিন মেজর জিয়ার নাম সারা বাংলায় পরিচিত হয়ে যায় এবং তিনি জনগণের মনে একটা জনপ্রিয় স্থান করে নেন। সেই অস্ত্রই তিনি আবার ব্যবহার করলেন জাতির আরেক সঙ্কটকালে। সেদিন জিয়াউর রহমান না-হলে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত এবং দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যেত।

এটা বেশি করে বুঝলাম রাস্তায় বেরিয়ে। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আমি ও ফজলে রশিদ অবজারভার অফিস থেকে মাইক্রোবাস নিয়ে রাস্তায় বেরুলাম কি ঘটছে দেখার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের কাছে গিয়ে দেখলাম রমনা পার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অসংখ্য জনতার ভিড়। কে যেন চিৎকার করে বলল, ভারতীয় গুপ্তচর ধরা পড়েছে। এ সময় ১০/১২ জন সৈনিক লাফ দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে বসলেন। তাদের অস্ত্রগুলো মনে হল নতুন, চকচক করছে। শাহবাগ হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা হলাম।

কারণ, শুনলাম খালেদ মোশাররফসহ যাদেরকে বিপ্লবী সৈনিকরা হত্যা করেছে তাদের লাশ সিএম এইচ এ আছে। শেরাটন হোটেলের (যা তখন ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম কয়েক ট্রাক সৈনিক মিছিল করছে।

তাদের হাতে খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের ছবি। রাইফেল, মেশিনগান শূন্যে উঁচিয়ে উন্নত মস্তকে তারা সারা শহর ঘুরছে। জনতা ট্যাংকের ওপর উঠে নাচছে আর আনন্দধ্বনি করছে।

সে এক অভূতপূর্ণ দৃশ্য। সিপাহী- জনতার সম্মিলিত শক্তি সেদিন আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব পদানত করার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। যাহোক, আমরা ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে চললাম। সৈনিকরা দু-একটি কথা বলল আমাদের সাথে।

একজন বলল, "দেখুন না, কি নতুন মেশিনগান। চীন থেকে এসেছে। আরও আসত। ষড়যন্ত্র করে জিয়াকে সরিয়ে দিয়ে এটা বন্ধ করতে চাইল কিছু লোক। আমরা

www.nagorikpathagar.org

তা নস্যাৎ করেছি।" ভয়ে ভয়ে এদের সাথে যাচ্ছি। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। জিয়ার পক্ষে আনন্দধ্বনি। পুরনো বিমানবন্দরে ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার পথে যখন এলাম আমাদের গাড়ি আর যেতে দিল না। সৈন্যরা নেমে গেল। হঠাৎ লোকজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করল।

শোনা গেল ভারতীয় বিমান আসছে বিমানবন্দর আক্রমণ করতে। কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম আমি আর ফজলে রশিদ সাহেব। ড্রাইভার খালেক খুব সাহসী। সে বলল, স্যার উঠেন জলদি। আমরা গাড়িতে উঠলাম।

সে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রেসক্লাবে নিয়ে এল। প্রেসক্লাবে শুনলাম অনেক কাহিনী। কিভাবে সব ঘটনা ঘটল। শোনা গেল কর্নেল তাহের হলেন গোটা বিপ্লবের নায়ক। জাসদের শামসুদ্দিনের গলা শোনা গেল রেডিওতে। এ ছাড়াও প্রেসক্লাবে জাসদের নেতা-কর্মীদের অসম্ভব তৎপর মনে হল। এদিকে খন্দকার মোশতাক এবং জিয়াউর রহমানকেও রেডিও অফিসে আনার খবর এল।

জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, কে এম ওবায়দুর রহমান এবং শাহ মোয়াজ্জেম যারা ৪ নভেম্বর রাতে বঙ্গভবন থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদেরকেও রেডিও অফিসে আনা হয়।

৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিপ্লব সংঘটিতে হয়। সিপাহী-জনতা মিলে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে এলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। সবার ধারণা ছিল মোশতাক সাহেব আবার প্রেসিডেন্ট হবেন।

কিন্তু নাটকীয়ভাবে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিয়ে সায়েম সাহেবই প্রেসিডেন্ট থাকবেন বলে ঘোষণা করলেন। জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন। এটাই জিয়াউর রহমানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতারোহণ।

জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসলেন বিপ্লবের মাধ্যমে। জিয়ার বিরোধীরা বললেন, তিনি নাকি সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় আসেন। উপরের ঘটনা কি একথা বলে? মোটেই নয়। জিয়া সৈনিক হয়েও সেদিন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে এমন কিছু পদক্ষেপ নেন যা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। এমন কিছু মৌলিক পরিবর্তন করেন যাতে করে কোন নির্বাচিত নেতা স্বৈরাচারী না হতে পারেন।

সর্বোপরি তিনি এদেশের জাতীয়বাদী শক্তিকে সুসংগঠিত করে এদেশ স্বাধীনতা রক্ষার ব্যূহ তৈরি করেন।

জিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আজও গণতন্ত্র সুদৃঢ় করার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে—চলবে। ৭ নভেম্বর প্রেরণা যোগাবে এ সংগ্রামের।

www.nagorikpathagar.org

নভেম্বর বিপ্লব, কিছু স্মৃতি

বোরহান আহমদ

প্রচণ্ড গোলাগুলীর শব্দে নিঝুম রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় জেগে উঠেছিল নগরবাসী। সবার মনে একই প্রশ্ন, কোথায় এই গোলাগুলী? কারা আবার হামলা করছে? থানা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের বাসায় টেলিফোন করেছিলাম। কেউ কিছু বলতে পারছেন না! গুলীর আওয়াজে আতঙ্কিত সবাই! এত রাতে যাব কোথায়? মনে হচ্ছিল, ভারি জীপ, লরি আর ট্রাকে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে এসেছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। অবিরাম গুলীবর্ষণ, উল্লাস স্লোগান আর চিৎকার। আস্তে আস্তে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছিল সারা শহরে। দূর থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছিল 'সিপাহি জনতা জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।' গত ক'দিন ধরেই সারা দেশে বিরাজ করছিল শ্বাসরুদ্ধকর থমথমে পরিস্থিতি। নভেম্বরের তিন তারিখে মিগের বিকট শব্দে ঘুম ভেঙেছিল। উঠে দেখি বেশ কটি মিগ জঙ্গী বিমান সারা আকাশ চক্কর দিয়ে ঘুরছে। এ রকমভাবে তো কখনও মিগ উড়তে দেখিনি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। একটু পরেই শুনেছিলাম,—দেশে পাল্টা ক্যু হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপ। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে খালেদ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। বঙ্গভবন ঘেরাও করেন। মন্ত্রীদের পদত্যাগে বাধ্য করেন। 'বিদ্রোহী মেজরদের' বিমানে অনির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করে আটক রাখেন। এ সবকিছুই ছিল লোকমুখে শোনা খবর।

জাতীয় জীবনে এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থায় দেশের সকল সংবাদ মাধ্যগুলো ছিল নীরব নিস্তব্ধ। টিভি-রেডিও ছিল স্তব্ধ। কোথাও কোন সংবাদ প্রকাশ হয়নি। ফলে দেশের সর্বত্র বিরাজ করছিল এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। আর জন্ম হচ্ছিল নানা ধরনের উদ্ভট গুজব। বিভিন্ন স্থান থেকে লিফলেট ছাপিয়েও গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। এতে শুধু আতঙ্ক বাড়ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিগত শাসন আমলে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে জারি করা হয়েছিল একদলীয় শাসনব্যবস্থা। বাকশালের মাধ্যমে চলছিল সকল ধরনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। এই একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সেদিনের শাসকগোষ্ঠী '৭৫-এর ১৬ জুন তারিখে সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ জারি করে

www.nagorikpathagar.org

৪টি বাদে দেশের সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এ ৪টি দৈনিকও ছিল সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ সংবাদ বিশেষ করে সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন সংবাদ কখনই প্রকাশিত হতে পারেনি। এমনিভাবে বহুদলীয় মত ও বহুদলীয় গণতন্ত্র বিকাশের পথ হয়ে পড়েছিল রুদ্ধ। দেশে টিভি-বেতার চালু ছিল। কিন্তু তাও ছিল সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত। ফলে এই ভয়াবহ সঙ্কটময় মুহূর্তে কোন খবরই জানার কোন সুযোগ ছিল না। এমনি অবস্থায় সম্ভবত ৪ নভেম্বর রেডিওতে কাফি খানের কণ্ঠে শুনেছিলাম "ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করা হয়েছে। আর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।" এ খবর প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরের দিন বাংলাদেশ টাইমসে ছাপা হয়েছিল রিয়ার এ্যাডমিরাল এম এইচ খান ও বিমানবাহিনী প্রধান তাওয়াব খালেদ মোশাররফকে জেনারেল ব্যাজ পড়িয়ে দেয়ার ছবি। জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতারের খবরটাও যেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে।

জিয়ার সঙ্গে এদেশের লাখো মানুষের অসংখ্য স্মৃতি জড়িত। ত্রিশ বছর আগের ফিকে ধরা অনেক স্মৃতি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একাত্তরের ২৫ মার্চের ঘটনাবলী। সেদিনের রাতের অন্ধকারে পাক হায়েনাগুলো যখন এদেশের ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পরেছিল তখন কোন পথ খুঁজে পায়নি কেউ। পথহারা মানুষ নেতৃত্বহীন অবস্থায় উদভ্রান্তের মতো ছুটেছিল এখানে সেখানে। হাজার হাজার মানুষের লাশ পড়েছিল সদরঘাট-নবাবপুর আর মিরপুরের রাস্তায়। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মহানগরীর মানুষ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে একেকজন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই অবস্থায় আকস্মিকভাবে তারা রেডিওতে শুনেছিল, "আমি মেজর জিয়া বলছি, আমাদের মহান নেতা বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে সরকার গঠিত হয়েছে। "আমি ... বৃহৎ শক্তিবর্গ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতিদান এবং পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনীর গণহত্যা বন্ধ করার উদ্দেশে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। ... জয়বাংলা।"

জিয়ার সেই কণ্ঠস্বর শুনে এদেশের মানুষ আলোর সন্ধান পেয়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। জিয়ার নেতৃত্বেই সেদিন শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম। এদেশের মানুষের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছিলেন জিয়া। সেই জিয়াকে আটক করা হয়েছে, ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে জোয়ানরা হাতিয়ারসহ ছুটে এসেছিল ঢাকায়, সমবেত হচ্ছিলেন ক্যান্টনমেন্টে। তারপর গভীর রাতে ছিনিয়ে এনেছিল জেনারেল জিয়াকে।

www.nagorikpathagar.org

দেশপ্রেমিক সেনা, বিডিআর, পুলিশ, বিপ্লবী সৈনিক গণবাহিনী, ছাত্র শ্রমিক জনতাও ছিল তাদের সাথে। তারপর আটক অবস্থা থেকে তারা জেনারেল জিয়াকে উদ্ধার করেছিল। উল্লাস ও মিছিল করেছিল। জয়ধ্বনি দিয়েছিল। সারা রাত ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে আনন্দ-উৎসব করেছিল। গভীর রাতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে রেডিওতে জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন "আমি জেনারেল জিয়া বলছি ...। সিপাহী-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে সমস্ত ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে কেউ নস্যাত করতে পারবেন না ইনশাল্লাহ। আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে যার যার কাজে যোগ দিন।"

জিয়ার কণ্ঠ শুনে উদ্বেগ কমেছিল কিন্তু বেড়ে উঠেছিল উৎকণ্ঠা। সকাল হতে না হতেই রাস্তায় নেমেছিলাম, হাজারো মানুষের ভিড়। ট্রাকে ট্রাকে সিপাহী-জনতা আর ছাত্র-সৈনিকের মিছিল স্লোগান। সে এক অভুতপূর্ব দৃশ্য। পথচারীরাও জোয়ানদের সাথে কোলাকুলি করেছে। মোড়ে মোড়ে শত শত সৈন্য।

প্রেসক্লাবে এসে দেখি সেখানেও অসংখ্য মানুষের ভিড়। জাসদ সমর্থকদের উল্লাস। তাদের মতে, কর্নেল তাহের ছিলেন ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের স্থপতি। আর গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আসল কর্মী। কর্নেল তাহের মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন সেক্টর কমান্ডার। সামনাসামনি যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি তাঁর পা হারিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি নতুনভাবে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেনাবাহিনী সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা ছিল। তিনি মনে করতেন সেনাবাহিনী হবে সাধারণ মানুষের। মেজর থেকে মেজর জেনারেলের কোন পার্থক্য থাকবে না। সবাই মিলেমিশে মাঠে কাজ করবে। দেশ গড়বে। ওরা হবে গণবাহিনীর সদস্য। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি তিনি বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আর তাঁর নির্দেশেই ঘটেছিল ৭ নভেম্বরের বিপ্লব। বিপ্লবের পর শুরু হয়েছিল আর এক সংঘাত-সংঘর্ষ। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্যুদেতায় খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হায়দার নিহত হয়েছিলেন। সেনাবাহিনীতে অফিসার নিধান শুরু হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। অনেক সম্ভাবনাময় অফিসারকে সাধারণ জোয়ানদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। জেনারেল জিয়া কঠোরভাবে সেনাবাহিনীর এইসব বিশৃঙ্খলা দমন করেছিলেন, ফিরিয়ে এনেছিলেন শান্তি। দেখতে দেখতে দু'যুগ পার হয়ে গেছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে আমরা এখন গণতন্ত্রের সোপানে দাঁড়িয়েছি। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার নিগড় ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহুদলীয় গণতন্ত্র। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তিমালিকানাধীন টিভি চ্যানেল। বহুদলীয় মতপ্রকাশের অধিকার হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে শিল্পকারখানাও স্বয়ম্ভরতা অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সামনে সোনালি সূর্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সিপাহী-জনতার রক্তে প্রতিষ্ঠিত এদেশের সার্বভৌমত্ব দিন দিনই হয়ে উঠছে দৃঢ়-বজ্রকঠিন। তার ওপর দাঁড়িয়েই মানুষের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—গণতন্ত্রের ভিত হবে সুদৃঢ়।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ও কিছু অজানা কাহিনী

মেজর (অব.) আসাদুজ্জামান

৭ নভেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন। সম্প্রসারণবাদ আধিপত্যবাদ ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এক সরব বিপ্লবের দিন। তাই জাতির জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সন থেকে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত দেশে একনায়কত্ববাদ ও ফ্যাসীবাদের জন্ম হয়েছিল। তাতে মানুষের জান-মাল, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটেছিল। ৭ নভেম্বর সেই কালো অধ্যায়ের যবনিকা সরিয়ে ফেলে নতুন সূর্য উদিত হয়েছিল যাকে নিভিয়ে ফেলার প্রয়াস নেয়া হয়েছিল ৩ নভেম্বরের কালো রাতে।

ঐ দিন দেশের জাগ্রত সৈনিক-জনতা ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট-এর ধারাবাহিকতা ধরেই ৭ নভেম্বর-এর জন্ম। আগস্ট বিপ্লবের পর খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি অংশ ক্ষমতা দখল করে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও সিনিয়রিটি অনুযায়ী বহু আগেই তাঁর এ পদ পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে হয় নাই। সেনাপ্রধান হিসাবে বেশ যোগ্যতার সাথে তিনি সেনাবাহিনী পুনঃগঠন ও পুনঃসজ্জিত করার কাজে হাত দেন। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (তখনকার চিফ অব জেনারেল স্টাফ) ক্ষমতা দখল করেন। ঐ ক্ষমতা দখল সেনাবাহিনীর বিভিন্ন র‍্যাংকের সৈনিকেরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারে নাই। কারণ এটা যে ছিল রুশ-ভারত মদদপুষ্ট অভ্যুত্থান তা উল্লেখ না-করলেও সবাই জানেন। তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই আওয়ামী লীগের ছিল এবং এই অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগের ভিতর আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল ও তারা যে পুনঃক্ষমতায় ফিরে এসেছিল এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। রাস্তায় রাস্তায় আওয়ামী লীগের মিছিল যার নেতৃত্বে ব্রিঃ খালেদের আত্মীয় স্বজনদের দেখা যাচ্ছিল। ঐ স্বল্প সময়কালে তিনি জাতির সামনে তেমন বক্তব্য ও কর্মসুচী তুলে ধরতে পারেন নাই। সব মিলিয়ে এক ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল। এক ভয়ার্ত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সমগ্র জাতি

www.nagorikpathagar.org

উৎকণ্ঠ চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে কি হয় না হয়। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় জাতি ঐ কয়েকদিন অতিবাহিত করে।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকেই সমস্ত জাতির সামনে এক বিশাল ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন তার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে, তাঁর নির্গমন এমনিভাবে কেউ মেনে নিতে পারছিল না। জাতির মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল তাহা অচিরেই নিভে যাবে তা কেউ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

কর্নেল তাহেরের (অব.) নেতৃত্বে জাসদ-এর উগ্রপন্থী সদস্যরা এই সুযোগে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। তাদের সেনাবাহিনীর ভিতর একটি উইং ছিল যার নাম "বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা"। এখানে বলে রাখা ভাল, এই উইং ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব বাঙালী সৈনিক পাক-ক্যাম্পে আটক অবস্থায় ছিল সেই সময় কিছু কিছু অল্প শিক্ষিত সৈনিক উক্ত বামপন্থী ভাবধারার প্রচার আরম্ভ করে এবং তথাকথিত এক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে এসে অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ তাহারা সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তেমনভাবে সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ না থাকায় এবং সৈনিক-জনতার সতর্ক দৃষ্টি থাকায় এ কাজে তারা তেমন সফলতা লাভ করতে পারে নাই।

৬ নভেম্বর রাত ১১ টার পর বিভিন্ন ইউনিটে গোলাগুলী আরম্ভ হয়ে যায়। বিশেষ করে তৎকালীন চীফ অব স্টাফের বাসা উদ্দেশ্য করে এই গোলাগুলী আরম্ভ হয়। দুই/তিন ঘন্টার ভিতর বিভিন্ন ইউনিটের কয়েকশ সৈনিক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাড়ি ঘেরাও করে। সেখানে যারা তাকে আটক রেখে পাহরা দিচ্ছিল তারা রণেভঙ্গ দিয়ে সরে পড়ে। বিনা বাঁধায় ২য় ফিল্ড আর্টিলারীর সৈনিকেরা তাকে মুক্ত করে ২য় ফিল্ড আর্টিলারীর অফিস কক্ষে নিয়ে আসে। এই সংবাদ দাবানলের মত ঢাকা ক্যান্টসহ অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে পড়লে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত সমস্ত র‍্যাংকের সৈনিকেরা আনন্দে ব্যারাক / মেস ছেড়ে বের হয়ে আসে এবং উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। সেনাবাহিনীর চেইন-অব-কমান্ড ভেঙ্গে যে যার মত করে চলতে থাকে কয়েকদিন।

৭ নভেম্বর সকালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের (অব.), খন্দকার মোশতাক ও প্রধান বিচারপতি সায়েম রেডিও সেন্টারে যান এবং খন্দকার মোশতাক ও প্রেসিডেন্ট সায়েম ভাষণ দেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। ভাষণে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল না বা কোন দিকনির্দেশনাও ছিল না বিধায় এটাকে সকলে গতানুগতিক ভাষণ বলেই ধরে নিয়েছিল।

রেডিও সেন্টারে প্রবেশের পথে সৈনিক সংস্থার লোকজন বাধার সৃষ্টি করে ও জেনারেল জিয়াকে চাপ দিয়ে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবীতে সই করিয়ে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

যে দাবীগুলো পুরাপুরি বাস্তবায়ন করতে হলে সেনাবাহিনী শৃংখলার ব্যাপক অবনতি ঘটার আশংকা ছিল।

সৈনিক সংস্থার দাবী মেনে নিয়ে জেনারেল জিয়াউর-এর উপর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সেনা সমাবেশে ভাষণ দেবার জন্য চাপ দেওয়া হয় ঐ দিন বিকালে। কিন্তু ঐ দিন একটা সুগভীর ষড়যন্ত্রও কাজ করছিল যেটা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরে জিয়াকে শহীদ মিনারে যেতে দেওয়া হয় নাই বা তিনি যান নি। ঐ দিন শহীদ মিনারে গেলে হয়ত বাংলার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লিখিত হতো।

১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেটাকে বগুড়া থেকে ঢাকায় আনা হয় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ-এর ক্ষমতা দখলকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য, সরাসরি শেরে-বাংলা নগরে এম, পি হোস্টেলে অবস্থান নিয়েছিল ৪ নভেম্বর ভোর বেলায়। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। শহরে কার্ফু বলবৎ করার ও শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে বিপ্লবী সংস্থার যে কোন হঠকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; সমস্ত ঢাকা শহরে সকাল-বিকাল ও রাতে শো ডাউন করার পর অতি উৎসাহী বিপ্লবী কার্যক্রম থমকে গিয়েছিল। এই সুযোগে বেশ কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য কয়েকজন সামরিক অফিসার ও মহিলা (সি এম এইচ-এর) ডাক্তারদের উপর অত্যাচার করে ও হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর নির্দেশ আসে রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বিশেষ করে সি এম এইচ-এর ভিতর পেট্রোল জোরদার করতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

১০ নভেম্বর থেকে সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং সৈনিকেরা যে যার ব্যারাকে ফিরে আসে। চেইন অব কমান্ড পুরাপুরি ফিরিয়ে আনা হয়। ২৩ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের (অব.) বড় ভাই সার্জেন্ট ইউসুফ গ্রেফতার হন। ২৪ নভেম্বর রাতে কর্নেল তাহেরকেও গ্রেফতার করার সাথে সাথে অন্যান্য জাসদ নেতাদের পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করা হয় বা তারা আত্মগোপন করেন।

তেসরা নভেম্বর-এর অভ্যুত্থানের রাতেই কোন এক সময় আওয়ামী লীগের চারজন সিনিয়র নেতাকে জেলের ভিতর হত্যা করে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের পিছনে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমর্থন ছিল না তেমনি সাধারণ মানুষ এই হঠকারী পদক্ষেপ কোনক্রমেই সমর্থন করে নাই। দেশের ভিতর যেমন তার বিরুদ্ধে রুষে উঠতে থাকে তেমনি কূটনৈতিক পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে রুশ-ভারতের মদদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হতে থাকে। অতি অল্প সময়ের ভিতর এই দখল প্রক্রিয়া ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, পথে তাঁরা ধরা পড়ে এবং শেরে বাংলা নগরে বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের রোষাণলে পরে নিহত হন। এখানে কারও কোন নির্দেশ অথবা আদেশ প্রয়োজন পড়ে নাই কোন হুকুমও কাজে আসে নাই।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আজ সুস্পষ্ট যে, ৭ নভেম্বরের পর যদিও প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ছিলেন বিচারপতি আবু সায়েম সাহেব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। সেই পদে বসে জিয়া পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি চেয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর একটা সংহতি সৃষ্টি করতে যাতে চিরদিনের বিভেদ ভুলে সবাই এক সঙ্গে কাজ করে জাতিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভারত সৃষ্ট যে আগ্নেয়গিরির উপর বসে তিনি অগ্ন্যুৎপাত থামাতে চেয়েছিলেন তা না থামায় সেই অগ্ন্যুৎপাতের লাভায়ই তিনি পুড়ে মারা গেলেন। তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন এ জাতীর শত্রুরা জাতির সংহতি বিনাশে কতটা সক্রিয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮১ সনের ৩০মে সকালে প্রতিবেশী দেশের উস্কানীতে বিক্ষুব্ধ ও অতৃপ্ত সেনা অফিসারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হতে হয়। বাংলাদেশেব স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন একটি বিদেশী শক্তি এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, দেশপ্রেমিক, কঠোর পরিশ্রমী, সৎ নিষ্ঠাবান একজন যোগ্য রাষ্ট্রানায়ককে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলে।

www.nagorikpathagar.org

পঁচাত্তরের নভেম্বরের কয়েকটি দিন

খায়রুল আনাম

বাংলাদেশের ইতিহাসের ৭ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসাবে দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালের এই দিনে 'স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান ঘটে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভাষায় "বাংলাদেশী জাতীয়তায় উজ্জিবীত হয়ে জাতি সেদিন প্রমাণ করেছিল যে অনৈক্য নয়, শক্তিশালী ঐক্যই আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকির বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ। তাই ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূর প্রসারী।" বস্তুতঃ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি নাগরিক সাধারণের বোধ চেতনা যে কতখানি প্রখর তা এ দিনটিতে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সেদিন রাজপথে নেমে ছিল সিপাহী-জনতার মিছিল।

৭ নভেম্বর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পেছনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের দৃশ্য। ঐদিন শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন। শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় যারা সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁরা স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটেছে বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতায় এলেন আওয়ামী লীগের একজন মন্ত্রী ও শেখ মুজিবের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোগী খন্দকার মোশতাক আহমদ। ক্ষমতায় এসেই দেশের সংবিধান ও জাতীয় সংসদ বাতিল করলেন না। তিনি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ও ফ্রি ইকনমির কথা বললেন। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের কথাও ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু খন্দকার মোশতাক শেষপর্যন্ত সামলাতে পারলেন না। শুরু হলো চারদিকে ষড়যন্ত্র। জনসাধারণের কাছে এসব খবর এসে পৌঁছায় না। ফলে সর্বত্র শোনা যেতে লাগলো গুজব আর গুজব, এর কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা তা সে সময় যেমন যাচাই করা যায়নি, পরবর্তীকালেও সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেননি। খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

যখন ভেতরে ক্ষমতার লড়াই আর বাইরে গুজব চলছিল তখন ১ নভেম্বর বার্তা সংস্থা খবর দিলেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের সভাপতিত্বে বঙ্গভবনে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই এক লাইনের খবর ছাড়া আর কোন তথ্য তাতে ছিল না। ৩ নভেম্বরের পত্রিকায় বিমান বাহিনীর স্টাফ প্রধান এয়ার ভাইস মার্শল এম, জি তাওয়াবের শামসের নগরে বিমান বাহিনীর স্বনির্ভর কৃষি প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনের ছবি ও খবর ছাপা হয়েছিল। ৪ নভেম্বরের পত্রিকায়ও কোন খবর দেখা যায়নি।

অথচ ২ নভেম্বর মধ্যরাত্রে ঘটে গেল ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব এম, মনসুর আলী, অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং সাবেক শিল্পমন্ত্রী জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করার পর নেতৃবৃন্দের লাশ ৪ নভেম্বর বেলা পৌনে দু'টার সময় আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর এদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। ৪ নভেম্বর গভীর রাত্রে প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণায় বলা হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত জঘন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে সেনাবাহিনী জড়িত বলে যে গুজব রটানো হচ্ছে তা সঠিক নয়। ঘোষণায় অবিলম্বে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য একটি ৩ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠনের কথা বলা হয়। এই কমিশনের প্রধান হলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (আপীল বিভাগ) বিচারপতি জনাব আহসান উদ্দিন চৌধুরী এবং অন্য দু'জন সদস্য হলেন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি জনাব কে, এম, সোবহান ও বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি।

তিন তারিখে প্রেসিডেন্টের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় ঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, পিএসসি-কে ৩ নভেম্বর পূর্বাহ্ন থেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে চীফ অব আর্মি স্টাফ নিযুক্ত করা হয়েছে। একই দিনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করেছেন। ৪ নভেম্বর 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি দিবস' পালন উপলক্ষে ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিসহ মৌন মিছিল বের করে। অন্যান্যের মধ্যে খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতা রাশেদ মোশাররফও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

৫ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রধান বিচারপতি এ, এম, সায়েমের নিকট প্রেসিডেন্ট দায়িত্বভার অর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিচারপতি সায়েম ৬ নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে জাতীয় সংসদ

www.nagorikpathagar.org

বাতিল করেন এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে দেশে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ৬ তারিখ মধ্যরাত থেকে শহরে প্রচন্ড গোলাগুলীর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ৭ নভেম্বরের ভোরে ঢাকার রাজপথে জিয়া ও মোশতাকের ছবিসহ সিপাহী-জনতার মিছিল দেখা গেল। ভোরে এক সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। সরকারী বার্তা সংস্থা জানায়, খন্দকার মোশতাক নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে কোন খবর পরিবেশন করা হয়নি। অবশ্য ঢাকা শহরবাসীরা ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যে, খালেদ মোশাররফ নিহত হয়েছেন। ৭ নভেম্বর রাত্রে প্রেসিডেন্ট সায়েমের ভাষণে জানা গেল যে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং জিয়া সেনাবাহিনী প্রধান। সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশতাকও এক বেতার ভাষণে তার বদলে নির্দলীয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রধান বিচারপতি সায়েমের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকে শোভন বলে ঘোষণা করেন। ৭ নভেম্বরের এই অভ্যুত্থান দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে।

ইত্তেফাক : ৭ নভেম্বর, ১৯৭৯

www.nagorikpathagar.org

সিপাহী বিদ্রোহের দিনগুলি

লে. কর্নেল এম এ হামিদ পিএসসি (অব.)

ঘুরে ফিরে আবারও ফিরে এসেছে ৭ নভেম্বর। বাঙালী জাতির স্মৃতিপটে মিশে আছে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের কথা ও কাহিনী।

ঘটনাবহুল ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। এটা ছিল সিপাহী বিদ্রোহ ; নাকি সিপাহী বিপ্লব, নাকি 'সিপাহী-জনতার' বিপ্লব ! কি বিশেষণে ভূষিত করা যায় এই দিনটিকে ?

১৮৫৭ সালে এই উপমহাদেশে সংঘটিত হয়েছিল প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। প্রাণ বিসর্জন দেয় শত শত বীর সৈনিক। এরপর ১৯৭৫ সালে ঢাকায় সংঘটিত হল একই স্টাইলে একই ধরনের সিপাহী বিপ্লব। অন্যায়, অবিচার ক্ষমতালোভী অফিসারদের গদি দখলের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে। পঁচাত্তরের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সবই ছিল প্রকৃতপক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসারদের ক্ষমতার লড়াই।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের ভোরবেলা। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুটি রেজিমেন্ট—টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট ও বেঙ্গল ল্যান্সার ট্যাংক রেজিমেন্ট দুই তরুণ অফিসার কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশীদের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন আক্রমণ করে তাকে সপরিবারে হত্যা করে। সৃষ্টি হয় ক্ষমতার শূন্যতা। একটি আঘাতেই একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটল। তারা খন্দকার মোশতাক আহমদকে গদিতে বসিয়ে নিজেরাই ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশ শাসন করতে থাকে। চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ল। সর্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ, গুঞ্জন। যে কোন সময় একটি 'কাউন্টার ক্যু' ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিল। জিয়াউর রহমান তখন সেনাবাহিনী প্রধান। বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ ও ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল প্রবল চাপ সৃষ্টি করল জিয়ার ওপর, মেজরদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে। জিয়ার আশ্বাস, 'Wait and See'। সুযোগ আসন্ন দেখে জাসদের বিপ্লবী উইংয়ের কমান্ডার কর্নেল তাহেরও জেগে উঠলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সময়ে জিয়াউর রহমান সবার পিঠ চাপড়ে, সব গ্রুপের সঙ্গে সমান সম্পর্ক বজায়

www.nagorikpathagar.org

রেখে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে থাকেন। কর্নেল (অব.) তাহেরের সঙ্গে এই সময় তার গোপন সমঝোতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। দড়ির ওপর পারফেক্ট ব্যালেন্স রক্ষা করে চলতে থাকেন জিয়া ! পড়লে আর রক্ষা নেই ! তাহেরের বিপ্লবী সংস্থার সদস্যরা এই সময় ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সব দিকে সাজ-সাজ-সাজ রব। একটি প্রবল ঝড়ের আশঙ্কায় সবাই চিন্তিত হয়ে রইল। ক্ষমতা দখলের মঞ্চে তখন তারা তিনজন—জিয়া, খালেদ ও তাহের; তিনজনই মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী।

৭ নভেম্বর

৬/৭ নভেম্বর রাতের প্রথম প্রহর। অকস্মাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম প্রহরে জেগে উঠল ঘুমন্ত ক্যান্টনমেন্ট। রাত ১১টা থেকে শুরু হল প্রবল গুলীবর্ষণ। চতুর্দিকে শুধু গুলী আর গুলী। ট্যা- ট্যা- ট্যা ! আলোর ছটা ছিটিয়ে রাইফেলের ট্রেসার রাউন্ড ছুটল আকাশে। পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—সব দিক থেকে ছুটে আসছে গুলী আর গুলী, আর মানুষের তুমুল চিৎকার-ধ্বনি।

এই সেই সিপাহী বিপ্লব যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে। সৈনিকরা ব্যারাক ছেড়ে রাস্তায়। ভয়ে কম্পমান অফিসারগণ গুটিসুটি মেরে তাদের বাড়িতে। সিপাহীদের হাতে খোলা রাইফেল। লুণ্ঠিত হল প্রধান অস্ত্রাগার। সর্বত্রই স্লোগান—সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ষা নাই। জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। স্টেশন হেডকোয়ার্টারের গ্যারেজ ভেঙ্গে আমারই জিপ নিয়ে মাইক লাগিয়ে স্লোগানমুখর বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ ছুটছে রাস্তায় রাস্তায়।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সব ইউনিট থেকে দলে দলে সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। সবাইর গন্তব্য জিয়ার বাসভবন। সবাই ছুটে চলেছে জিয়াকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করতে। জিয়ার বাসভবনের সম্মুখে প্রধান গেটের আশপাশে স্লোগানমুখর যুদ্ধংদেহী বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দল যারা জিয়াকে পাহারায় রেখেছিল তারা বিপ্লবের মুখে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেছনের দিকে পালিয়ে গেল। গেট টপকে সৈনিকরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। চতুর্দিকে হট্টগোল আর গুলী। জিয়া তখন নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সৈনিকরা জিয়াকে মুক্ত করে টু-ফিল্ডের অফিস কক্ষের দিকে নিয়ে চলল। চারদিকে হৈচৈ আনন্দ আর উল্লাসধ্বনি। জিয়া মুক্ত।

যদিও তাহেরের সমর্থকদের জোর দাবি, তাদের বিপ্লবীরাই জিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। কিন্তু আসলে এটা ছিল সর্বস্তরের সৈনিক ও বিপ্লবীদের একটি যৌথ অপারেশন।

রাত ১২টা। বঙ্গভবনে খালেদ মোশাররফ ক'জন অফিসারসহ মিটিং করছিলেন। ক্যান্টনমেন্টে এত গণ্ডগোল, এত ঘটনা ! অথচ প্রথমদিকে তারা কিছুই টের পাননি। কি অবাক ব্যাপার ! পরে মধ্যরাতে খালেদ যখন ফোন পেলেন, তখন তার গদি উল্টে গেছে। তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তিনি দু'জন সহযোগীসহ প্রাইভেট কারে

www.nagorikpathagar.org

তৎক্ষণাৎ বঙ্গভবন ত্যাগ করে শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত তার বিশ্বস্ত ইউনিট দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানেই আপন সৈনিকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী খালেদ মোশাররফ। একটু পরেই বিপ্লবীরা বঙ্গভবন আক্রমণ করে। তাদের তাড়া খেয়ে খালেদের সহযোগী ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল বঙ্গভবনের দেয়াল টপকে পালাতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেন। পরে নারায়ণগঞ্জে পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। বঙ্গভবনে তার ব্রিগেডের সব সৈনিক এক মুহূর্তেই তার পক্ষ ত্যাগ করে জিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। ক্যান্টনমেন্টেও ঘটে একই ঘটনা। ৬/৭ নভেম্বরের মধ্যরাতের নাট্যমঞ্চে আবার ফিরে আসা যাক। জিয়াকে মুক্ত করে টু-ফিল্ডে নিয়ে আসার পর শুরু হল গুরুত্বপূর্ণ নাটক। বিপ্লবী কর্নেল তাহের তার দলবলসহ ছুটে আসেন টু-ফিল্ডে জিয়ার কাছে। তারা দুজনকে আলিঙ্গন করেন। তাহের বলেন, 'আপনাকে এখনই শহরে রেডিও স্টেশনে যেতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে। জিয়া এত গণ্ডগোলের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে বাইরে যেতে অস্বীকার করেন। ভেস্তে যায় তাহেরের প্লান। ওই সময় তাহেরের চাপে সৈনিকদের অবস্থান ছেড়ে বাইরে গেলে নিশ্চিতভাবে বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারাতেন জিয়া। নভেম্বরের ইতিহাসও তাহলে অন্যভাবে লেখা হতো। ক্যান্টনমেন্টে জিয়া সৈনিকদের ঘিরেই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। তাহেরের বিপ্লবী সৈনিকরা বহুভাবে রক্ষপাত ঘটানো চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে কর্নেল আমিনুল হকের নেতৃত্বে চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট জিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্যান্টনমেন্টের সকল স্তরের অফিসাররাও জিয়ার পাশে থাকেন। তবে জেসিও, এনসিও এবং কিছু সৈনিক তখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। জিয়া ছলে-বলে-কৌশলে কঠিন সময় নির্বিঘ্নে পার করে দেন এবং ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হন। যদিও ওই রাতে ওই সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, জিয়া এবং তাহের উভয়ের মধ্যে যে কেউ যে কোন মুহূর্তে নিহত হতে পারতেন।

৭ নভেম্বরের ভোরবেলার দৃশ্য। আনন্দে উন্মত্ত সৈনিকরা। তারা আজ সবাই রাজা। ইউনিট থেকে তারা গাড়ি বের করে ছুটে চলল শহরের দিকে। বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো সারারাত ঝিম ধরে বসে ছিল। ভোরের আলোতে তারাও সশব্দে ছুটে চলল শহরের দিকে। ঢাকা শহরের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের চতুর্দিকে অভূতপূর্ব দৃশ্য। আনন্দমুখর জনতা। সৈনিক ও ট্যাংকগুলো ঘিরে তারা নাচতে শুরু করেছে। তাদের আজ আনন্দের সীমা নেই। তারা ছুটে এলো হাজারে হাজারে। শ্লোগান তুলল—'সিপাহী জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ, আল্লাহু আকবর, সর্বত্র ইসলামপন্থী জনতা। ওই মুহূর্ত থেকে সিপাহী বিপ্লব রূপান্তরিত হল 'সিপাহী-জনতার' বিপ্লবে। সৈনিক-জনতা একাত্ম হয়ে গেল এক মহান নিপ্লবের সঙ্গে। সৃষ্ট হল এক নতুন ইতিহাস। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় একবার একাত্ম হয়েছিল নির্যাতিত বাঙালী সৈনিক-জনতা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পঁচাত্তরের নভেম্বরে এসে সেই ইতিহাস সৃষ্টি হল। একই দৃশ্য

www.nagorikpathagar.org

জনতার একই ভাবাবেগ, একই চেতনা—উচ্চাকাঙ্ক্ষী খালেদ-শাফায়াত চক্রের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে, কল্পিত ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। এসবই ছিল ৭ নভেম্বরের মূল চেতনা-শক্তি। ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ছিল সম্পূর্ণভাবে সিপাহী-জনতার বিপ্লব। এখানে অফিসারদের কোন ভূমিকাই ছিল না। একমাত্র জিয়াউর রহমান ছিলেন বিপ্লবের মহানায়ক, মূল কেন্দ্রবিন্দু। জয় সূচিত হল জেনারেল জিয়ার। পরাজিত কর্নেল আবু তাহের। পরবর্তী সময়ে ভেঙেচুরে চুরমার করে দেয়া হল জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে প্রাণ দিলেন কর্নেল তাহের। নিহত হলেন জেনারেল খালেদ মোশাররফ। পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। বাদবাকিরা ধরা পড়ে বন্দী হলেন। ৬/৭ নভেম্বরের মধ্যরাতে ক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে বিপ্লবী সংস্থার সৈনিকরা। ৭/৮ তারিখ রাতে বিপ্লবীরা সব অফিসারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। শুরু হয় অফিসার নিধন অভিযান। অফিসারদের বাসায় বাসায় আক্রমণ। অলৌকিকভাবে বেঁচে যান অনেকে। রাত শেষে ১২ জন অফিসার নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। ভীত-সন্ত্রস্ত অফিসাররা প্রাণভয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে বাইরে ছুটে চললেন আশ্রয়ের আশায়। এসবই ছিল মহান সিপাহী-জনতার বিপ্লবের বিয়োগান্ত কাহিনী। সাধারণ সৈনিকরা অযথা রক্তপাত চায়নি। তারা চেয়েছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী কমাণ্ডারদের বল্গাহীন উচ্চাভিলাষ, প্রমোশন, সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ আহরণ ইত্যাদি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং সৈনিকদের কিছু ন্যায্য দাবি আদায়। তারা কতটুকু পেল, কতটুকু হারাল তা ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে। তবে নভেম্বর-পরবর্তী মাসগুলোতে রক্তপাগল সৈনিকদের বশে আনতে জিয়া কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বলাবাহুল্য, শেষ পর্যন্ত লড়াকু জেনারেল নিজেই সেই আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যান। পেছনে রেখে যান জাতির জন্য নভেম্বরের শিক্ষা ও সাবধান বাণী।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের ঘটনা, রটনা ও বাস্তবতা

আমিনুর রহমান সরকার

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত সিপাহী-জনতার বিপ্লব এই দেশ ও জাতির জন্যে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই বিপ্লব সমূহ সংকট থেকে কেবল আমাদের রক্ষা করেনি, জাতিগত গর্ব-গরিমা অহঙ্কারকে বিপুলভাবে স্পর্ধিত করেছে। কারণ, এই ঘটনার প্রতি পরতে পরতে রয়েছে দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশী অপকৌশলের বিপরীতে জাতীয়তাবোধকে উজ্জীবিত ও শাণিত করার জীবনমরণ প্রচেষ্টা। প্রমাণ হয়েছে, কোন ষড়যন্ত্র, কুটিলতা, আধিপত্যবাদী নীল-নক্শা আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে পারবে না, আমাদের সদাজাগ্রত সেনাবাহিনী এবং সচেতন জনসমাজ যে কোনো রাষ্ট্রবিরোধী ও গণবিরোধী অপতৎপরতা সময় মতো গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম।

১৫ আগস্টের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী অভ্যুত্থান, ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং তার পরপরই ঘটেছিল ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থান। বিপ্লবের আগে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিল গংদের হাতে বন্দী হন।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ-শাফায়াত জামিল গংদের অভ্যুত্থানের পরই তার পক্ষে আকাশবাণীর সাফাই এবং ঢাকার রাজপথে সংঘটিত আওয়ামী লীগের মিছিল অভ্যুত্থানটিকে ভারতপন্থীরূপে চিহ্নিত করে। ফলে দেশময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সেনাপ্রধানের বন্দীদশা সাধারণ সৈনিকদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

এই পটভূমিতে কর্নেল (অব.) তাহের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার বিপ্লবী অনুসারীদের সঠিকভাবে কাজে লাগান এবং ৬ নভেম্বর রাত ১২টায় অভ্যুত্থান শুরু করে মাত্র দেড় ঘন্টায় তা সফল করে তোলেন। অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর নকশাকার বা স্থপতি যেমন কর্নেল তাহের, তেমনি এর মূল বা প্রধান নেতা জিয়াউর রহমান।

তাহের অনুসারী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ছিল ৭০ থেকে ১০০ জন। তারা অনুঘটকের কাজ করেছিল। প্রচারপত্র ছড়িয়ে ও গোপনে ছোট ছোট সভা, অনুষ্ঠান করে

www.nagorikpathagar.org

তারা সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের অভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার সৈনিকের ৭৫ ভাগই ছিল জিয়ার অনুসারী, বাদবাকিরা ছিল ডালিম-ফারুক বা খোন্দকার মোশতাকের সমর্থক।

৭ নভেম্বর প্রত্যুষে সাধারণ সৈনিক ও জঙ্গী জনতার মিছিলে যে সব স্লোগান ধ্বনিত হয়, তা হচ্ছে— (১) নারায়ে তকবীর– আল্লাহু আকবর, (২) জিয়াউর রহমান—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, (৩) খন্দকার মোশতাক, খন্দকার মোশতাক—জিন্দাবাদ, (৪) রুশ-ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার—সাবধান, (৫) জিয়া জলিল তাহের তোমায়—লাল সালাম, লাল সালাম। এই শেষোক্ত স্লোগানটি উচ্চারিত হয় তাহের অনুসারী তথা বিপ্লবী গণবাহিনী ও জাসদ কর্মীদের মধ্যে। লক্ষণীয় যে, এই স্লোগানেও জিয়াকে অগ্রভাগে রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে যে জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি ছিল আকাশচুম্বী এবং তিনিই যে ছিলেন বিপ্লবের প্রধান শক্তি এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হয় ঘটনার দুই মহানায়ক জিয়া ও তাহেরের মধ্যে। রাত দেড়টায় খালেদ মোশাররফের জিন্দানখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহের উত্থাপিত ১২ দফা দাবির অনেকগুলো তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন। তিনি ঔপনিবেশিক যুগের ব্যাটম্যান প্রথা বাতিল করেন, রাজবন্দীদের মুক্তির নির্দেশ দেন। কিন্তু তাহেরের লক্ষ্যের সাথে একমত হতে পারেননি। তাহের চেয়েছিলেন জিয়ার নেতৃত্বে বামধারার লোকদের নিয়ে একটি বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল হোক এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর সৌধের ওপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠুক। এটি ছিল একটি শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেবার চিন্তা। পক্ষান্তরে জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন বিভেদ নয় জাতিগত ঐক্য এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

এই রশি টানাটানিতে ধীর, স্থির, দূরদর্শী নেতা জিয়াউর রহমানই জয়যুক্ত হন। বিপ্লব হাতছাড়া হয়ে গেছে মনে করে কর্নেল তাহের ও তার অনুসারীরা তখন জিয়াউর রহমানের নবগঠিত সরকারকে উৎখাত করতে নানামুখী তৎপরতা চালান।

একদিকে বিশৃংখল সেনাবাহিনীতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার তাগিদ, আরেকদিকে তাহের অনুসারীদের উসকিয়ে দেয়া নৈরাজ্যিক কার্যকলাপ—এসব সামাল দেবার জন্য জিয়াউর রহমানকে কঠোর হতে হয়। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কর্নেল তাহের ও তার অনুসারীরা কারাগারে নীত হন এবং সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালে তাদের মৃত্যুদণ্ড ও মেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

আজ কেউ কেউ জিয়াউর রহমান ও কর্নেল তাহেরের চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ বলছেন, জিয়াউর রহমান ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে পিছু হটেছেন। কেউ বলেছেন, কর্নেল তাহের আগষ্ট অভ্যুত্থানের বদলা হিসেবে ওই অভ্যুত্থান

www.nagorikpathagar.org

ঘটিয়েছিলেন। এই দুটো প্রচারণার কোনোটাই সত্যি নয়। গত দুই যুগের বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিস্থিতির নিরিখে এ সত্য আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ওই সময় জিয়াউর রহমানের পথই সঠিক ছিল।

যে দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারেনি এবং আধিপত্যবাদী শ্যেন দৃষ্টি যার সার্বভৌম ইচ্ছা বিকাশকে সর্বক্ষণ বাধাগ্রস্ত করে রাখে, সেখানে শ্রেণীভেদ নয়, জাতিগত ঐক্যই ঐতিহাসিক অপরিহার্য। জিয়াউর রহমান ঠিক সময় ঠিক কাজটিই করেছিলেন, যা কর্নেল তাহের উপলব্ধিতে আনতে পারেননি। কারণ তিনি ভুল রাজনীতির ফাঁদে আটকে গিয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন চীনা ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একজন খাঁটি বিপ্লবী ও অসম সাহসী বীরযোদ্ধা। ৭ নভেম্বরের শ্লোগানগুলো থেকেই পরিষ্কার, অভ্যুত্থানটির প্রধান চরিত্র ছিল আধিপত্যবাদ ও আওয়ামী বাকশাল বিরোধী।

জিয়া এবং তাহের দুজনই ক্ষণজন্মা, ঐতিহাসিক পুরুষ। স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৭৫ সালে ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর জাতির সেই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে এই দুই দেশপ্রেমিক, মহৎ ব্যক্তিত্বের চিন্তার সম্মিলন যদি না ঘটত, আধিপত্যবাদী শাসন-শোষণের যাঁতাকলে এই জাতির দুর্গতি যে কোন পর্যায়ে নেমে যেতো, সচেতন প্রতিটি মানুষই তা আজ মানস চোখে স্পষ্ট দেখতে পান। আর ওই মুহূর্তে জিয়াউর রহমান যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতামঞ্চে আবির্ভূত না হতেন গণতান্ত্রিক স্বয়ম্ভরমুখী আধুনিক বাংলাদেশ আমরা কোনদিন পেতাম কিনা তা রীতিমতো সন্দেহের বিষয়।

এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে '৭৫-এর ৭ নভেম্বর পরবর্তী হঠকারিতা, নৈরাজ্যিক ক্রিয়াকর্ম, যা ওই সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ডরূপে চিহ্নিত হয়েছিল' তার সাথে কর্নেল তাহের সম্পৃক্ত থাকলেও বাস্তবিক পক্ষে জাসদ নেতৃত্বের পেটিবুর্জোয়া উন্মাদনা এবং ভ্রান্তিবিলাসই এ জন্য দায়ী। বিপ্লবী তাহের পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন মাত্র। অন্যদিকে জিয়াউর রহমান ভ্রান্তির চোরাবালি থেকে নিজেকে এবং জাতিকে সযত্নে রক্ষা করেছেন কারো পরামর্শে নয়, আপন বুদ্ধি বিবেক বিচক্ষণতা দিয়ে। এখানেই বীরযোদ্ধা জিয়াউর রহমান এবং বিপ্লবী তাহেরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

আজ ইতিহাসের দিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকালে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জিয়াউর রহমান ছিলেন এই ভূখণ্ডের জন্য পরম আশীর্বাদ। যখনি জাতির জীবনে সমূহ সঙ্কট, চরম দুর্যোগ, তখনি জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ত্রাণকর্তার মতো। মওলানা ভাসানীর উদ্যোগ ও উদ্দীপনা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব গণঅভ্যুত্থান থেকে জাতির অন্তরে যখন স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানের জিন্দানখানায় স্বেচ্ছাবন্দীত্ব বরণ করলেন সে সময়ের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। জাতি সেই মুহূর্তে হালভাঙা

www.nagorikpathagar.org

তরীর মতো দিশেহারা, সংক্ষুব্ধ স্রোতাবর্তে নিপতিত। কিন্তু না, ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে শেখ মুজিবুর রহমান যখনি থেমে গেলেন, তার পর মুহূর্তেই অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রত্যুষে জাতির হাল ধরলেন জিয়াউর রহমান।

তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিলেন, সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করলেন, মহাদুর্যোগ থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রক্ষা করলেন। আবার ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আধিপত্যবাদী হিংস্র থাবা যখন আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করতে উদ্যত, অন্তরীণ দশা থেকেও জিয়াউর রহমান টেলিফোনযোগে বিপ্লবী বন্ধু তাহেরকে উদ্দীপ্ত করলেন। বিপ্লব সফল হলো। জাতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পর কর্নেল তাহের যেই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী, হঠকারী. নৈরাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়লেন, জিয়াউর রহমান সংযত হয়ে সুস্থির চিত্তে সমূহ অঘটন থেকে জাতিকে রক্ষা করলেন।

জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক বলয় থেকে ক্ষমতামঞ্চে আসেননি। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক তিনি ছিলেন না। অথচ তিনি যে রাজনীতি, যে অর্থনীতি, শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন, সমগ্র জাতি তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করল, এও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। আরো বিস্ময়কর যে বিপ্লবীরা বছরের পর বছর, দশকের পর দশক সমাজতন্ত্রের জন্য গোপনে-প্রকাশ্যে লড়াই করলেন, রক্ত দিলেন, রক্ত নিলেন, তাদের অনেকেই জিয়াউর রহমানের রাজনীতিতে শামিল হলেন।

এমনকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 'লড়াকু পুরুষ'রাও জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবের মাত্র ক'বছরের মাথায় হাজার হাজার কর্মী-সংগঠকের আত্মদানের কথা ভুলে গিয়ে সমাজতন্ত্রের লাইন বিলোপ করলেন। মেতে উঠলেন তারা 'অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র', 'আরো গণতন্ত্র' ইত্যাদি স্লোগান নিয়ে, যেগুলো শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতি নয়, শ্রেণী সমন্বয়ের রাজনীতি। জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতন্ত্র আর শ্রেণী সমন্বয়মূলক রাজনীতির সাথে যার খুব একটা প্রভেদ নেই। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক না হয়েও জিয়াউর রহমান কিভাবে ওই সময়ে যুগোপযোগী, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

যারা মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে আসেন, তারা যে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার গুণেই ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক-এর পার্থক্য নিরূপণ করে অগ্রসর হন, এ হচ্ছে তারই সার্থক দৃষ্টান্ত। স্মর্তব্য যে, জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবকালে গোটা বিশ্ব জুড়েই চলছিল সমাজতন্ত্রের সঙ্কটকাল। ১৯৭৬ ও '৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কস-লেনিনের ভলিউমের চেয়ে বাইবেল বিক্রি হয়েছিল বেশি।

অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট দর্শনের বিপরীতে সোভিয়েত জনগণের মানসরাজ্যে চলছিল তুমুল এক তোলপাড়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাও থিতিয়ে এসে সোভিয়েত সমাজকে সঙ্কট-কবলিত করে তুলছিল। ওই সময় চীনের নতুন নেতা দেং

www.nagorikpathagar.org

জিয়াও পিং আত্মমুখী কম্যুনিস্ট অর্থনীতি এবং 'একলা চলো' বিদেশনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে 'ওপেন পলিসি' হাজির করেছেন।

ইউরোপ-আমেরিকার প্রযুক্তি বিপ্লব গোটা বিশ্বকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তখন মার্কস-লেনিন-মাওয়ের দেয়া ধ্রুপদী পুঁজিবাদ নেই, ওই ধারার শ্রম শোষণ বা শ্রেণী বৈষম্যও নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তবতাই বা থাকে কি করে?

এদিকে এশীয় ভূমণ্ডল এমনিতেই ধর্মীয় চেতনা, আধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান। এখানে নাস্তিক্যবাদের ঠাঁই নেই। তার ওপর বাংলাদেশ নামক জনপদের সামাজিক জীবন গোড়া থেকেই পরস্পর সহযোগিতামূলক। এখানকার বিত্তশালীরা প্রায় সবাই 'মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া', ঠিকাদার এবং কমিশন ব্যবসায়ী। মার্কস-লেনিনের সংজ্ঞায়িত শিল্পপতি বুর্জোয়া এখানে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে আদমজী-তেজগাঁওয়ের মিল কারখানার একজন সাধারণ শ্রমিকের হয় দেশের বাড়িতে কয়েক কানি জমি আছে, নয়তো শহরে দোকানপাট আছে। অর্থাৎ মার্কস-লেনিন যাকে প্রোলেরিয়েট বা সর্বহারা বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, সেই ধারার সর্বহারা এখানে নেই। শ্রেণী-বিভাজন, শ্রেণী-বিদ্বেষ যেখানে নেই, সেখানে শ্রেণী সংগ্রাম দানা বাঁধতে পারে না। মার্কস-লেনিনীয় কায়দায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও সেখানে অসম্ভব ব্যাপার।

এসব বাস্তবতা যাচাই না করে এদেশের বামপন্থীরা অন্ধভাবে মস্কো আর চীনের তত্ত্ব কচকচিয়ে বেহুদা রক্তক্ষয় করেছেন, হাজার হাজার মেধাবী তরুণের মাথা খেয়েছেন। বেশুমার মানুষ মেরেছেন, অনর্থক সময় খরচ করে নিজেদের জীবন বরবাদ করেছেন। এরা সব রাশি রাশি মাথা, বস্তা বস্তা কাগজ নষ্ট করেছেন পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব সনাক্ত করার জন্য। অথচ এদেশে পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব কোনোদিনই প্রধান ছিল না। প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাথে স্বাধীন জনগোষ্ঠীর, যেটি জিয়াউর রহমান প্রথম সনাক্ত করেন এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে তা গণমুখী ধাঁচে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন।

বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিস্থিতির যে সঙ্কট সন্ধিক্ষণে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ও উত্থান এবং যেভাবে তিনি জাতিকে রক্ষা করে, রাজনীতি-অর্থনীতি, উন্নয়ন-উৎপাদন, শিক্ষা মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। এই জনপদের শত বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানের মহিমা ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ঃ আমার অনুভূতি
সৈয়দ আলী আহসান

আমি তখন রাজশাহীতে। বেশ কিছুদিন যাবৎ ঢাকায় গোলযোগের সংবাদ শুনছি এবং সেজন্য মানসিকভাবে অস্থির ছিলাম। তিন তারিখে জেল হত্যাকাণ্ড ঘটলো এবং সেজন্য আমার অস্থিরতা ছিল। চার তারিখে কামরুজ্জামানের লাশ রাজশাহীতে এলো। তাঁর জানাজায় যাবার নাম করে কিছু ছাত্র আমার অফিসের সামনে বিক্ষুব্ধতা প্রদর্শন করেছিল। আমি সে কারণে একটু চিন্তিত ছিলাম। অবশ্য ছাত্ররা দলে ভারী ছিল না। তারা মুখেই নানা রকম আওয়াজ তুলেছিল। যাই হোক, নভেম্বর মাসের তিন ও চার তারিখ কোনরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল। সে সময় বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি এবং রাজশাহীর ডিসি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কোনরকম অঘটন যেন না ঘটতে পারে সেজন্য তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন। ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হল এবং কিছু সংখ্যক টহলদার পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হল। ঢাকার সঙ্গে সর্বপ্রকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এই বিচ্ছিন্নতা পুরোপুরি কয়েক দিন বজায় ছিল।

রাজশাহীতে একটি ছোট আর্মি ইউনিট ছিল। তার কমান্ডেন্ট ছিল এক যুবক মেজর। তার নাম ছিল মেজর খালিকুজ্জামন। তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির সকলের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে তার ওখানে আমি নৈশভোজে যোগদান করেছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবনে তাকে আমি আপ্যায়নও করেছি। ঢাকার সঙ্গে টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমি খালিকুজ্জামানকে টেলিফোন করতাম এবং খালিকুজ্জামান আমাকে ঢাকার খবর প্রয়োজন মত দিত। ঢাকায় তিন তারিখে জেলহত্যা যখন হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহীতে এ খবর যায়নি। আমরা সুস্পষ্ট খবর পেয়েছিলাম বেলা ১০ টা ১১ টার সময়। খালেকুজ্জামানই এ খবর আমাকে দিয়েছিল। ৩ নভেম্বরের ঘটনার পর একটি ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা ইউনিভারসিটি মহলে দেখা দিয়েছিল। সর্বপ্রকার আশ্বাস পেলেও সম্পূর্ণ ব্যাকুলতা পুরোপুরি দূর হয়নি। ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্র গোলযোগ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে তারা কিছু স্লোগান দিয়ে সরে গিয়েছিল। চার তারিখে সিন্ডিকেটের জরুরী মিটিং ছিল। স্থানীয় একজন উকিল সিন্ডিকেটের মেম্বার ছিলেন। তিনি ছিলেন আওয়ামীপন্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি মিটিং

www.nagorikpathagar.org

বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি মিটিং মুলতবী করে দিলাম এবং পরবর্তী তারিখ পরে ঘোষণা দেয়া হবে এ কথা বললাম।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে দেশে কি হতে যাচ্ছে। কমিশনার এবং পুলিশের শত আশ্বাস সত্ত্বেও আমি কেন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া বিশেষ দেখা যায়নি। মুষ্টিমেয় কয়জন ছাত্র স্লোগান দিতে দিতে আমার অফিস ঘরের সামনে আসে এবং তারপর চলে যায়। জেলহত্যার জন্য আমি চিন্তিত ছিলাম। যে কোন জেলই একটি অবরুদ্ধ জায়গা। সেখানে বন্দিদশায় যারা বাস করে তারা একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে যে বাইরের কোন শক্তি তাদের আক্রমণ করবে না। কিন্তু এ নিশ্চিন্ততা আমাদের দেশে মিথ্যা প্রমাণিত হল। সুশীল এবং নিরপেক্ষ মানুষ এই প্রকার হিংস্রতা কখনই অনুমোদন করতে পারে না। তেসরা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের পর আমি কয়েকদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারিনি। যাঁরা নিহত হলেন তাঁদেরকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে দুঃখবোধ ও বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল।

তিন এবং চার তারিখ একটি মানসিক অশান্তির মধ্যে কাটলো। পাঁচ তারিখে রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, এসপি এবং আর্মি কমান্ডেন্ট আমার বাসায় নৈশভোজে যোগ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা খোলাখুলি আলোচনা করলেন। আলোচনার মধ্যে কমিশনার একবার বললেন, "ঘটনা সব ঘটছে ঢাকায়। আমরা শুধু বিচলিত বোধ করছি শুনে। ভবিষ্যতে আবার যে কি হবে আমি বলতে পারি না। খালিকুজ্জামান বললেন, "আমার মনে হয় সেনা-সদস্যদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া জাগবে। প্রতিক্রিয়া কি হবে তা আমি বলতে পারছি না, কিন্তু হবেই যে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার কাছে অল্পসংখ্যক সেনা আছে। তাদের মনোভাব আমি বুঝতে পারি।"

ঢাকার সঙ্গে আবার যোগাযোগ বন্ধ হল ৭ নভেম্বর সকালে। আমি বিচলিত বোধ করলাম এবং খালিকুজ্জামানকে টেলিফোন করলাম। খালিকুজ্জামান বললো, "আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না ঢাকায় কি হয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করছি ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিছু খবর পেলেই আপনাকে জানাব।" দুপুর বারোটা। সে সময় একজন পিএইচডি গবেষক আমাকে একটি অনুরোধ জানাতে এসেছিলেন যে, তার গবেষণার জন্য যে সমস্ত পুস্তকের প্রয়োজন সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নেই। সেগুলো তার কিনতে হবে এবং এজন্য টাকার প্রয়োজন। আমি তাকে বললাম, "তোমাকে গবেষণার জন্য বৃত্তি দেয়া হয়েছে, তার উপরও আমি তোমাকে কাগজ ও বই কেনার জন্য কিছু টাকা দিয়েছি। সুতরাং আবার নতুন করে তোমাকে টাকা দেয়া একেবারেই অসম্ভব।" এ সময় হঠাৎ খালিকুজ্জামানের টেলিফোন এলো। তার কণ্ঠস্বর বেশ উৎফুল্ল। সে বলল, "একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা ক্যান্টনমেন্টগুলো থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'সিপাহী-জনতা ভাই-ভাই' এই স্লোগান তারা

www.nagorikpathagar.org

দিচ্ছে!" আমি এ সংবাদে উৎফুল্ল হলাম। আমাদের সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ আমলে যে প্রশিক্ষণ ছিল সেই প্রশিক্ষণে তারা লালিত। তারা সাধারণত এর ব্যতিক্রম করতে জানে না। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে যে সেনাবাহিনী তৈরী করেছিল সেই সেনাবাহিনীকে তৈরী করা হয়েছিল জনতার বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্য। তারা যে জনতার বিপক্ষে দাঁড়াতো তার বহু নিষ্ঠুর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। জালিয়ানওয়ালাবাগে জনতার উপর যে নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছিল তা একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে রয়েছে। সেখানে নিরস্ত্র জনতার বেরুবার পথ রুদ্ধ করে নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সৈন্যরা প্রভুর আদেশ মেনেছিল নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং জনতার কথা তারা ভাবেনি। কারণ সেভাবে ভাবতে তাদের শেখানো হয়নি! ব্রিটিশের এই শিক্ষার ধারায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখে তাদের মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা কেউ বুঝতে পারেনি। তারা আমাদের ঘরের মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর সমন্বয়ে যে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় তা তারা জানে এবং এটাও তারা অনুভব করে যে তারা কোন ভিন্ন গোত্রের মানুষ নয়। এটা তাদের শেখানো হয়নি। এটা এক ধরনের সামাজিক অঙ্গীকারের মত। বাংলাদেশের এই সাহসী সৈনিকরা ৭ নভেম্বর জনতার পক্ষ অবলম্বন করেছিল, বহিরাগত কোন শক্তির আনুগত্য তারা স্বীকার করেনি। নিজেদের অনুভূতি এবং মানসিকতার কাছে তারা নিজেদেরকে দায়বদ্ধ ভেবেছিল। সে কারণে তারা তখন নির্দেশিত পথে হাঁটেনি। তারা হাঁটতে চেয়েছিল জনতার সঙ্গে সঙ্গে। এটা একটি নতুন অনুভূতি এবং বিস্ময়কর অনুভূতি। ৭ নভেম্বরের অনুভুতিকে যারা মেনে নিতে চাননি তারা একটি বিকলাঙ্গ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ৭ নভেম্বরের সূত্র ধরেই শহীদ জিয়ার আবির্ভাব আমাদের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে।

বিগত পাঁচ বছর এই ৭ নভেম্বরকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। যারা উপেক্ষা করেছিল তারা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এখন আবার জনতার মুক্তি ঘটেছে এবং তারা ৭ নভেম্বরের ঘটনার স্মৃতিতে নতুন অনুষ্ঠান-সূচি গ্রহণ করেছে।

৭ নভেম্বর আমাদের জীবনে একটি প্রত্যয়ের দিন, একটি মুক্তির দিন এবং একটি সত্য প্রতিষ্ঠার দিন। এদিনকে সামনে রেখে মানুষ সকল সংশয়মুক্ত হয়ে দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় নিজেদেরকে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবার জন্য প্রস্তুত করবেন। ৭ নভেম্বর আমাদের জীবনের আশ্বাসের দিন। এই দিনকে যারা অবলুপ্ত করতে চেয়েছিল তারা দেশপ্রেমিক নয়। আজ আমরা সুযোগ পেয়েছি এ দিনটি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য। এই দিনে আমরা বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা শঙ্কিত না হই এবং সাহসিকতার সঙ্গে যেন সর্বনাশের সম্মুখীন হই।

www.nagorikpathagar.org

প্রেক্ষাপট ৭ নভেম্বর ঃ
সংহতি কাদের মধ্যে এবং কেন ?

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম

২৫ বছর আগের ঘটনা। তাই এখনও যা বলাবলি হবে তা স্মৃতিনির্ভর। আজকে (২০-১০-২০০০) এ নিবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছিল তখন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি সংবাদ পত্রিকায় পড়লাম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একদম শেষ পর্যায়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওই যুদ্ধ নিয়ে কি ভাবছিলেন ও বলছিলেন তার লিখিতরূপ সম্প্রতি আমেরিকার সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ওই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মনোভাবের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হতে বাধ্য। সমকালীন ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এ ধরনের দলিলাদি প্রকাশ অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে ওইরকম কোন রেওয়াজ নেই। তবে গত চার বছরে সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটনে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে দেশবাসী অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী সম্পর্কেও ১৯৯৬-এর পরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা Interview ইত্যাদি বের হয়েছে। প্রত্যেক বছর ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন দিবসটি স্মরণ ও উদযাপন করে। তাই এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। '৭৫-এর ৭ নভেম্বর ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর একটি আঙ্গিক অনেকটা এরকম।

'৭২ থেকে '৭৫ পুরো ৪টি বছরই দেশের জন্য ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য সময়টা অস্থিতিশীল ছিল কোন না কোন প্রকারে। ইংরেজিতে যাকে Teething Problem বলে। তার থেকে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল নবজাত বাংলাদেশ ও তার সেনাবাহিনী। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসেই বোধকরি এ ধরনের সমস্যা হয়। ৫৩ বছর আগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় যে রাজনৈতিক দল ধাত্রীর ভূমিকায় ছিল, সেই পাকিস্তান মুসলিম লীগ শক্ত বিরোধিতার মুখোমুখি হয় ছয়-সাত বছর পর। '৭১-এ বাংলাদেশের জন্মের সময় যে

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক দল ধাত্রীর ভূমিকায় ছিল তারা প্রথম বিরোধিতার স্বাদ পায় দু'বছরের মাথায়। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর পক্ষ থেকেই তৎকালীন সরকারি দল বিরোধিতার স্বাদ পায়। জাসদের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবাহিনীর বিপুল অংশ ছিল মুক্তিযোদ্ধা। জাসদের দর্শন, আকাঙ্ক্ষা, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদিকে বর্ণনা করতে গেলে পুস্তক হয়ে যাবে। সংক্ষিপ্ততম ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় যে, জাসদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও ভিন্নতর শাসনপদ্ধতি কামনা করেছিল। সেনাবাহিনীর গঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাসদের ধারণাগুলো ব্যতিক্রমধর্মী তো বটেই, বিপ্লবাত্মকও ছিল। গত ১০-১৫ বছর যাবত রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছে। আশির দশকের শেষদিকে এটি ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির বিপরীতে জাতীয় সংসদে বিরোধী দল। সমালোচকগণ এটিকে 'গৃহপালিত বিরোধী দল' বলতেন। বর্তমান সরকারের আমলে এটি তথাকথিত ঐকমত্যের সরকারের অংশীদার। কিন্তু ২৫ বছর আগে জাসদ ছিল একটি তরুণ বাঘের মতো। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিকল্প ছিল জাসদ, যদিও উভয়ের শেকড় একখানে ছিল। সেই জাসদ এবং ৭ নভেম্বর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাসদ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী দল। যে কোন সমাজেই ব্যতিক্রমধর্মী বা বিপ্লবাত্মক ধারণা বা মতবাদ বা কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন কাজ। গতানুগতিকতার ধারক ও বাহকগণের জন্য ব্যতিক্রম ও বিপ্লব হচ্ছে মৃত্যু ও বিলুপ্তির পরোয়ানা। তাই গতানুগতিকতার ধারক ও বাহকগণ ব্যতিক্রম এবং বিপ্লবের সর্বাত্মক বিরোধিতা করে। ব্যতিক্রমের জন্য সফলতার অন্যতম বাহনই হচ্ছে বিপ্লব তথা কোন না কোন প্রকারের বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড। ১৯৭৪-৭৫ সালে তৎকালীন জাসদের নেতৃবর্গ এরকমই কিছু ব্যতিক্রমের বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। এর জন্য তারা কিছুটা প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই প্রস্তুতি পর্যাপ্ত ছিল না বলে ঘটনার পরপরই প্রতীয়মান হয়। সেনাবাহিনীর সৈনিকদের ভেতরে জাসদের মতবাদের পক্ষে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও বিদ্যমান সেনাবাহিনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল মস্তবড় অপরাধ। সৈনিকদের নিয়ে গড়ে তোলা গোপন সংগঠনের নাম ছিল 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'।

গত দুই-তিন বছরে ৭ নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু কিছু ব্যক্তিত্বের বক্তব্য বা Interview পত্রিকায় পড়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আলোচ্য ঘটনাটি ৭ নভেম্বর তারিখেই ঘটানোর জন্য ৭ দিন আগেও প্রস্তুতি ছিল না। ঘটনাটি যে ৭ নভেম্বরে ঘটানো হবে, সেই সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল ৩ নভেম্বরের ঘটনার পর। পাঠক (বিশেষত ৩০

www.nagorikpathagar.org

বছরের নিচে বয়স এমন পাঠক), অতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ৩ নভেম্বর কি হয়েছিল এবং ৭ নভেম্বর কি হয়েছিল?

১৫ আগস্ট '৭৫-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সরকারে তো বটেই, আংশিকভাবে সেনাবাহিনীতেও দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিক্রিয়ার এবং অন্যান্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুইজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর একটি সামরিক ক্যু ঘটে যায়। ওই দুইজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরের তৎকালীন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম এবং তৎকালীন ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম। ৩ নভেম্বরের ঘটনার নায়কগণ তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করেন। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘটনা জাসদ সমর্থিত গোপন সেনা সংগঠনসমূহের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত ছিল। এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেন পুনরায় না ঘটে এবং তাদের পরিকল্পনাকে যেন ভেস্তে না দেয়, সে জন্যই জাসদ এবং তাদের সমর্থিত সেনাবাহিনীর ভেতরে গোপন সংগঠনসমূহ ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয় একটি বিপ্লব ঘটানোর জন্যে। ৭ নভেম্বর সংঘটিত বিপ্লবটি ছিল তার পূর্ববর্তী দুই বছর যাবত তাদের মানসপটে লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই যে, তারিখটি হঠাৎ করেই সাব্যস্ত হয়। অনেক লেখালেখি ও বলাবলি হলেও একটি কথা শতকরা ১০০ ভাগ পরিষ্কার এখনও হয়নি। সে কথাটি হল, সফল বিপ্লবের পর জাসদ সেনাবাহিনীর জন্য কোন ধরনের Command Structure পরিকল্পনা করেছিল? এ কথাটি এজন্য বলছি যে, ৭ নভেম্বর সৈনিক বিপ্লব চলার সময় কিছুসংখ্যক সৈনিক স্লোগান দিয়েছিলেন— 'সিপাহী-সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।' বাস্তবে সেদিন বেশ কজন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়। তবে দেশের প্রতি নিয়তি প্রসন্ন ছিল। যার ফলে পুরো সেনাবাহিনী ওই অস্পষ্ট বিপ্লবের ধারণায় আচ্ছন্ন হয়নি। নিষ্কলুষ সৈনিকরা সেনাবাহিনীর Command Structure পেশাদার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী কর্মকর্তাদের হাতে রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সৈনিকরা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এবং তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীর হাল ধরেন। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাংলদেশ সেনাবাহিনী রক্ষা পায়। ওই ৭ নভেম্বরের সকালে নিষ্কলুষ দেশপ্রেমিক সৈনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহস, প্রেরণা ও সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন দেশের বিশেষত ঢাকা মহানগরীর জনগণ। তাই ৭ নভেম্বর চিহ্নিত হয়ে আসছে সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসাবে।

www.nagorikpathagar.org

দুই শতাব্দীর মধ্যবর্তী ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে বাংলাদেশ ও পৃথিবী। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ও আঙ্গিকে বাংলাদেশী সমাজ আজ বহুধাবিভক্ত এবং বিবিধ সংঘাতে লিপ্ত। গত তিন বছর যাবত বহু জ্ঞানীগুণী জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে আসছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, রাজনৈতিক ঐকমত্য বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে প্রায় অসম্ভব। অতএব, ঐকমত্য সৃষ্টির চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। যেসব কারণে রাজনৈতিক পরিমন্ডল বিভক্ত, সে কারণগুলো বিভক্তি রেখার উভয় পাশের রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে আপসের অযোগ্য। তাই ইস্যুভিত্তিক ঐকমত্যই কাম্য হতে পারে। যে বিষয়টিতে ঐকমত্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে আমরা দেশ, জাতি ও শক্তি হিসাবে কোন দিকে যাচ্ছি সেটা নিরূপণ করা বা সংজ্ঞায়িত করা। আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে আমরা অবনতির দিকে যাচ্ছি, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি। '৭১ থেকে ২০০০—এই ৩০ বছর হেলায় নষ্ট করেছি। আগামী ৩০ বছর নষ্ট না করার জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন। এই ঐকমত্য আসতে হবে জনগণের মধ্য থেকে। জনগণের চাপে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যেন সঠিক কর্মপন্থা নেন, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। আগামী নির্বাচনের আগে যদি সঠিক নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য সংসদীয় নির্বাচনটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে না। বিশ্বাসযোগ্যতা না পেলে ফলাফল সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আরও ঘনীভূত হতে পারে। এখন একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সরকার থাকা সত্ত্বেও যখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটা অবনতি এবং জান-মালের এতটা নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান, তখন সেই অস্থায়ী প্রশাসনের আমলে পরিস্থিতির যে কতটা অবনতি হতে পারে সেটা কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর হাতে যত অস্ত্র আছে তার সমপরিমান অস্ত্র যে চরমপন্থী ও গোপন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হাতে ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মাস্তান তথা রাজনৈতিক ক্যাডারদের হাতে নেই, সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? পরিস্থিতির একজন নীরব পর্যবেক্ষক হিসাবে বলতে চাই, সব বেআইনি ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার সশস্ত্র ক্ষমতা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আছে কিনা এটা সন্দেহপূর্ণ। বলতে চাচ্ছিলাম, ২০০১ সালে পুনরায় সিপাহী-জনতার সংহতি প্রয়োজন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি জাতীয় সেনাবাহিনী। জাতির সেবা করাই এর প্রধান কর্তব্য। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের কোন একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। তৎকালীন অবস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ঢাকা সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর সদর দফতরের কনফারেন্স রুমে তিন বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর মুখের কথাগুলো হুবহু এখন আর মনে নেই, কিন্তু স্পিরিট বা

www.nagorikpathagar.org

চেতনা ছিল অনেকটা এরকম। 'আপনারা জনগণের পাশে দাঁড়ান। আপনারা আমার পাশে দাঁড়ান। আপনার আমার হাতকে শক্তিশালী করুন। জাতি আমার ওপর একটি বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আপনাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছাড়া আমার পক্ষে ওই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। আপনারাই জাতীয় সংহতির প্রতীক।' আজকে ২০০০ সালের নভেম্বরের ৭ তারিখে এসে পুনরায় মনে করছি, বস্তুতই আমাদের সেনাবাহিনী জাতীয় সংহতির প্রধান অংশীদার। আগামী নির্বাচনের আগে আবার সেনাবাহিনীর খেদমত প্রয়োজন হবে—এতে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। আর একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন হল যে, সেই সংহতির অভিব্যক্তি বা অভিপ্রকাশ কি হবে এবং কিভাবে হবে? বিদ্যমান প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত থেকে সৈনিকরা জনগণের সঙ্গে কাঁধ মিলানোর জন্য রাস্তায় নামতে পারবে না। আগামী নির্বাচনে জাতীয় সেনাবাহিনী ব্যতিক্রমধর্মী ও অতীতের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা রেখে এই সংহতি প্রকাশ করবে। সেনাবাহিনীকে সেই অবকাশ দেয়ার জন্য আমি বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। সংহতি দিবসে এই হোক কামনা।

দৈনিক যুগান্তর ঃ ৭ নভেম্বর, ২০০০

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ভারত-নির্ভর দায়বদ্ধতার মুক্তি দিবস

সাদেক খান

৭ নভেম্বর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে একটু পিছনের দিকে যেতে হয়। ১৯৭৩ সাল থেকেই বলতে গেলে আমি লন্ডন প্রবাসী। তবে দেশে প্রায়ই আসা-যাওয়া করছি।

'৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম না। তবে তার মাসখানেকের মধ্যেই দেশে ফিরলাম। এরই মধ্যে একটা মুক্ত মানসিকতার স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে শুরু করেছে সারা দেশে। ঢাকা আর চট্টগ্রামে যে দুটো শহরে আমার ঘোরাফিরার অবকাশ হল নিজের কাজ আর বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ-খবর নেবার সুবাধে, দেখলাম সবাই খোলামনে কথা বলছে, অকপটে ভয়-ভাবনা প্রকাশ করছে। তবে রাস্তা-ঘাট তখনো রাতের বেলা তেমন নিরাপদ নয়।

ঢাকায় যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তাদের অধিকাংশ ছিল খেলাঘরে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। মেজর (পরবর্তীকালে) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রতি তাদের অনেকেরই একটা স্বাভাবিক আনুগত্য ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল। তাদেরই একজন তরুণ, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, পঁচাত্তর সালের ৩ নভেম্বর কাকডাকা সকালে এসে আমাকে জাগিয়ে জানাল, খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় এসেছে। মুক্তিযোদ্ধারা আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁর পেছনে রয়েছে।

১৫ আগস্টের বিদ্রোহী মেজররা সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। তাদের কোণঠাসা করে সেনাশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়া হবে। খন্দকার মোশতাক সেনাবাহিনীর কথামতো চলে নামমাত্র ক্ষমতায় থাকতে পারেন পোশাকী রাষ্ট্রপতি হিসেবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর হাতে।

একই সঙ্গে আরো একটা খবর এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আমাকে দিল। সেটা এই যে, সামরিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য এরকম বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ নিতে সম্মত ছিল না বলে এবং প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাককে সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ না করার দায়ে মোশতাক নিযুক্ত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আমার খটকা লাগল। আমি বললাম, সেনাবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজ নেতা, রাজনীতিবিদ আর অরাজনৈতিক মুরব্বি—এদের মধ্যে মতভেদ বা লক্ষ্যের তারতম্য যাই থাক না কেন, জাতি গঠনের তাগিদ আছে সবারই। রাষ্ট্রের এই সঙ্কটের সময় একতরফাভাবে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক উপলব্ধি চাপিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। সবাই মিলে বোঝাপড়া করেই এগুতে হবে। জিয়াউর রহমান শুধু সেনাপ্রধান নন, স্বাধীনতার ঘোষক। মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনীর অফিসার কিংবা জওয়ান, শহুরে নাগরিক কিংবা গ্রামবাসী—যারাই সেই স্বাধীনতার ডাক শুনেছিল, তাদের পরিচিত নাম প্রিয় নাম জিয়াউর রহমান।

তাঁকে আটক করে সেনাশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের কথা বলা ধৃষ্টতা। শেখ মুজিব দেশবাসীর আস্থায় একবার আঘাত হেনেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রুসৈন্যের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে। অনেকেরই মনে ধারণা জন্মেছিল যে, মুক্তিসংগ্রামকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসায় যাবেন শেষ পর্যন্ত, আর ইতোমধ্যে জঙ্গী ছাত্র-যুব সমাজ ধরা পড়ে মার খেয়ে ঠাণ্ডা হবে।

তিনি ভাবতে পারেননি যে, মুক্তিযুদ্ধ দানা বাঁধতে পারবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ দানা বেঁধেছিল। কারণ, সাচ্চা প্রতিরোধের শপথগ্রহণ করেছিল দেশবাসী আর তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলসের দেশপ্রেমিক বেশ কিছু সিপাহী। জিয়াউর রহমানের বেতার ঘোষণায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে জীবনপণ করেছিলেন তারা। সিপাহী-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ-চেতনার সূত্রপাত তখন থেকে।

সেখানে শেখ মুজিবের নাম ভূমিকা ছিল মাত্র, নেতৃত্ব ছিল আক্রমণের মুখে আত্মসমর্পণের গ্লানি-মলিন। মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছিল লক্ষ তরুণ। তাদের দ্বিধা ছিল না। আর সশস্ত্র লড়াই ও প্রতিরোধের শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের আনাচেকানাচে তারা গোপন অবস্থান পাকাপোক্ত করে বিশ্ববাসীর বিবেককে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছিল যে, এ লড়াই চলছে-চলবে। দেশবাসী আত্মসমর্পণ করবে-না।

তাই শুধু প্রতিবেশী দেশ নয়, অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জোরদার রব উঠেছিল। ফরাসি লেখক ও ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধযোদ্ধা আঁদ্রে মালরো ঘোষণা দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সাত মাসের মাথায়, আর বক্তৃতা-বিবৃতি, সেমিনার, লেখালেখি নয়; বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম জোগাতে বিবেকবান বিশ্ব-সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তার সে কথা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও সেদিন ভালভাবে নিতে পারেননি।

কারণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মিত্রশক্তি হিসেবে একটা মনোপলি অভিভাবকত্বের মতলব ছিল তাদের। সেটা পরবর্তীকালে আরো প্রমাণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যাহোক, মুক্তিযুদ্ধের আট মাসের মাথায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একক সহযোগিতায় যৌথ অভিযানের শরীক হিসেবে কার্যত তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসা হল।

বাংলাদেশ সরকার তার নিজ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু নির্ভরতার দায়বদ্ধ হয়ে রইল। শেখ মুজিব ফিরে এলেন। কিন্তু প্রতিবেশী-নির্ভর দায়বদ্ধতা মিটল না।

শেখ মুজিব দ্বিতীয়বার দেশবাসীর আস্থায় আঘাত হানলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় একের-পর-এক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে। তারপর দেশবাসী সকলকেই জিম্মি করে তিনি বলতে গেলে একরকম তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও একদলীয় দুঃশাসনের অবতারণা করলেন। সপরিবারে প্রাণ দিয়ে তাঁকে সেই দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

সেনাবাহিনীর যে গুটি কয়েক অফিসার ঝুঁকি নিয়ে এই ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ঘটিয়েছিল, ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রশ্রয়ে হয়তো-বা তারা হঠকারিতা করছিল। সে জন্য তাদের শাসনের উদ্যোগ অবশ্যই সেনাবাহিনী নিতে পারে। কিন্তু সে জন্য আরেকটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে সেনাপ্রধানকে আটক করে প্রেসিডেন্ট মোশতাককে ঘেরাও করে সেটা হতে পারে না। তাতে আরো বেশি বিশৃঙ্খলা ঘটাই স্বাভাবিক।

আমার মুখে একথা শুনে সেদিন বিমর্ষমুখে ফিরে গিয়েছিল খালেদ-ভক্ত সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু আমার যুক্তিকে সে গ্রহণ করেছিল। একটু বেলা হতে সকাল এগারোটা নাগাদ আমার গাড়ির ড্রাইভার এসে হাজির। সে ছুটিতে গিয়েছিল। তখনি রাজশাহী থেকে ফিরল। সে বলল, খুব সকাল থেকেই জিয়ার আটক হবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। পথে সে দেখেছে, অনেক জওয়ান যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই ঢাকার দিকে আসছে। তারা খুবই উত্তেজিত।

লোক পাঠিয়ে বা টেলিফোনে যোগাযোগ করছে তারা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে তাদের জানাশোনা সিপাহীদের সঙ্গে। খালেদ মোশাররফকে বেঈমান আর ভারতের দালাল বলছে তারা। জিয়াকে আটক রাখতে পারবে না খালেদ, তার এই বিশ্বাস জন্মেছে—বলল আমার গাড়ির ড্রাইভার।

তাকে নিয়ে এখানে-ওখানে বন্ধুগৃহে আর মতিঝিলে কিছু দপ্তরে ঘুরে আমারও বিশ্বাস জন্মালো, খালেদের ক্ষমতালিপ্সা তার কাল হয়ে দাঁড়াবে। ৪ নভেম্বর যে কিছু জয় বাংলা মিছিল বেরুল, তাতে ব্যাপকভাবে মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলানেই খালেদ মোশাররফ এমন দুঃসাহসী বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, অনুগত গুটিকয়েক অফিসার ছাড়া সেনাবাহিনীর মনোভাব জানার কোন চেষ্টা সে করেনি।

ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর সে নির্ভর করেছে। শেখ মুজিবের হত্যার পরেও প্রতিবেশী-নির্ভর দায়বদ্ধতা আমাদের কাটেনি। শক্তিমত্ত প্রতিবেশীর প্রচ্ছন্ন চাল আর

www.nagorikpathagar.org

কারসাজিতে ঘটছে এসব অঘটন। ৬ নভেম্বর নাগাদ বঙ্গভবনে তাদের নীলনক্‌শা আর পদমর্যাদা বৃদ্ধির পোশাকী মহড়া নিয়ে ব্যস্ত খালেদ ও তাঁর সহযোগীরা ছাড়া সারা দেশই জানে, ৩ নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। সিপাহী-জনতা জেগেছে। জিয়াকে মুক্ত করতে তারা চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে।

সিপাহী-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ চেতনার যে জাগৃতি ঘটেছিল ২৬ মার্চ জিয়ার বেতার ঘোষণার মধ্যে, সেটাই দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটাল ৭ নভেম্বর জিয়াকে মুক্ত করে মুক্ত বাংলার নয়া অধ্যায়ের সূচনা করে।

সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান সেদিন কবর রচনা করেছিল প্রতিবেশী-নির্ভর দায়বদ্ধতার। বাংলাদেশের স্বনির্ভর সার্বভৌম সত্তার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিল সেই সিপাহী-জনতার গৌরবোজ্জ্বল ঐক্যজোট।

৭ নভেম্বরের সেটাই তাৎপর্য। আর তাই ৭ নভেম্বরেই সবাই মিলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। কবর খুঁড়ে যারা ভারত-নির্ভর দায়বদ্ধতা আবার দেশবাসীর কাঁধে চাপাতে চাইছে, ইতিহাস তাদেরই কবর তৈরি করছে।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ঃ স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ

উইং কমান্ডার এম হামিদুল্লাহ খান বিপি (অব.)

আজ ৭ নভেম্বর। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বাংলাদেশের ওপর আল্লাহর রিশেষ রহমত নাজিল হয়েছিল। ৭ নভেম্বরের অর্জন সম্পর্কে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণকে জ্ঞানদানের কোন অবকাশ নেই। এদেশ যতদিন টিকে থাকবে ৭ নভেম্বর ততদিন আমাদের কাছে আলোকবর্তিকা হিসেবে পথনির্দেশনা দিয়ে যাবে। সেদিন যে বিপ্লব হয়েছিল গুটিকতক স্বার্থান্বেষী লোকের ব্যক্তিগত প্রাপ্তির আশায় নয়। সেদিন এদেশের সর্বস্তরের জনতা এবং সিপাহী এক হয়ে গিয়েছিল কোন ব্যক্তির জন্য নয় কিংবা কোন ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে নয় বা কোন গোষ্ঠীর স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য নয়। তারা এক হয়েছিল এই জন্যে যে বাংলাদেশের ঈশান কোণে আবির্ভূত হয়েছিল তা এক মহা অশনি সংকেত। যে সিপাহী-জনতা যুদ্ধ করে মাত্র দেশটিকে স্বাধীন করেছে সে স্বাধীনতার ওপর কোন হিংস্র থাবা তারা সইবে কেন? ৭ নভেম্বরের ঘটনাপঞ্জি এবং এর তাৎপর্য এতো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়ে আসছে, বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষ কিছু কলমবাজের এবং স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকের করুণ আহাজারি এবং পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। 'করুণ আহাজারি' কথাটি এজন্যই বললাম, কেননা কিছু কলমজীবী ও বুদ্ধিবিক্রেতা ৭ নভেম্বরকে জাতির মানসপট থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা করছে। এই দিন সিপাহী-জনতা একত্র হয়ে রাস্তায় ন্যায়ের পক্ষে নেমে আসে।

পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও দেশপ্রেমিক সিপাহী-জনতা ৭ নভেম্বর রাস্তায় নেমে আসার ঘটনাটিতেও একটি মিলের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ১৫ আগস্ট '৭৫ থেকে ৩ নভেম্বরের ঘটনা সর্বজনবিদিত। এর তাৎপর্য এবং বিশ্লেষণ প্রতি বছরই হয়ে থাকে। তবে এ সরকারের আমলে লক্ষ্য করছি কিছু আওয়ামী ঘরানার কলমজীবী এই ঘটনার টিস্যু কালচার এবং ট্রান্সপ্লান্ট কালচার করেছেন। তাদের উদ্দেশে বলি, আপনাদের এই গ্রহণযোগ্যতা কতোটুকু! আপনারা যতই ঈসার টুপি মুসার মাথায় আর মুসার টুপি ঈসার মাথায় প্রতিস্থাপনের চেষ্টা প্রচেষ্টা করেন না কেন, ৭ নভেম্বর আপন মহিমায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর। সিপাহী-জনতার অপ্রতিরোধ্য শক্তি জিয়াউর রহমানকে বন্দুকধারী প্রহরীদের কবল থেকে মুক্ত করে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশকে মহাদুর্যোগের প্রান্তসীমা থেকে রক্ষার জন্য মুক্তির কাণ্ডারীর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। জিয়াউর রহমানও মানুষের এই অকৃত্রিম ভালবাসার যোগ্য সম্মান রক্ষা করেছিলেন। আজ অবশ্য দেশবাসী আওয়ামী কল্পকাহিনী রচনাকারীদের মুখরোচক তোয়াজবাজি দেখে হাসবে না কাঁদবে এই দ্বিধায় মুচকি হাসে। ১৯৭২-৭৫ সময়ে দেশের বিভীষিকাময় অবস্থা মুছে ফেলার যে ছেলেমি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা কতই না হাস্যকর!

জাতির জীবন থেকে বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা শুধু গো-মূর্খরাই কল্পনা করতে পারে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে বাংলাদেশের জন্য ৭ নভেম্বরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গত সাড়ে চার বছর ধরে বর্তমান বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন সরকার এবং তার সমর্থনে সংগ্রহ করা দুর্জনদের আপ্রাণ চেষ্টা বাংলাদেশের সিপাহী-জনতার মনে এই দিবসের তাৎপর্য এবং সুফলকে গভীরতর করেছে। বিকৃত মানসিকতার ভেলকিবাজী এই নতুন শতাব্দীতে একটিও সফল হয়নি। সবকিছুকে দলীয়করণ, একদলীয় নির্বাচন, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিতে বিশ্ব রেকর্ডধারী, খুন-ধর্ষণ ও দখলে চ্যাম্পিয়ন এবং খুনীদের পক্ষ হয়ে আদালত ও বিচারকের সমালোচনা ইত্যাদি করে কিভাবে একটি নির্বাচনী খেলা অনুষ্ঠান করা যায়, বর্তমান সরকারের* সেই অপচেষ্টার নীল-নকশা দেশবাসীর কাছে এখন স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে সরকারকে জানাতে চাই অতিসম্প্রতি একই কায়দায় নির্বাচন করে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্লোভাদান মিলোসেভিচ এবং আইভরিকোস্টের প্রেসিডেন্ট জেনারেল গুইয়ের শেষরক্ষা হয়নি এবং শেষের জন সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে পলায়ন করেছে। এই ঘটনা শুধু আমাদের দেশেরই নয়, পৃথিবীর বহু দেশের পত্র-পত্রিকায় সবিস্তারে সচিত্র প্রতিবেদনসহ ছাপা হয়ে ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। এখন শুধু '৭২-৭৫ -এর দুঃশাসন বললেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে যুগ যুগ ধরে '৭২-৭৫ একটি আতঙ্ক ও বিভীষিকার অপর নাম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং থাকবে।

'৭২-৭৫-এর শাসকগোষ্ঠী মানুষের সকল প্রকার অধিকারকে পদদলিত করে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে তৈরি করে এক দলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল। এই শাসন ব্যবস্থার ভিতরেই অঙ্কুরিত হয় তাদের ধ্বংসের বীজ। ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের মানুষ ভুগছিল চরম হতাশায়। আমরা সিপাহী-জনতার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তারা সঠিক

(*১৯৯৬-২০০১; আওয়ামী লীগ সরকার-সম্পাদক।)

www.nagorikpathagar.org

সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশকে দিয়েছিল স্থিতি ও আস্থা, আর দিয়েছিল একজন কালজয়ী নেতা। যেখানে উচিত ছিল এইরূপ পরিস্থিতিতে নির্বাচন দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করে দেশশাসন করা; তা না করে সকল দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দল রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে লুপ্ত করে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য বাকশাল গঠন এবং নির্বাচন ব্যতিরেকেই প্রেসিডেন্টের মেয়াদ আজীবন পাকাপোক্ত করা হয়। সবকিছুই ছিল জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার লক্ষণ মাত্র। এ কথা সকলেই জানে, সকল স্বাভাবিকতা যখন লুপ্ত হয় তখন অস্বাভাবিক পথেই তার পরিবর্তন হয়। যেটি হয়েছেও '৭৫ সালে। কিন্তু সেখানেও তাদের ধ্বংসের বীজ তাদের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল। তাদেরই দলের প্রভাবশালী নেতারা যাদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনার জন্য ভোটের বাক্স পর্যন্ত হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে এসেছিল তারাই ছিল সেদিনের সেই ঘটনার মূল হোতা।

আর নীরব দর্শক ছিল সেনাবাহিনীর প্রধান, বিমানবাহিনীর প্রধান, রক্ষীবাহিনীর প্রধান এবং সর্বোপরি যিনি ৩ নভেম্বরের ঘটনার নায়ক (সিজিএস) যার নির্দেশ ছাড়া কোন অস্ত্র, গোলা ট্যাংক মুভ করে না। তাদের সবাইকে আড়াল করে বর্তমান স্বৈরাচারী আওয়ামী গোষ্ঠী দায়িত্ব এবং ক্ষমতাশূন্য উপ-সেনাপ্রধান জিয়াইর রহমান-এর ওপর সমস্ত দায়ভার চাপাতে জারি গানের ঐকতানে লিপ্ত হয়েছে। তৎকালীন দায়িত্বপালনের ব্যর্থ তথাকথিত নেতৃত্বের অনেকেই এখন আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে জড়িত বা তাদের গোষ্ঠীভুক্ত সুবিধাভোগী। এদের বিরুদ্ধে আওয়ামী ঘরানার কলমবাজদের বা আওয়ামী নেতৃত্বের কোন অভিযোগ নেই। এটাই হচ্ছে আওয়ামী ঘরানার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। ১৫ আগস্টে ঘটনাপ্রবাহের এক পর্যায়ে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ তার অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য আর্মির চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনবার বাহানা করে পাল্টা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। তার এই প্রক্রিয়ায় বরঞ্চ চেইন অব কমান্ড আরো ভেঙে পড়েছিল। তিনি সেনাপ্রধান জিয়াকে ৩ নভেম্বর বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় জিয়ার কোন কিছুই করার ছিল না। ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত দেশ ছিল অন্ধকারে। কারো পক্ষে প্রকৃত ঘটনা বুঝে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। এরই মধ্যে জেলের মধ্যে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। চারজন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়।

অথচ ক্ষমতার লোভে খালেদ মোশাররফ আঁতাতের মাধ্যমে ১৫ আগস্টের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্তদের নির্বিঘ্নে স্ত্রী-পরিবারসহ দেশত্যাগের সব রকমের ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি সেদিন বঙ্গভবন থেকে সেনা-প্রহরা প্রত্যাহার করে নেন। অথচ আজ আওয়ামী কলমজীবী, বুদ্ধিজীবী নামধারীদের কাছে তার সাতখুন মাফ। তিনিই মোশতাককে বাধ্য করেন নিজেকে মেজর জেনারেল পদে নিয়ম ভঙ্গ করে পদোন্নতি দিতে এবং জিয়াকে অপসারণ করে নিজেকে চীফ অব স্টাফ পদে নিয়োগ দান করতে।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুতপক্ষে তিনি একটি ক্যু সংঘটিত করলেন। আওয়ামী কলমবাজরা এই সফল প্রক্রিয়া বৈধ বলেই ধরে নেন। সৌভাগ্যক্রমে খালেদ মোশাররফ যদি জীবিত থাকতেন এবং নিজে সরকার পরিচালনা করতেন তাহলে এই সব সুবিধাভোগী কলমবাজরা কোন্ সংগীতের সুর দিতেন সেটা হয়ত দেশবাসী ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত খালেদ মোশাররফ এখন আর আওয়ামীদের জন্য কোন সমস্যা নয়, তাঁর ভাই আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রী, এবং মুজির হত্যাকালীন সেনা ও বিমান প্রধান এখন তাদের দলের এমপি, উপদেষ্টা এবং মোশতাক মন্ত্রিসভার অনেকেই তাদের দলের বড় বড় নেতা। সুতরাং এদের কোন দোষ নেই যেমনটি দোষ হয় না তাদের দলে রাজাকার থাকলেও। খালেদ মোশাররফ যেহেতু সেনাবাহিনীর অল্পসংখ্যক সদস্যের সমর্থনে এসেছিলেন এবং তার অস্থির আচরণ দেখে অনেকেই যখন সরে পড়েন তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সময় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে, খালেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় বাহিনী এবং 'র'-এর সাহায্য ছাড়া কোন গতি ছিল না। সে কারণেই তখন সর্বত্র ভারতীয় আগ্রাসনের আশংকায় দেশপ্রেমিক সিপাহী এবং জনতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। দেশ অন্ধকার অমানিশার গভীর অতলে ডুবে যাচ্ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে সিপাহী-জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করেছিল এবং সিপাহীরা তাদের প্রধানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে এনেছিল। আওয়ামী কলমজীবী ও বুদ্ধিবিক্রেতাদের জন্য বলতে চাই সেদিন এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ এই বিপ্লবকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল বা ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের পর রাজধানী এবং দেশের অবস্থা কি হয়েছিল তা পুনরায় স্মরণ করার জন্য। তখনকার পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলাতে। সেদিন ইত্তেফাক লিখেছিল, প্রাণবন্যার উচ্ছল নগরী।'

বর্ণনা ছিল এরকম, তখনও আকাশে অন্ধকার ছিল। গোলাগুলীর শব্দে প্রকম্পিত শেষ রজনীর ঢাকা বিনিদ্র রাত্রিতে আতঙ্কিত নগরবাসী হয়ত ভাবছিল, '৭১-এর সেই পাষাণ ঢাকা দিনগুলোর কথা। এমনি সময়ে রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রের ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল শ্লোগান। 'সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ'। উৎকণ্ঠিত নগরবাসীর শ্রবণেন্দ্রিয়ে এই সময়ে রেডিও কি বার্তা শুনাইবে? ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হল ; সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

দৈনিক সংবাদ শিরোনাম দিয়েছিল, "রাজধানীর পথে পথে লাখো জনতার আনন্দ মিছিল। (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) ঃ রাজধানীর ঢাকা গতকাল শুক্রবার ছিল বিজয় উল্লাসের আনন্দে উদ্বেল এক উৎসবমুখর নগরী। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় দুইটায় রেডিও বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ-এর গুরুদায়িত্বভার গ্রহণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের

www.nagorikpathagar.org

মতো রাজপথে নেমে আসে করতালী আর স্লোগানের মুখর স্বতঃস্ফূর্ত লাখো জনতার ঢল আর আনন্দ মিছিল। সে এক অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য। শহরের পথে পথে অলিগলিতে ফুল, মালা আর হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ দিয়ে জনসাধারণ বরণ করে নেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী অকুতোভয় সেনাবাহিনীর সিপাহীদের। আগের দিন গভীর রাত থেকে গতকাল প্রায় সারাদিন ধরে সেনাবহিনী আর জনতা একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে হাতে হাত রেখে সারা শহর প্রকম্পিত করে রাখে গগনবিদারী স্লোগানে। সিপাহী আর জনতার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, মেজর জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ।"

সিপাহী-জনতা সেদিন জিয়ার হাতে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ডুবন্ত প্রায় একটি জাতিকে রক্ষার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল। কেননা তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো মহৎপ্রাণ জিয়াই একমাত্র পরীক্ষিত শেষ ভরসা যার হাতে দেশবাসী নিরাপদ। নির্লোভ নির্মোহ শৃঙ্খলাবোধ অঙ্গিকার বদ্ধ জিয়া সমূহ সুযোগ পুর্ণভাবে পেয়েও বিচারপতি সায়েমকেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রেখে নিজে হয়েছিলেন ডেপুটি সামরিক প্রশাসক। আরো উল্লেখ্য যে, এই সামরিক আইন মোশতাকই ঘোষণা করেছিলেন ২০ আগস্টে যা ১৫ আগস্ট থেকে বলবৎ করেন। মোশতাকের স্থলে বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করেন খালেদ মোশাররফ এবং যে একটি কর্তৃত্বহীন সংসদ ছিল সেটাও বাতিল করা হয় খালেদ মোশাররফের সময় ৬ নভেম্বরে। এমনকি যে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের কথা বলা হয় তাও কিন্তু জারি করেন মোশতাক ২৬ সেপ্টেম্বর। ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর, দেখা যাচ্ছে কোন ঘটনার সাথেই জিয়ার সংশ্লিষ্টতা নেই। জিয়া ছিলেন এদেশের জনগণের কাছে প্রিয় নাম সেই স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকে। যেদিন তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন সেদিনই তিনি বাংলার সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় জয় করে ফেলেছিলেন। তাই যে কোন ক্রান্তিকালে জিয়াই ছিলেন জাতির দিশারী। সিপাহী-জনতা এটা জানত, তাই তাকেই তারা সিপাহী-জনতা বিপ্লবের পর তাদের কাণ্ডারী ভাবেন এবং তাকে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। জিয়া দায়িত্ব নিয়েই বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনেন। তারপর দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার কঠিন কাজ তিনি সফলভাবেই করতে পেরেছিলেন। দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং মানুষের বাক-স্বাধীনতা দিতে পেরেছিলেন। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। মানুষের মধ্যে বিভেদের বেড়াজাল ছিন্ন করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন এবং সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য একই ভূখণ্ডকেন্দ্রিক একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয়তাবাদ দিতে পেরেছিলেন। তিনি জাতিকে দিতে পেরেছিলেন একটি সর্বজনীন আদর্শ এবং একটি কালজয়ী দর্শন। যার ফলশ্রুতি যে কোন অভ্যন্তরীণ

www.nagorikpathagar.org

কিংবা বহির্শক্তির লোলুপ দৃষ্টি থেকে দেশকে চিরজীবী করতে যোগাচ্ছে অফুরাণ শক্তি। এটাও সর্বজনবিধিত যে, জাতীয়তা ভাষাভিত্তিক হয় না এবং হতে পারে না। যদি হতো তাহলে ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আরব ভূখন্ডসহ যে কোন দেশেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা থাকত। জিয়া শুধু যে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি এটাকে শক্তিশালী ভিত্তি দিয়ে কার্যকর করে আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করেছিলেন এবং এটাই ৭ নভেম্বরের মূল অর্জন।

দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য, আদর্শহীন এবং জাতীয় দর্শন বিবর্জিত পদলেহী এই সরকারের* কাছে দেশবাসীর আজ একমাত্র কামনা এদের ত্বরিত অন্তর্ধান এবং চির অন্তর্ধান। এরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং পূর্বেও করেনি। তারা এখনও একদলীয় শাসনের স্বপ্নে বিভোর। তাই এই দিবসের চেতনার কথা শুনলেই তাদের গাত্রদাহ হবে—এটাই স্বাভাবিক। কেননা বিপ্লব ও সংহতি দিবসের যে অন্তর্নিহিত শক্তি স্বাধীনতা-রক্ষায় দেশবাসীর আস্থা অর্জন করেছে তার মোকাবিলা করা বর্তমান স্বৈরাচারীদের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং একদলীয় শাসন বাস্তবায়নের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুঃস্বপ্ন হয়েই থাকবে। এ কারণেই এই দিবসের ওপর কালিমা লেপন এবং একে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জনগণের মন থেকে এর স্মৃতি মুছে ফেলার যে চেষ্টা চলছে তা কখনই এ দেশের জাগ্রত জনতা সফল হতে দেবে না।

জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ বাংলাদেশের মানুষের কাছে এতোই অকৃত্রিম যা শুধু মায়ের কাছে তার শিশুর ভালোবাসার সাথে তুলনা করা চলে। এই ভালোবাসার টানের মধ্যে কোন যদি বা কিন্তু—এর অবকাশ নেই। কোন অপশক্তির কালো থাবার অপছায়াও নেই। বাংলাদেশের মানুষ ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে ধারণ করে রাখবে কারো আদেশ-নির্দেশ অথবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে নয়। এ অঙ্গীকার চির জাগরূক থাকবে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে তথা এদেশের প্রতিটি মানুষের স্বাধিকার সুরক্ষার কবজ হিসাবে; শত্রুকে পরাভূত করার অপরাজেয় শক্তি হিসাবে।

---

*১৯৯৬-২০০১ টার্মের আওয়ামী লীগ সরকার-সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন ৭ নভেম্বরের চেতনায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা

কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর আমি সৈয়দপুর সেনানিবাসে ২৪ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সে সময় এ ব্যাটালিয়নটি মূলত অধুনালুপ্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর হঠাৎ শুনলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেছে এবং তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করেছে। সাথে সাথে এও শুনলাম যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নিজেকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সে সময় সেনাবাহিনীতে তার কিছু অনুগত অফিসার ছিল, যারা তার সাথে একত্রে কাজ করে যাচ্ছিল। এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, অন্যান্য বিভিন্ন পদবীর বীর সৈনিকরা এর সাথে মোটেও সম্পৃক্ত ছিল না ; প্রকৃত বিষয় হচ্ছে শতকরা প্রায় আশি থেকে নব্বই ভাগ অফিসার এ সম্বন্ধে আদৌ জানতই না।

এখানে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জিয়ার অনেক অনুগত অফিসার সেসময় তার বাসার আশেপাশে বসবাস করত। কিন্তু জিয়ার সেই বিপদের দিনে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে তাদের কেউ জিয়াকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি। অথচ এরা অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একাধিক প্রমোশন পেয়েছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং তার অনুগত বাহিনী যদি সফলকাম হত, বাংলাদেশে হয়তো পুনরায় একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম হত। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যারা ৩ নভেম্বরের এই কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারেনি। সেদিন মানুষের প্রত্যাশা ছিল শেখ মুজিবের অনুচরবর্গের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। এর ফলে ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান গৃহবন্দীদশা থেকে মুক্তি পান এবং স্বপদে পুনর্বহাল হন।

এখানে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই, সেই দুর্যোগের দিনে ২য় ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্টের কয়েকজন অফিসার জিয়াকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তাদের সহযোগিতায় সিপাহী-জনতার সম্মিলিত বিপ্লব সাফল্য লাভের পর

www.nagorikpathagar.org

দেশের জনগণ আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছিল। সকলে একবাক্যে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থানকে স্বাগত জানায়। এই উত্থানের ফলে জিয়ার নেতৃত্বে দেশে আইন-শৃংখলার দ্রুত উন্নতি লাভ করে, অর্থনীতির মন্দাভাব কাটিয়ে দেশের অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। সমাজকে অন্যায়-অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিতে সকলে একযোগে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের ফলেই দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৭ নভেম্বরের বিপ্লবের পথ ধরেই একটি তলাবিহীন ঝুড়ি খেতাবপ্রাপ্ত দেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। খাল খনন, গণশিক্ষা প্রবর্তন, বনায়ন, মাছের চাষ, মুরগীর খামার, নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের ফলে কৃষি, শিল্প এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এদেশ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি দিকনির্দেশনা পায়। এরপর থেকেই সাংবাদিকদের পুর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।

৭ নভেম্বরের বিপ্লব পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে জিয়া এবং তার সহযোগীদের সততা, নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে দেশের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ আজ একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হত। কিন্তু দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের কারণে উন্নয়নের ধারা বারবার ব্যাহত হয়েছে এবং হচ্ছে। সৎ এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

বর্তমানে দেশ এক চরম হতাশা এবং অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এ অবস্থা কারো কাম্য নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৭ নভেম্বর এবং তার চেতনাকে মুছে ফেলার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কারণ এরা এই দিনটিকে তাদের পতনের দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অন্যদিকে বিএনপি এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তির কাছে এ দিনটি দেশ এবং দেশের জনগণকে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত করে ইসলামী মূল্যবোধের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আমরা অনেকেই গণতন্ত্রের কথা বলি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গণতন্ত্রের রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। দেশে আইন আছে, কিন্তু আইন মানতে রাজি নই। দেশ এবং দেশের জনগণকে আমরা অনেকে যেন জিম্মি করে রেখেছি। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সৎ নিষ্ঠাবান এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু পঁচিশ বছর পর আমরা দেখছি, রাজনীতি আজ মস্তান এবং দুর্নীতিবাজ কিছু ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ কারছে। তাদের সংখ্যা সমস্ত বাংলাদেশের ত্রিশজনের বেশী নয়। অথচ এই বিশ-ত্রিশজন লোক সমস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা-চট্টগ্রামের মত শহরগুলো আজ সম্পূর্ণভাবে মস্তানদের নিয়ন্ত্রণে। আর এই মস্তানদের নিয়ন্ত্রণ করছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপিরা। দেশের মানুষ আজ অসহায়-নির্বাক। কিছু কিছু মস্তান রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় হাজার হাজার কোটি টাকার চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত। ৭ নভেম্বরের অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ গড়ে তোলা, সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। আজ আমরা এসব সমস্যা সমাধানের কথা দূরে থাকুক, চরম নৈরাজ্য এবং হতাশার মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউ কারো মতের প্রতি এবং ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। রাজনীতিকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে অনেকেই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার একটা অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইলে আমাদেরকে আরও অধিক সহনশীল হতে হবে। সংসদে অশালীন এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে সর্বোপরি এবং সবকিছুর মূলে রয়েছে আগামীতে একটি সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশ এই দুঃসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে। সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে সকলকে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে চলা, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাগুলো বিভিন্ন ফোরামে আলাপ-আলোচনা করে ঐকমত্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া, দেশ এবং দেশের জনগণকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার না করা, আমি এবং একমাত্র আমাকে ছাড়া দেশ চলবে না—এ ধরনের মনোভাব পরিহার করা। মনে রাখতে হবে কারো জন্যই কিছু অপেক্ষা করে না। সময় এবং স্রোত সবকিছু তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ভাল-মন্দ উভয়ের সম্মিলনেই এগিয়ে যায়।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা গেলে আগামীতে শিক্ষিত এবং সৎ, উপযুক্ত ব্যক্তিগণ অধিক সংখ্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। ফলে মাস্তানী ও চাঁদাবাজি কমে যাবে এবং দেশে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসবে। মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হবে। তাদের মতামতের সম্মান থাকবে। বেকার সমস্যার সমাধান হবে। আইন-শৃংখলার দ্রুত উন্নতি হবে। মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নিজের কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করতে পারবে। প্রত্যেকটি সরকারী, আধাসরকারী অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন আদৌ সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এজন্য নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতিকে ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করার জন্য আমূল পরিবর্তন করতে হবে। নির্বাচনে এক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ সরকারী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্বাচনে যৌথভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং যৌথভাবে তাদের ওপর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৭ নভেম্বর বিপ্লবের মূল লক্ষ্যই ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করা, তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং নিজকে দুর্নীতি, মাস্তানী ও অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সাল থেকে আমরা আবার বাকশালীদের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। মানুষ আজ এদের হাত থেকে মুক্তি চায়। আমি বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় এদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর কেন ?

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

৭ নভেম্বরকে গণমানুষ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বলে আখ্যায়িত করে। এ কথার মধ্যেই এ দিনটির তাৎপর্য নিহিত আছে। প্রথমে দেখা যাক জাতীয় বিপ্লব দিবস কেন বলা হয়। আমরা জানি ১৯৭১ সালে এ দেশে সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। ওই যুদ্ধে ভারত সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় জনগণ আমাদের বিপুলভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। তাই তাদের প্রতি আমাদের খানিকটা দায়বদ্ধতা ছিল। কিন্তু জনগণ পাকিস্তানের মুঠো থেকে বেরিয়ে আর কারো জালে আটকাতে প্রস্তুত ছিল না। তারা চেয়েছিল সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু সে সময় যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলেন তারা এ ব্যাপারটি সঠিকভাবে বুঝতে না-পেরে আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে কারণে-অকারণে আরো বেশি করে ধরা দিতে লাগলেন। প্রথমে হলো ভারত-বাংলা ২৫ বছর চুক্তি—যা নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। এদিকে পানি বন্টনের চুক্তি না-করে ফারাক্কা বাঁধ চালু করতে দেয়া হলো। সেই যে চালূ হলো আর তো বন্ধ হয় না। আমরা নিজেদের জালে আটকিয়ে গেলাম। বেরুবাড়ী ভারতকে দেয়া হলো বিনিময়ে কিছুই পেলাম না আমরা। অসম বাণিজ্য চুক্তি হলো। চোরাচালানির ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হতে থাকল। ৭ নভেম্বর মানুষ যে বিদ্রোহ করলো তা এসবেরই প্রতিক্রিয়া। এ বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা চাইলো একজন ব্যক্তি, যিনি স্বাধীনতার ঘোষক, সৎ দেশপ্রেমিক ও সাহসী তার ওপর আস্থা রাখতে যাতে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সত্যিকার অর্থে রক্ষিত হয়। এ অর্থেই এই জাতীয় বিপ্লব। এটি এ দিনের প্রধান তাৎপর্য।

এবারে সংহতির কথায় আসি। সেদিন যে বিপ্লব ঘটলো তার পেছনে ছিল সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্য আর আম-জনতা। আবার একটু পেছন ফিরে দেখতে হয়। একটি দেশের সেনাবাহিনী সে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। খুব সম্ভবত একমাত্র কোস্টারিকা আর সুইজারল্যান্ড ছাড়া এমন কোনো দেশ নেই যার সেনাবাহিনী নেই। তা যতই কেননা ছোট হোক। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী স্বাধীনতা-উত্তর শাসকদের ভ্রান্তনীতির ফলে বিভক্ত হয়ে পড়ে অথচ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর। দেখা গেল স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা সদস্যরা

www.nagorikpathagar.org

অপরেব থেকে আলাদা একটি গ্রুপ– পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগতরা আর এক গোষ্ঠী। তার ওপরে আবার ছিল রক্ষীবাহিনী। একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছিলেন তারা। এরকম যখন অবস্থা তখন ঘটলো ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট ক্যু-দেতা যার ফলে আওয়ামী লীগের একটি প্রভাবশালী অংশ ক্ষমতারোহণ করলেন। আড়াই মাস পরে সংঘটিত হলো আর একটি পাল্টা ক্যু। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বরের এ ক্যু নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। তাদের মনে সন্দেহ জাগে আরো এ কারণে যে ওই সময়ে কয়েকদিন ধরে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। উপরন্তু বিভিন্ন ঘটনাদৃষ্টে এমন মনে হচ্ছিল যে খালেদ মোশাররফের ক্যু-দেতা আমাদের প্রতিবেশীদের প্ররোচনায় সংঘটিত হয়েছিল। অন্তত জনমনে এরূপ ধারণাই দানা বাঁধছিল। এসব ঘটনা পরম্পরার ফলে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে যা দেশের জন্য খুবই অমঙ্গলের বার্তাবহ ছিল। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয় সাধারণ জনগণও। সেনাসদস্য এবং জনগণের এ সংহতি যেমন সেনাবাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে তেমনি অপরদিকে তাদের এ ঐক্য দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বহীন আর নির্দিষ্ট ছকহীন স্বতঃস্ফূর্ত-বিপ্লব তাই সত্যিকার অর্থে ছিল একটি জাতীয় বিপ্লব আর জাতীয় সংহতির প্রকাশ।

৭ নভেম্বরের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সব সংস্কার সাধিত হয় তার ফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এর একটি দিক জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রায়ণ।

বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের খানিকটা পেছন ফিরে তাকাতে হবে। গণতন্ত্রের অভিধা ব্যাপক। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য যথোপযুক্ত ছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার যে এ সংবিধান খুশি মনে গ্রহণ করেছিল তা মনে হয় না। কারণ দেখা গেল, সংবিধান গৃহীত হওয়ার অল্প কিছুদিন পর থেকেই সরকার এমন সব ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করল যে, তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল। এখানে এর বিস্তৃত আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না তবুও মানবাধিকার খর্ব করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করা এবং গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধী একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। জিয়াউর রহমান এসবের অনেক কিছু পুনরায় সংশোধন করে জনগণকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ আমরা উল্লেখ করব।

'৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর শেখ মুজিবের শাসনামলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার দ্বারা সংবিধানে বর্ণিত জনগণকে প্রদত্ত ১৮টি অধিকারের মধ্যে ১২টি মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান '৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর স্থগিত মৌলিক অধিকারসমূহ পুনরুজ্জীবিত করেন। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে

www.nagorikpathagar.org

মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৭৬-এর ২৮ মে জিয়াউর রহমান হাইকোর্টের সেই ক্ষমতাকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করেন। ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট/ হাইকোর্ট-এর মাননীয় বিচারপতিদের নিয়োগ, অপসারণ এবং চাকরিবিধি এমনভাবে পুনঃনির্ধারিত হয় যে, বিচার বিভাগ প্রকৃতপক্ষে তার স্বাধীনতা হারায়, যা গণতন্ত্রের মূলনীতি-বিরোধী। জিয়াউর রহমান বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, ১৯৭২-এর সংবিধানে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে বিচারপতিদের নিয়োগদান করার যে বিধি ছিল ৪র্থ সংশোধনীতে তা উড়িয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জিয়াউর রহমান প্রধান বিচারপতির সাথে অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের মাধ্যমে নিয়োগদানের রীতি প্রচলিত করেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের চাকরির সমাপ্তি ঘটানোর যে প্রক্রিয়া মূল সংবিধানে বর্ণিত ছিল প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা তা বিলোপ করে স্বহস্তে সমুদয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এইভাবেই সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর, বলা যেতে পারে আজ্ঞাবহ করার পদ্ধতি চালু করেন।

জিয়াউর রহমান গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরদিনই মাননীয় বিচারপতিদের চাকরি থেকে অপসারণের কর্তৃত্ব নিজ হাতে না রেখে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুই জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত করেন।

নিম্ন আদালতের পূর্বের ৪র্থ সংশোধনী এবং অন্যান্য আইনের বলে যে ক্ষমতা হরণ করা হয়েছিল জিয়াউর রহমান তাও পুনর্বার পরিবর্তন করে নিম্ন আদালতের স্বাধীনতা অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেন। একথাও সকলের জানা যে, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমান দেশে একদলীয় তথা বাকশালী শাসন পদ্ধতি চালু করেন।

জিয়াউর রহমান যেদিন সিপাহী-জনতার বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রমঞ্চে আগমন করেন তার পরদিনই অর্থাৎ ৭ নভেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম তা রহিত করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, জিয়াউর রহমানের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সেদিন তা সম্ভব হতো না। প্রকৃতপক্ষেই প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করার জন্য পার্লামেন্টে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা বহুদলীয় ভিত্তিতেই, একদলীয় বাকশালী পদ্ধতির আওতায় নয়।

আর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৪র্থ সংশোধনী দ্বারা পার্লামেন্টে পাস হওয়া কোনো বিলে সম্মতি দান না-করার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাও জিয়াউর রহমান '৭৮ সালে রহিত করেন।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ আমলে কি মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে, কি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, কি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গণতন্ত্র বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর সেগুলো পুনরায় গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল।

১৯৭৫-এর সিপাহী বিপ্লবের এটি আর এক তাৎপর্য। ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে নির্বিঘ্নে উপনীত হওয়া যায় যে, জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রমঞ্চে আবির্ভাব না হলে দেশ বাকশালী শাসনের নিগড়ে বাঁধা থাকত।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এর পরবর্তী পর্যায়ে যে শাসন ব্যবস্থা চালু হয় তার ফলে আইন-শৃঙ্খলার প্রভূত উন্নতি হয়। অর্থনীতির অবনতি রোধ হয় এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলনের ফলে জনগণের মনে শান্তি ফিরে আসে।

ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভ করার ফলে জিয়াউর রহমান বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নে সমর্থন হন। তার আমলেই দেখা গেল ; বাংলাদেশ ওআইসির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আল কুদস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অবশ্য জিয়াউর রহমানের প্রধান অবদান সার্ক গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। যদিও কোনো কোনো সদস্যের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে সার্কের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি কিন্তু তবুও এর অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে আঞ্চলিক রাজনীতির পর্যবেক্ষক মহল একমত।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার অন্যতম প্রধান কীর্তি ১৯৭৭ সালে সম্পাদিত ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি। এখানে এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ কম। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে, এ চুক্তি দ্বারা বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়েছিল। এ সবই ৭ নভেম্বরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল।

সব কিছুর বিচারে এ কথা বলা যায় যে, আমাদের জাতীয় জীবনে ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ। এ দিনটি তাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল।

প্রতিহিংসাপরায়ণ আওয়ামী সরকার এদিনের ছুটি তো বাতিল করেছিলই, উপরন্তু দিনটিকে সৈনিক-হত্যা দিবস হিসেবে অভিহিত করে একদিকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছে, অন্যদিকে জনগণের দৃষ্টিতেও ঐ দিনের সেনা-অভ্যুত্থানের তাৎপর্যকে মলিন করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ এমন অপচেষ্টা সফল হতে দিবে না বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আজকের দিনে এ প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়েই আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে।

www.nagorikpathagar.org

কেন ঘটেছিল বিপ্লব

মহিউদ্দিন খান মোহন

দীর্ঘ দুই যুগ অতিক্রান্ত হবার পর ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, ছড়ানো হচ্ছে নানান বিভ্রান্তি। একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সূচনালগ্ন এ দিবস সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে। অবশ্য ওই মহলটি শুরু থেকেই ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে আসছে এবং এ দিনটিকে তারা তাদের পরাজয়ের দিন মনে করে থাকে। আধিপত্যবাদী শক্তির তল্পিবাহকরা মনে করে ৭ নভেম্বরের চেতনায় বাংলাদেশীরা উদ্দীপ্ত হলে তাদের জারিজুরি যেমন ফাঁস হয়ে যাবে, তেমনি তাদের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তও হবে নস্যাৎ।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ঘটে থাকে পৃথিবীতে। বিশেষত আধুনিক বিশ্বে যেসব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার সবগুলো পেছনে রয়েছে যুক্তিসংগত প্রেক্ষাপট। ঐতিহাসিক পটভূমিতে সূচনা হয় বিপ্লবের। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এদেশে সিপাহী-জনতার যে বিপ্লব হয়েছিল, তার পেছনেও ছিল এক বিশাল প্রেক্ষাপট, ছিল প্রয়োজনীয় পটভূমি। সুতরাং ৭ নভেম্বরকে বুঝতে হলে সেই প্রেক্ষাপটকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। '৭৫-এর ৭ নভেম্বর কেন ঘটেছিল বিপ্লব, কেন স্থাপিত হয়েছিল সিপাহী-জনতার সংহতি, তার কারণ অনুসন্ধান করলেই নভেম্বর বিপ্লবের অপরিহার্যতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হবে। মূলত একটি দেশবিরোধী চক্রান্তকে প্রতিহত করতে গিয়েই এ দিবসের জন্ম। সে চক্রান্ত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিনাশের। সে চক্রান্ত ছিল বাংলাদেশকে আধিপত্যবাদী শক্তির নিগড়ে চিরতরে আবদ্ধ করার। সে চক্রান্তকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ৭ নভেম্বর। আর এ জন্যই ওই মহলটির এ দিবস সম্পর্কে 'এলার্জি' রয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল এ জন্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই একটি মহল ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। আধিপত্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট ওই মহলটি চূড়ান্ত আঘাত হানে ৩ নভেম্বর। তারা খন্দকার মোশতাক সরকারকে বরখাস্ত করে এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

বাসভবনে অন্তরীণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে একটি প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করা। তারা চেয়েছিল বাংলাদেশে আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিভূ একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। ওই মহলটির সাথে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের যোগসাজশ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে সময় সংঘটিত ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণে এ তথ্যের সত্যতা মিলবে।

বস্তুতঃ '৭৫-এ নভেম্বর বিপ্লব কেন এবং কোন প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছিল সে কথা বুঝতে হলে ওই সময়ের ঘটনাবলী ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হবার পর তারই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হন। যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তার সদস্যবৃন্দও সবাই ছিলেন বাকশালের সদস্য। খোন্দকার মোশতাক নিজের পথকে পরিস্কার রাখতে বাকশালের কতিপয় শীর্ষ নেতা ও মুজিব মন্ত্রিসভার সদস্যকে কারান্তরীণ করেন। সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনিক পদেও পরিবর্তন আনা হয়।

খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতাকে সংহত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও ভিতরে ভিতরে একটি গ্রুপ পাল্টা একটি কিছু করার ফন্দি আঁটতে থাকে। সেনাবাহিনীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ জড়িয়ে পড়ে এর সাথে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ওই মহলটির শীর্ষ ব্যক্তিতে পরিণত হন। অবশেষে ৩ নভেম্বর তারা চূড়ান্ত আঘাত হানে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশররফ ক্ষমতা দখল করে নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান ঘোষণা করে এবং সেনাবাহীনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়। তাঁকে তাঁর বাসভবনে বন্দী করে রাখা হয়।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে দেশপ্রেমিক জনতা ও সেনা-সদস্যরা মেনে নিতে পারেনি। সে সময় একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত হচ্ছিল। আগস্ট অভ্যুত্থান ও ৩ নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কদের মধ্যে চলছিল টাগ অব ওয়ার। উভয়পক্ষ ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে উভয়কে মোকাবিলার। ওই সময় একটি খবর রটে যায় যে, খালেদ মোশাররফ ভারতীয় বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরে আহ্বান জানাতে পারেন কিংবা জানিয়েছেন। দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে সেটা অসম্ভব কোনো ব্যাপারও ছিল না। মুজিব আমলের ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির শর্ত মোতাবেক সে ধরনের সুযোগও বিদ্যমান ছিল। ফলে দেশবাসী এবং সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা সংকিত হয়ে পড়েন দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে। একটা কিছু করতে হবে—এ ভাবনা সবার মনে জোরেশোরে কাজ করতে থাকে। খন্দকার মোশতাক তখন প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন এবং পরিবর্তে বিচারপতি এ এম সায়েম হয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

www.nagorikpathagar.org

এ সময় সেনাবাহিনীর ভেতরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে একটি সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। এ সংগঠনের মাধ্যমে সাধারণ সৈনিকদের বিপ্লবের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। জাসদের সাথে সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহের এদের নেতৃত্ব দেন। কর্নেল তাহের অন্য এক দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। অপরদিকে সাধারণ সৈনিকরা ভারতীয় চর হিসেবে পরিচিত খালেদ মোশাররফের কবল থেকে সেনাবাহিনী ও দেশকে মুক্ত করার জন্য কর্নেল তাহেরের ডাকে সাড়া দেন। ভেতরে ভেতরে সৈনিকরা সংগঠিত হতে শুরু করে।

নভেম্বর বিপ্লবের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কর্নেল তাহের কিংবা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সাধারণ সৈনিকদের একাংশকে উত্তেজিত করলেও সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানই ছিলেন সাধারণ সৈনিকদের কাছে মুক্তির প্রতীক। তেমনিভাবে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানে হতাশ দেশবাসী ও জিয়াউর রহমানকে ততো দিনে তাদের মুক্তির দূত হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। এর প্রধানতম কারণ হল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। দেশ ও জাতির সংকটময় মুহূর্তে তাই জিয়াউর রহমানের কথাই সবার স্মরণ হয়েছে। আর সে জন্যই ৭ নভেম্বর যখন সিপাহী-জনতার বিপ্লব সম্পন্ন হয়, তখন রাজপথের আনন্দ মিছিলে শ্লোগান ওঠে জিয়ার নামে।

যদি ৭ নভেম্বর বিপ্লব সফল না হতো, তাহলে দেশের অবস্থা কি হতো, তা কল্পনাও করা যায় না। ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সফল না হলে দেশে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল প্রায় একশ' ভাগ। আর সে সুযোগে আধিপত্যবাদী শক্তির বাংলাদেশ দখলের সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। যদি সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, তাহলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যে বিপন্ন হতো তাতে সন্দেহ নেই তিলমাত্রও। আজ কোনো কোনো মহল ৭ নভেম্বরের মধ্যে 'বিপ্লব' ও 'সংহতি' নাকি খুঁজে পান না। তারা এ মহান দিনকে তথাকথিত সৈনিক হত্যা দিবস হিসেবেও প্রচারের ধৃষ্টতা দেখান। '৭৫ সালে এই মহলটি যে দেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার মানসে ৩ নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে মদদ যুগিয়েছিল এখন আর তা অস্পষ্ট নেই। তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীর ছুটি বাতিল করেছিল। এই বাতিলকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা গোষ্ঠীটি নিজেদের অবস্থানকেই পরিষ্কার করে দিয়েছে। সে অবস্থান যে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ৭ নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি সর্বস্তরের জনগণ তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল এবং এই সমর্থনই তাদের ওই সফল বিপ্লবের অংশীদার করে তুলেছিল। সেদিন রাজপথে জনতার মিছিলের ঢল, ধাবমান ট্যাংকের কামানের নলে উৎফুল্ল জনতার 'মালা' পরানো, চলন্ত ট্যাংক ও সেনাবাহিনীর গাড়িতে নৃত্যরত জনগণের ছবিই প্রমাণ করে ৭ নভেম্বরের বিপ্লবকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেছিল। জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনির গগনবিদারী উচ্চারণের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

সৈনিকদের সফল বিপ্লবের সাথে জনগণের সংহতি প্রকাশ—মুহূর্তে সুস্পষ্ট করে দেয় বিপ্লবের প্রকৃতি। বঙ্গভবন আর সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলী হয়ে যায় জনগণের বিপ্লবের অংশ। সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত একটি প্রক্রিয়ার প্রতি দেশবাসীর এই সর্বাত্মক সমর্থনই ৭ নভেম্বরকে করেছে মহিমান্বিত। আর দেশ ও জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই যে জনগণ সেদিন সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে মিছিল করেছে, আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়েছে সেটা এখন ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য।

বস্তুত এভাবেই সেদিন সংঘটিত হয়েছিল সিপাহী জনতার বিপ্লব। স্থাপিত হয়েছিল সংহতি। আধিপত্যবাদী শক্তির এদেশীয় এজেন্টদের সকল চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দিয়ে ৭ নভেম্বর এদেশ ও দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছিল নবচেতনায়, যে চেতনায় এ জাতি ১৯৭১-এ নেমেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে।

অবশ্য একথা সত্যি যে, আধিপত্যবাদী শক্তির এদেশীয় তল্পীবাহকের কাছে ৭ নভেম্বরের চেতনা বিষবৎ মনে হবারই কথা। কারণ এ দিবসটি সৃষ্টি হওয়ায় তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে। আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হয়ে বাংলাদেশের জনগণকে দাসানুদাস বানাবার যে মতলব তারা এঁটেছিল ৭ নভেম্বর তাদের সে বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। আর তাই ১৯৯৬-এ রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে প্রথমেই তারা আঘাত হেনেছিল এ মহান দিবসের ওপর। কুৎসা আর অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে নিরন্তর। বিনষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে ৭ নভেম্বরের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি।

কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বিফলে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ যে ৭ নভেম্বরের চেতনা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত ১ অক্টোবরের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র সুরক্ষা এবং সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে দেশবাসী আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে নভেম্বর বিপ্লবের উত্তরাধিকার বিএনপি এবং এর নেতৃত্বাধীন জোটকে। পাঁচ বছর অনবরত অপপ্রচার চালিয়েও যে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি তারা, এটা তারই প্রমাণ। নতুন সরকার পুনরায় ৭ নভেম্বর সরকারি ছুটি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের এ ঘোষণা দেশপ্রেমিক জনগণকে আপ্লুত করেছে। পাঁচ বছর পর আবার এ মহন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে সারাদেশে—এ আনন্দে জাতি আজ উদ্বেল।

মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে ৭ নভেম্বরের পুনরায় স্বমর্যাদায় ফিরে আসার ঘটনা প্রমাণ করে, জোর করে বা শক্তি দিয়ে ইতিহাসের গতি রুদ্ধ করা যায় না। যে প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক একই প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সারাদেশে ঘটে গেছে নীরব ব্যালট বিপ্লব। আধিপত্যবাদী শক্তির দোষরদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিপ্লব যুগে যুগে ঘটতেই থাকবে ; যতদিন না এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব শংকামুক্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

অবিস্মরণীয় সাতই নভেম্বর

সমদর্শী

আজ ৭ নভেম্বর—আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এই দিনটি একদিকে যেমন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে যে স্বর্ণ সূর্যের উদয় ঘটেছিল তা কেবল অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের অন্ধকারই দূর করেনি, জাতির চলার পথও করেছে আলোকিত। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যে কুটিল ষড়যন্ত্র চলছিল, দেশের সর্বস্তরের মানুষ সম্মিলিতভাবে তাঁর মূলোচ্ছেদ করে। এদেশবাসীর জাতিসত্তা নিয়ে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছিল, তা ছিন্নভিন্ন করে নিজেদের জাতীয় পরিচিতি তুলে ধরে বলিষ্ঠভাবে। আমাদের দেশ বাংলাদেশ, আমাদের জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ—এই বুলন্দ আওয়াজে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র জগত। মত ও পথ এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হয় এবং তাদের জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ ঘোষণা করে বজ্রনির্ঘোষে। ৭ নভেম্বর তাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সফল সংগ্রামের প্রতীকই নয় শুধু অটুট জাতীয় ঐক্য, নিখাদ দেশপ্রেম ও জাতীয় অনুপ্রেরণার উৎসও। ৭ নভেম্বরে দেশ ভেতরে ও বাইরের ষড়যন্ত্রকারীদের অভিশপ্ত গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এদিন জাতির নবজন্ম ঘটেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না একটুও।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতিই ৭ নভেম্বর মর্মবাণী। ৭ নভেম্বরে জাতি যে বিপ্লব সাধন করে, তার মুখ্য ব্যাপার ছিল বাংলাদেশী জনগণের স্বাধীন চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ। কোন দ্বিধা নয়, কোন দ্বন্দ নয়—এদেশের সর্বস্তরের মানুষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে তারা স্বাধীনসত্তার অধিকারী জাতি। স্বতন্ত্র তাদের জাতীয় লক্ষ্য ও স্বার্থ। জাতির এই আত্ম-উপলব্ধিই ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের বড় অবদান।

সাতই নভেম্বরের বিপ্লবে দৃঢ়তর হয়েছে জাতীয় সংহতি; দেশবাসী কেবল একাট্টা হয়ে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি, জাতীয় অগ্রগতি সাধনের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাবারও দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে। প্রায় আট কোটি মানুষ একটি শক্তিরূপে পর্বতের মত দৃঢ়তা নিয়ে অশুভ চক্রের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

এদেশের মানুষ স্বভাব-সংগ্রামী ও স্বাধীনচেতা; স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জীবনদানেও যে তারা কুণ্ঠিত নয়, ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে তার বহু দৃষ্টান্ত। পরবশ্যতা তারা কোনদিনই বরদাশত করে না। পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে ফেলার জন্য তারা সংগ্রাম করেছে যুগ যুগ ধরে এবং হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে কালে কালে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার জন্যে বিরাট মূল্য দিয়েছে আমাদের জনগণ। অগণিত শহীদের প্রাণ, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের নজিরবিহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার বুকে ছোবল মারার জন্য যখন উদ্যত হয়েছিল কালনাগিনীরা, আমাদের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে যখন লিপ্ত হয়েছিল একটি স্বার্থবান ও বিভ্রান্ত চক্র তখন বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মত গর্জে উঠেছিল এদেশের স্বাধীনচেতা মানুষ, বজ্রপাতের প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়েছিল তাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ। তাতে মিসমার হয়ে যায় অশুভ শক্তি, ছিন্নভিন্ন হয় ষড়যন্ত্রের জাল। রাহুমুক্ত হয় আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব।

এদেশবাসীর দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ সংহতি এবং স্বতন্ত্রসত্তার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে ৭ নভেম্বর। সেই পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে সগৌরবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মাধ্যমে তারা অক্ষুণ্ন রেখেছে রাষ্ট্রীয় সত্তা, বাড়িয়েছে জাতীয় মর্যাদা। এই সাফল্য তাদের সামনে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তও। জাতির নিঃসংশয় প্রত্যয় জন্মেছে যে, তার ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে কোন অশুভ শক্তি, সে যত বড়ই হোক, টিকতে পারবে না।

চক্রান্তকারীদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধই জাতীয় নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। জাতির সংহতি যত বেশি সুদৃঢ় হবে, জাতির সংঘবদ্ধ শক্তি যত বেশি প্রবল হবে, তত বেশি সুনিশ্চিত হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কঠিন স্বাধীনতা রক্ষা করা; আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলি ছলেবলে কৌশলে ছোট ছোট দেশের স্বাধীনতা গ্রাসের অপচেষ্টা চালায়। তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার কিংবা নিজেদের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেবার অর্থ লেজুড়বৃত্তি বা তাঁবেদারী। স্বাধীনতার প্রশ্নে এদেশের মানুষ যে কোনরকম আপোষ করতে প্রস্তুত নয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম তা বার বার স্পষ্ট করে তুলেছে। ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে জোরদার হয়ে উঠেছে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। কিন্তু তাতেও সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। অতন্দ্র প্রহরাই স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান শর্ত। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে, জাতীয় সংহতির মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়াল।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে একটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সক্রিয়। এদেশের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ গরীব। তারা গায়ের রক্ত পানি করে ফসল ফলায় এবং কল-কারখানার চাকা ঘুরিয়ে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় মূলত তাদেরই মেহনতের ফসল কিন্তু যুগ যুগ ধরে তারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত। তাদের ক্ষুধার অন্ন, পরনের কাপড়, ব্যধির চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নেই আশানুরূপ। স্বাধীন দেশে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে, তাই প্রত্যাশিত। তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অগ্রগতি। অর্থনৈতিক মুক্তি ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য আমাদের উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে।

সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। এর জন্য যত বেশি সম্ভব ফসল ফলাতে হবে, বাড়াতে হবে কল-কারখানায় উৎপাদন। আমাদের সম্পদ ও জনশক্তি যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা গেলে বঞ্চিত অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি অত্যাবশ্যক। প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীতে দেশোন্নয়ন—বিশেষ করে গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্রতী হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। জনগণই যে তাদের ভাগ্যনির্মাতা এই সচেতনতা তাদের মধ্যেও জেগেছে আজ। তারা বুঝেছে মানুষের দুটি হাত তার বড় সম্বল, এই দুই হাত দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে। দেশবাসীর এই আত্মোপলব্ধি ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের সংঘবদ্ধ শ্রমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে সার্থক করে তুলতে হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপরই অনেকখানি নির্ভরশীল।

আজ ৭ নভেম্বর—আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এই দিনে জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য যেমন জাতিকে শপথ নিতে হবে, তেমনি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত কর্মোদ্যোগের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার শপথই নিতে হবে আমাদের আজ ৭ নভেম্বরে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের চেতনায় ৭ নবেম্বর

আখতার উল আলম

আমাদের চেতনায় ৭ নভেম্বর ভাস্বর। কারণ ৭ নভেম্বরের চেতনা আর আমাদের দেশজ ও আদর্শিক চেতনা অভিন্ন। এই চেতনার জন্ম একদিনে হয়নি। এ চেতনা কখনো দানা বেঁধেছে দেশকে কেন্দ্র করে আবার কখনো দানা বেঁধেছে আদর্শকে কেন্দ্র করে। আমরা জানি, মানুষ মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ মাটিকে আকড়ে থাকে না। মাটিতে পা রেখে সে মাথা তুলে দাঁড়ায়—মাথা উচু করে দাঁড়ায়। সেই মানুষই আগুয়ান যার অভিযান আসমানে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলে গেছেন, যে প্রাণীর মেরুদণ্ডমাটির যত কাছাকাছি, যত বেশি সমান্তরালে, তার বোধ-বুদ্ধিচেতনা তত বেশি নিম্নমানের। পক্ষান্তরে যে প্রাণী তার মেরুদণ্ডকে যত বেশি সোজা করতে ও যত বেশি খাড়া করতে পেরেছে তার চেতনা-মেধা-মগজ-প্রজ্ঞা ও প্রতিভা তত বেশী মহীয়ান ও গরিয়ান হয়েছে।

দেশজ চেতনা সুতরাং মানুষের জন্য মাটির সমান্তরাল হওয়া কিংবা মাটিতে শুইয়ে পড়া নয়। পক্ষান্তরে আদর্শিক চেতনার অর্থও নয়-মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কিংবা—উন্মার্গগামী হয়ে ইউটোপীয়ার আশমানে বিচরণ করা। ৭ নভেম্বরের চেতনা কিংবা আমাদের চেতনায় ৭ নভেম্বর বলতে আমি যা বুঝি, তা এর আগে জাতিসত্তার পরিচিতি নামক এক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলাম। তাতে যা বলেছিলাম , আজো সে কথাই বলতে চাই। যেমন— বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র কিছুদিন পরের কথা। কলকাতার খ্যাতিমান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং এখানকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আলোচনা সভা ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি সেখানকার দেশ পত্রিকায় বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতার ওপরে একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের একস্থানে অন্নদাশঙ্কর রায় যা বলেছিলেন তার মূল বক্তব্যটা ছিল এ রকম ঃ পাকিস্তানিরা মনে করেছিল বাংলাদেশের লোকজন শুধুই বাঙালী সুতরাং তাদের যেভাবেই হোক মুসলমানিত্ব শেখাতে হবে। পাকিস্তানি বানাতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আমরা, মানে ভারতীয়রা (এবং বাংলাদেশে যারা

www.nagorikpathagar.org

আমাদের অনুসারী ও অনুকারী মহল) মনে করতে শুরু করেছি যে বাংলাদেশের জনগণ শুধু মুসলমান, সুতরাং যে করেই হোক তাদের বাঙালী বানাতে হবে।

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ওই প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা যেমন জোর করে মুসলমানীত্ব শেখাতে গিয়ে ভুল করেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশের মানুষকে জোর করে বাঙালী বানাতে যারা কোমর বেঁধেছেন তাঁরাও ভুল করেছেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে যে ভুলটি ধরা পড়েছিল আজ এতদিন পরেও আমরা সে ভুলটা ধরতে পারছি না— ভুল করেই যেন সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলেছি। তাদের একদল এখানো মনে করেন বাংলাদেশের মানুষ বাঙালী, সুতরাং যে করেই হোক তাদের মুসলমান বানাতে হবে নইলে এদেশে মুসলমানীত্ব বা ইসলাম থাকবে না। অন্যেরা মনে করছেন, বাংলাদেশের মানুষ স্রেফ মুসলমান, সুতরাং যে কোনো মূল্যে তাদের বাঙালী বানাতে হবে, নইলে বাঙালী হিসেবে আমাদের জাতিসত্তা বিলুপ্ত হবে।

এই দ্বিবিধ মানসিকতা হতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে দুটি ভিন্নমুখী ধারা, দুটি পৃথক ধারার মনুষ্যসৃষ্টি আলোড়ন। এ আলোড়ন যে কোনো আন্দোলন নয়, তা আলোড়ন সুষ্টিকারীরা যেমন তেমনি বাইরের অনেকেও বুঝতে পারছেন না। সেই সঙ্গে আরো একটি ব্যপার তারা বুঝতে পারেন না কিংবা ইচ্ছা করেই বুঝতে চান না যে, যে-বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এই আলোড়ন বা আন্দোলন তাদের সত্তার গভীরে দেশ চেতনা যেমন জীবন্ত, তেমনি আদর্শিক চেতনাও চির জাগরুক। একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই।

দেশজ চেতনা ও আদর্শিক চেতনা

দেশজ চেতনা তথা দেশগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত পরিচয়বোধ এবং আদর্শিক চেতনা তথা ধর্মগত, দর্শনগত ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্রিক উপলব্ধি কি একই সঙ্গে কোনো মানুষের মধ্যে এবং ব্যাপকার্থে কোনো জাতির মধ্যে দানা বাঁধতে পারে? পন্ডিত হ্যান্স কোহেল তার জাতি ও জাতীয়তাবোধ সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা পুস্তকে নানা প্রমাণ উদাহরণ উল্লেখ করে বলেছেন—পারে। শুধু তাই নয়, তার অভিমত আধুনিক যুগের জাতীয়তাবাদ মূলত এই ধরনের আপাত-বিরোধী অথচ পরস্পর-অচ্ছেদ্য চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। তবে এ বিষয়ে পন্ডিতদের গবেষণার দ্বারস্থ না হয়েও এদেশেরই দু'একটা জানা-অজানা ঘটনা তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরো বেশি পরিষ্কার হবে বলে মনে করি।

প্রথম ঘটনাটা সবার জানা। মরহুম আবুল মনসুর আহমদ গেছেন স্যার পিসি রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কথা উঠল শেরে বাংলা ফজলুল হককে নিয়ে। কথায় কথায় আবুল

www.nagorikpathagar.org

মনসুর আহমদ শেরে বাংলার ভূমিকার কিছু কিছু অসঙ্গতির কথা তুলে ধরলেন। বলতে চাইলেন, শেরে বাংলাকে কখনো দেখা যায় কট্টর মুসলমান হিসেবে আবার কখনো দেখা যায় কট্টর বাঙালী হিসেবে। পিসি রায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আবুল মনসুর, তোমার মূল্যায়ন সঠিক নয়। ফজলুল হক পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বাঙালী, আবার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত মুসলমান। বাংলার জাতিসত্তার এমন প্রতীক আর কোথাও খুঁজে পাবে না। তাকে তোমরা ভুল বুঝো না। তাঁকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করো না। ঘটনাটা মরহুম আবুল মনসুর আহমদ একাধিক প্রবন্ধে, পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করে গেছেন। আমি এখানে, তাঁর মুখে যেভাবে শুনেছিলাম, সেইভাবেই তুলে ধরলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটা অনেকের অজানা। দৈনিক ইত্তেফাকের জেনারেল সেকশনে খোন্দকার আব্দুর রব নামে এক ভদ্রলোক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন পরহেজগার মানুষ। জীবনের শেষ দিগুলোতে তিনি প্রায়ই অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করতেন। কথা প্রসঙ্গে একবার কাগমারী কনফারেন্স নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ইয়া বড় এক নেতা (নামটা উহ্য থাক) ইত্তেফাক অফিসে এসে এডিটর সাহেবের (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) সঙ্গে বেশ রাগারাগি করলেন। এডিটর সাহেবও কম যান না। হাত গোটাগুটির অবস্থা। শেষপর্যন্ত এডিটর সাহেব তাঁর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, কাগমারী কনফারেন্স নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চের মুসাফির কলামে যা লিখেছি, সেটাই এদেশের সাধারণ মানুষের মনের কথা। এদেশের মানুষকে আমি কিছুটা হলেও বুঝি। স্বাধীনতার পেছনে একটা দর্শন থাকে (রাজনৈতিক নেতাকে লক্ষ্য করে) চিরকাল তো লাঠিবাজি করে গেলে—এসব তুমি বুঝবে না। দেখ মিয়া, যাই করো একটা কথা মনে রেখ, এদেশের মানুষ ঈমান নিয়ে বাঁচতে চায় ও ঈমান নিয়ে মরতে চায়। এর বিরুদ্ধে যেও না, গেলে মারা পড়বে। শেরে বাংলার মত নেতাও এই ভুল করেছিলেন। পরে সে ভুল শুধরেও নিয়েছেন। সে কারণেই তিনি হক সাহেব হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তোমরাও ভুল শোধরাও। এমন কিছু করো না যাতে ঈমান নিয়ে টানাটানি পড়ে।

পরে ওই নেতা রব সাহেবের কাছে একান্তে জানতে চেয়েছিলেন, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কি কারো কাছ থেকে কোন ইনাম নিয়ে কাগমারী কনফারেন্স সম্পর্কে এই লেখাগুলো লিখেছিলেন। রব সাহেব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখেন মিয়া এডিটর সাহেবকে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশি চিনি। নিজে ইনাম খেয়ে বেড়ান বলে সবাইকে নিজের মত ইনামখোর ভাবেন , তাই না ? ব্যাপারটা ইনামের নয়, ঈমানের। আমাদের এডিটর সাহেব বলেন, "পাকিস্তান হওয়ার আগেও এদেশের মানুষ ঈমানকেই বড় করে দেখেছে পাকিস্তান যদি না থাকে, তাহলেও এদেশের মানুষ ঈমান নিয়েই বেঁচে

www.nagorikpathagar.org

থাকবে। ইনামের লোভে এ দেশের মানুষ কখনো ঈমান নষ্ট করবে না। —সে ইনাম পিন্ডির হোক বা দিল্লীর হোক।"

তৃতীয় ঘটনা অনেকের অজানা নয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্যারিটির (ফিফটি ঃ ফিফটি) বিরুদ্ধে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ ক্ষুব্ধ। প্যারিটি নীতি প্রবর্তন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানীদের একতরফা পূর্ব পাকিস্তান শোষণের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটাই তাদের ক্ষুব্ধতার কারণ। এই সময় জানা গেল মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্যারিটির বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানী কিছু নেতা খুশি হয়ে মওলানা সাহেবকে করাচি নিয়ে গেলেন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বললেন, হ্যাঁ, আমি শহীদ সাহেবের প্যারিটি মানি না। কেন মানব ? আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজোরিটি। আমি চাই, মেজোরিটির হিস্যা সংখাগরিষ্ঠের হক—ন্যয্য পাওনা। সেখানে ফিফটি-ফিফটি কেন ?

মরহুম মাওলানার মুখে যেভাবে শুনেছিলাম, আমি সেভাবেই এখানে বর্ণনা করলাম। প্রকাশ, সেবারে মাওলানা সাহেবকে নিজের পকেটের টাকা খরচ করেই ঢাকায় ফিরতে হয়েছিল। পাকিস্তানি নেতা তাঁর সঙ্গে আর দেখা পর্যন্ত করেননি। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের বহু ঘটনাই অনেকের মনে পড়তে পারে। পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ভারতে থেকে যাওয়ার কথা—তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা। সেই সোহরাওয়ার্দী আবার পাকিস্তানে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এদেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে কথাও এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে না পড়ে পারবে না। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে মরহুম মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সংগ্রামী ভূমিকার কথাও বাদ দেয়ার উপায় নেই।

জাতিসত্তার পরিচয়

এদেশের মানুষ মাত্রই একই সঙ্গে দেশজ চেতনার ধারক এবং আদর্শিক ভাবধারার বাহক। উপরের যেসব নেতার কথা উল্লেখ করলাম, তাঁরা প্রয়োজনে এভাবেই এদেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। এ বিষয়ে জনসাধারণের যেমন কোনো ভুল হয়নি তেমনি নেতৃবর্গও কোনো ভুল করেননি বরং ভুল করে গেছেন এবং করে চলেছেন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বলে কথিত মহলের কিছুসংখ্যক লোক। কেউ জেনে-শুনেই আবার কেউ বা না-জেনেই না-বুঝেই। সেই একই ধারায় ইনামের লোভে আরো কেউ কেউ ঈমান নষ্ট করার-ঈমান নষ্ট করে দেয়ার ফিকির যে নেই—তাও বলা চলে না। এদের অনেকের কাছে ব্যাপারটা নিছক রাজনীতি।

www.nagorikpathagar.org

এরা ভুলে যান, রাজনীতি হচ্ছে একটা জাতির চালিকাচক্র—অগ্রগতির পদশক্তি। কিন্তু সে জাতির প্রাণসত্তা ও মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে তার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

জাতিসত্তার এই পরিচয় সম্পর্কেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও এক শ্রেণীর রাজনৈতিক বারে বারেই ভুল করছেন এবং সেই ভুলটাই চাপিয়ে দিতে চাইছেন গোটা জাতির ঘাড়ে। সেই ভুলটা আর কিছুই নয়—কখনো তাঁরা কেউ এই জাতিটাকে শুধুই মুসলমান বানাতে চাইছেন, আবার কখনো বানাতে চাইছেন শুধু বাঙালী। এই ভুল শোধরাবার সময় এসেছে।

একই ধারায় আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াসও কোনো কোনো মহলের তরফ থেকে লক্ষণীয়ভাবে প্রকট। যেমন অনেকে অনেক সময় হয় কোনো মতলবে, নয় স্রেফ কৌতূহল বশেই প্রশ্ন তোলেন, আমরা বাঙালী না মুসলমান? বাঙালী মুসলমান অথবা বাঙালী হিন্দু। আবার হিন্দু হলে, আগে বাঙালী নাকি আগে হিন্দু। অথবা আগে মুসলমান না আগে বাঙালী? এই একই ধারার, ভুল থেকে দেশজ ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। পানি ঘোলা করে প্রয়াস চলেছে ফায়দা লুটবার। এভাবেই প্রচেষ্টা চলে মূল সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ডাইভার্ট করার। এই ফায়দা লুটবার কসরত আরো প্রকটভাবে ধরা পড়ে যখন দেখি, দেশ ও জাতির একশ একটা সমস্যা ও সংকট বাদ দিয়ে ঘুরে ফিরে এ ধরনেরই বাতিল প্রশ্নের জের টানা হয়—জের টেনে এ জাতিকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করার প্রয়াস চলে। যেমন—ভাষার প্রশ্নে বলা হয়, শুধু বাংলা ভাষা নাকি বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষা? আরবি এখানে থাকবে কি থাকবে না? প্রয়াত না মরহুম? পানি না জল? মাংস না গোশ্‌ত? একই ধারার আরো। যেমন—গোলটুপি না কিশতি টুপি? আটরশি না মাইজভাণ্ডারী? সুন্নত পাবন্দী না দেওবন্দী? এক কথা, হেন খুচরা চালাকি নেই—যা দিয়ে এই মতলববাজ মহল এ জাতিটাকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস না পাচ্ছে? আধুনিক বিশ্বে আমরা যদি জাতি হিসেবে টিকে থাকতে চাই, তাহলে এই বিভ্রান্তির ঘোর কাটাতেই হবে। যে কোনো মূল্যে মতলববাজদের এহেন খুচরা চলাকির জের মেটাতেই হবে। বুঝে নিতে হবে, দেশ হিসেবে আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড়।

বাংলাদেশী [illegible]

জাতিসত্তার পরিচয়ের বিভ্রান্তি কাটাতে হবে আমাদের অবশ্যই। জাতির পরিচয় সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বলে জাতিসত্তার পরিচয় সংকটের যে বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কথিত আছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারা পদ্ধতিতে তার সমাধান খুঁজে নিতে হবে। অন্য কোন ধারা পদ্ধতির অনুসরণ এখানে সমস্যাকে বরং জটিল করে

www.nagorikpathagar.org

তুলবে। বাঙালী না হিন্দু। বাঙালী না মুসলমান—এরকম প্রশ্নের জবাবে আমি ইতিপূর্বে একাধিকাবার মরহুম আবুল হাশিম ও মরহুম আবুল মনসুর আহমদের কথোপকথন তুলে ধরে বলেছিলাম, "বলুন তো আপনি বাপের সন্তান না মায়ের সন্তান ? যে কেউ যেমন একই সঙ্গে মায়ের ও বাপের সন্তান হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা নামে পরিচয় লাভ করে এই ব্যাপারটিও ঠিক তেমনি। তাছাড়া কোন ব্যক্তির আলাদা নাম-পরিচয় কি তার মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের কারণ হয় ? না কারণ হতে পারে ?"

বস্তুত এদেশের যে কোনো মানুষ—একই সঙ্গে বাঙালী হয়েও যেমন হিন্দু হতে বা হিন্দু থাকতে পারেন তেমনি যে, অনুরূপভাবে এদেশের বাংলাভাষী বৌদ্ধ কিংবা খৃস্টানদেরও নাম পরিচয়ের বেলাতেই গড়বড় ঘটবার কোন কারণ দেখি না। ভিন্ন- ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বা সমষ্টির ভিন্নতর ভূমিকা সামগ্রিকভাবে যে চরিত্রকে নির্দেশ করছে সেটাই জাতিসত্তার পরিচয়। এর কোনোটাই ধর্মান্ধতা নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়, নয় ধর্মহীনতাও। এদিকে আবার এদেশেই রয়েছে প্রায় দেড় ডজন উপজাতীয়—যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি শুধু ভিন্নই নয়, তাঁরা আলাদা। সব মিলিয়েই আমরা এবং আমরা সবাই অবশ্যই দেশ ও জাতিকে যেমন স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তাসহ অখন্ড রাখতে চাই, তেমনি হাল আমলে নেশন স্টেটের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত এই বাংলাদেশের সকল মানুষের সামগ্রিক জাতিসত্তাকে অবশ্যই একটি একক ও অভিভাজ্য পরিচয়ে চিহ্নিত ও পরিচিত করতে চাই। এখানে ভাষাগত, ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত, পরিচয়ের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেও দেশগত অভিন্ন পরিচয়ের ঐক্য সবার উপরে মাথা উঁচু করে থাকবে। কোনো মতলববাজ মহলের খুচরা কোনো চালাকির অবকাশ এখানে হবে না—বরং জাতিসত্তার মূল স্রোতের ধারা প্রবাহের খুচরা চালাকিজাত (উপরে বর্ণিত) সকল অবান্তর প্রশ্ন ভেসে যাবে। এখানেই জাতিসত্তার পরিচিতি হিসেবে বাংলাদেশী শব্দটা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে ঃ বাংলাদেশী জাতীয়তার গোড়ার কথা এটাই এবং এটাই বাংলাদেশের কালচারের মূল বুনিয়াদ।

উপসংহার

এই সঙ্গে বাবা-মায়ের সন্তান হয়েও কোনো ব্যক্তি নাম পরিচয় যেমন তার মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নতার পরিচায়ক না হয়ে বরং অচ্ছেদ্য সম্পর্কের পরিচায়ক হয়, তেমনি আমাদের এই দেশগত পরিচয়টাও একই সঙ্গে আমাদের ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত—সব পরিচয়েরই অভিন্ন স্মারক হবে—হতে বাধ্য। আমাদের জাতিসত্তার এ দেশগত পরিচিতি-ন্যাশনাল আইডেন্টিটি যতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে মেনে নেয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে একেক মহল এই দেশবাসীকে একেকভাবে বিভ্রান্ত করতে চাইবেন। ইতিহাস সাক্ষী, সেই পাঠান আমলেই এদেশেই একজন স্বাধীন

www.nagorikpathagar.org

সুলতান হাজী ইলিয়াস শাহ্ 'বাঙালী' এই উপাধি গ্রহণ করে 'বাঙালী' এই টার্মটিকে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করে গেছেন। এই ইতিহাস উল্টানোর অধিকার কারো নেই।

আসলে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ের অর্জিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ যে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সীমানায় চিহ্নিত ও পরিচিত হয়ে রয়েছে এটাই অনেকের মর্মপীড়ার কারণ। সে কারণে এই সীমানা চৌহদ্দি ঘেরা জাতিসত্তার অখন্ড বাংলাদেশী পরিচয় ভুলাবার বা ঘুচাবার প্রয়াস- প্রচেষ্টা ঘরে-বাইরে সমভাবে বিদ্যমান। ভারতীয় প্রচারণায় মুগ্ধ হয়ে যেদিন সিংহল তার দেশজ নাম পরিচয় বাদ দিয়ে ভারতীয় পৌরাণিক শ্রীলংকা নাম গ্রহণ করল এবং ইংরেজিকে সরকারি ভাষা থেকে খারিজ করে দিল—সেদিনই তাদের তথাকথিত তামিল সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেই যে পন্ডিতেরা বলে গেছেন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ভৌগোলিক আগ্রাসনের পূর্বশর্ত-শ্রীলংকা তার সর্বাধুনিক প্রমাণ। ৭ নভেম্বরের চেতনা যতদিন এই জাতির মর্মমূলে জীবন্ত হয়ে থাকবে, ততদিন কেউ বাংলাদেশকে সিকিম বা শ্রীলংকা বানাতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর

আনোয়ার জাহিদ

২৭ মার্চ, ১৯৭১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ২)

১০ এপ্রিল, ১৯৭১। মুজিবনগর ঘোষণা প্রকাশিত ও অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা – ৪)

১১ এপ্রিল, ১৯৭১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকারের নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৮)

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাক বাহিনীর এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানী বা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্য কোন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তার সরকারের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে যুদ্ধের অবসান হলো। জেনারেল অরোরার কাছে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসনের অবসান ঘটে। অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ তথা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। যেমন ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান হয়েছিল। আর বৃটিশ শাসনের অবসানের সাথে-সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে নবসৃষ্ট ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল। আর বৃটিশ সরকারই সরাসরি ভারত ও পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। কারণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যই উপমহাদেশের জনগণ সেদিন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর-পরই জেনারেল অরোরা 'সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের' জন্য একজন সামরিক গভর্নর নিয়োগ করলেন। জেনারেল জগৎ সিং সামরিক গভর্নরের দায়িত্ব পেলেন। সরকারের সকল মন্ত্রণালয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সকল জেলায় একজন করে, ভারতীয় কর্মকর্তা উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হলেন। ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে ঢাকায় আনা হয়েছিল সম্ভবত ২৫ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরাজিত পাকিস্তানের হাত থেকে হস্তান্তরিত রাষ্ট্রক্ষমতা কাদের কাছে ছিল? প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাঁর সরকার যদি প্রকৃত ক্ষমতা পেয়ে থাকেন তবে কারা তাকে সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকেই প্রশ্নটি আছে এবং একটি বিভাজন রেখাও টেনে দিয়েছে।

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভারতে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশের মাটিতে পা রেখেই তিনি বলেছিলেন, একটি পুতুল সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন। 'মুক্তিযুদ্ধের' চেতনা এই শব্দটি দু'টি দেশে বহুল ব্যবহৃত। যাঁরা এ শব্দ দু'টি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বদা ব্যবহার করেন তাঁরা দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে তারই মানদণ্ডে বিচার করতে চান। আমরাও চাই। চেতনাকে নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্যে রূপ দেয়া গেলেই কেবল তাকে বিচারের মানদন্ড হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" চেতনা বলি, লক্ষ্য বলি অথবা আদর্শ বলি সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে তার একটি নির্দিষ্ট রূপ পাওয়া যায়। আর তা হলো ঃ

১। জাতীয় স্বাধীনতা,

২। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা,

৩। জনকল্যাণকর জাতীয় অর্থনীতি।

'৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে '৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পূর্বপর্যন্ত এই চেতনা, লক্ষ্য বা আদর্শের কি পরিণতি হয়েছিল তার সাক্ষী আমাদের ইতিহাস।

'৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ থেকে সম্পদ ভারতে-পাচার শুরু হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত হাজার-হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ও

www.nagorikpathagar.org

সমর সম্ভার ট্রাক বোঝাই করে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে যেতে শুরু করে। আমাদের কলকারখানা থেকে মেশিনপত্র খুলে পাচার করা হতে থাকে। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা তার প্রতিবাদ করেন। এই নির্লজ্জ লুটপাট প্রতিরোধ করতে চাওয়ার অপরাধে মেজর জলিলকে কারারুদ্ধ হতে হয়।

'৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। সে দিনই কুখ্যাত ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সই করেন। দশটি ধারা সম্বলিত এই চুক্তির ১ নং ধারায় বলা হয়েছিল—চুক্তিভুক্ত দেশ দুটি কেউ কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার জন্য 'বঙ্গসেনাদের' পোষা এই চুক্তির প্রতি ভারতের একান্ত 'নিষ্ঠার' পরিচয়। চুক্তিটির ৪ নং থেকে ১০ ধারা আরো প্রাসঙ্গিক। এই ধারাগুলো পররাষ্ট্র নীতি, প্রতিরক্ষা নীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণে বাংলাদেশের অধিকার দিল্লীর নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলে। যে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের অধিকার অন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন তাকে কি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলা যায়? '৭৪ সালে গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের কোন স্থায়ী চুক্তি না করেই তদানীন্তন সরকার ফারাক্কা বাঁধ চালু করার অনুমতি ভারতকে দিয়েছিলেন। আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে সেদিনের ভারত-সেবার নীতি কি বিষময় হয়ে দেখা দিয়েছে তা সবারই জানা। পানি এখন দিল্লীর হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র হয়েছে। '৭২ – '৭৩ সালে বাংলাদেশ কয়েকটি বিদেশী কোম্পানীর সাথে আমাদের উপসাগরীয় এলাকায় তেল অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি করেছিল। কোম্পানীগুলো বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে অনুসন্ধান কাজ চালাবার আয়োজন যখন করছে তখন একদিন ভারতীয় নৌবাহিনী এসে তাদের সব স্থাপনা ভেঙেচুরে ফেলে। কোম্পানীগুলো পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। সেদিনের সরকার তার প্রতিকার তো দূরে থাক প্রতিবাদও করতে পারেননি। তখন আমাদের কতটুকু স্বাধীনতা ছিল? সেদিনের সরকার কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন? সেটাই গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সেটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সরকার পরিবর্তন ও গঠনের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের। 'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশী তাকে দেবো" একথাটি শেখ হাসিনা প্রায়ই বলেন। হ্যাঁ যেখানে মানুষ নিঃশঙ্ক মনে এ অধিকার প্রয়োগের অধিকার ভোগ করেন সেটা গণতান্ত্রিক সমাজ। ভিন্ন মত পোষণ এবং প্রকাশের জন্য নাৎসী জার্মানীর মত যেখানে মানুষকে প্রাণ হারাতে হয় না সেটা গণতান্ত্রিক সমাজ। যেখানে সরকার প্রধান বলেন, 'আপনার মত আমি সমর্থন না করলেও আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমি রক্ষা করবো' সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। '৭২ থেকে '৭৫ সালের বাংলাদেশ কি এমন ছিল ? '৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে অনেক ভালো কথা ছিল। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

সেসব ভালো কথা যদি সে সংবিধানের প্রণেতারা বাস্তবে প্রয়োগ করতে দিতেন তবে তা গণতন্ত্র চর্চার একটি মর্যাদাবান দলিল হতে পারত। ভালো কথা যখন বাস্তবে কাজে লাগানো হয় না তখন তাকে আপত্য বাক্য বলে। '৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর নির্বাচন হয়েছিল। ভোট গোনাই সম্ভব হয়নি। ব্যালট বাক্স লুট হয়ে গিয়েছিল।'৭৩ সালে সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। অনেক নির্বাচনী এলাকায় বিরোধী দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন পত্রই দাখিল করতে পারেননি। বিরোধী দলের বিজয়ী প্রার্থীকেও পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য হেলিকপ্টারে করে ব্যালট বাক্স ঢাকায় আনা হয়েছিল।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা নয়, ভিন্ন মতাবলম্বীদের গণতান্ত্রিক সহনশীলতা প্রদর্শন নয়, রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের নির্মূল করাই ছিল সেদিন রাষ্ট্রীয় নীতি। আর সে কাজে দলীয় পেটুয়া বাহিনীগুলোকে যথেষ্ট মনে হয়নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলের অধীনে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। ৩৭,০০০ মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে বর্বর হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হয়েছিল। সিরাজ সিকদার তাঁদের একজন। সিরাজ সিকদারের পিতা-মাতা বা নিহত দেশপ্রেমিকদের আত্মীয়-স্বজনরা বিচারের দাবী তুলতেও পারেননি। দেশ জুড়ে সন্ত্রাস এমন বীভৎস আকার ধারণ করেছিল যে. নির্মল সেনকে লিখতে হয়েছিল. "স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই"। যে লক্ষাধিক রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তারা নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আরেক নাম ফ্যাসিবাদ। '৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত তবু সংবিধানের পাতায় গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা ছিল। সেদিন ছলনার শেষ নির্মোকটাও খুলে ফেলা হয়েছিল। নিজেদের প্রণীত সংবিধানকে ব্যবচ্ছেদ করে দেশের উপর, দেশবাসীর উপর এক দলীয় স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেয় হয়েছিল। সংবিধানের পাতায় যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো ছিল সেগুলোও নিহত হল। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হল। মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা হল। সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হল। আদালতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল। যে সমাজে এমনটি ঘটে তা কি গণতান্ত্রিক সমাজ ? যে রাষ্ট্র এমনটি করে তা কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ? '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লীর লোকসভায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, উপমহাদেশে আজ এক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হল। এই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারতের অর্থনীতি পরিপূরক। আমাদের অর্থনীতি এবং ভারতের অর্থনীতি সেদিন পরিপূরক ছিল না। আজও নয়। কিন্তু ম্যাজিকের মত আমাদের সীমান্ত খুলে গেল। আমরা পেতে থাকলাম "উলঙ্গ বাহার" শাড়ী। আর যেতে থাকলো পাট, ধান, চাল, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র। জাল টাকায় আমাদের দেশ ছেয়ে গেল। আমাদের পাটকলগুলো

www.nagorikpathagar.org

বন্ধ হতে শুরু করল। আর পশ্চিম বাংলায় বন্ধ পাটকলগুলো কেবল চালুই হল না, এক রকম নতুন-নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হল। আমাদের পাটজাত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে মার খেতে শুরু করল। আর ভারতের পাটজাত পণ্য পেলো রমরমা বাজার। পরিণতিতে দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষায়, আমাদের অর্থনীতি ফোকলা হয়ে গেল। মাথায় সোনার মুকুট চড়িয়ে এদেশে যখন কেউ বিয়ে করছিলেন, ঠিক সেই সময় দুর্ভিক্ষের অভিশাপগ্রস্ত মানুষ ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্টের জন্য কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করেছে। না-খেয়ে মরা মানুষের লাশ শিয়াল আর শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। সুন্দরতর জীবনের স্বপ্নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার আকাঙ্ক্ষার এ-কি মর্মান্তিক মৃত্যু। স্বাধীনতার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য জনকল্যাণকর অর্থনীতির জন্য বাংলাদেশের সকল মানুষ সেদিন এই নারকীয় পরিস্থিতি এবং এই বিবেকহীন দুঃশাসন থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিত্রাণ এবং পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পথ সেদিন খোলা ছিল না। পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। ১৫ আগস্ট তাই এসেছিল অমোঘ নিয়তির মত। জনগণের ইচ্ছাই সেদিন প্রতিফলিত হয়েছিল। সে পরিবর্তনের পিছনে ছিল সমগ্র জনগণের সম্মতি। ১৫ আগস্ট ঢাকায় শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল আর তাদের যারা ক্ষমতায় বসিয়েছিলেনে সেই দিল্লীশ্বর বা দিল্লীশ্বরীরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁদের সাজানো পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে এটা তাদের হিসাবের মধ্যে ছিল না। '৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত যে ভূমিকা পালন করেছিল তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য সহায়ক ছিল। তার জন্য তাদের প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা তা প্রকাশে আমাদের কোন কুণ্ঠা নেই। কিন্তু একটা বাস্তবতা মনে রাখা ভালো ভারতের সমর্থন কি বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে নীতিগত সমর্থন, না তাদের ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, আবেগহীনভাবে তা বিচার-বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ভারত কি কোন দেশের কোন জাতির অত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে ? ভিয়েতনাম সামরিক বলে কম্বোডিয়া দখল করেছিল। কম্বোডিয়ার জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল দেশ কম্বোডিয়ার জনগণের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত কম্বোডিয়ার জনগণের পক্ষে দাঁড়ায়নি ভিয়েতনামকে সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করেছিল। সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ভারত আফগান জনগণকে নয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করেছিল। একটি পুরানো প্রবাদ হল, আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও। ভারতের অভ্যন্তরে অনেকগুলো জাতি এখন তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করছে। ১৯৭১ সালে যেমন আমরা

www.nagorikpathagar.org

করেছিলাম। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের জনগণ তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চান। ভারত সামরিক শক্তি দিয়ে তাদের সংগ্রাম নস্যাৎ করতে চায়। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে পাকিস্তান করতে চেয়েছিল। এ-কি কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রমাণ দেয় ? ভারত ১৫ আগস্টের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গেই ৩ নভেম্বর এসে পড়ে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশ সেদিন ১৫ আগস্টের সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বঙ্গভবনেও পৌছেছিলেন। খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং আদর্শগত অবস্থান কি ছিল ? সারাদেশের মানুষ সেদিন এই কথাটি জানার জন্য উৎসুক ছিলেন। ৩ নভেম্বর সারাদিন গেল খালেদ মোশাররফ কোন কথা বল্লেন না। সেদিন রেডিও বাংলাদেশ বন্ধ ছিল। খালেদ মোশাররফের ক্যু'র প্রথম কাজটি ছিল 'সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা। জেনারেল জিয়াকে বন্দী করা এবং তার নীরবতা সাধারণ মানুষকে সন্দিহান করে তুলছিল। জেনারেল জিয়ার দেশপ্রেম সম্পর্কে এদেশের মানুষের মনে কোন সংশয় ছিল না। আর তাই যারা তাকে বন্দী করেছে তাদের সম্পর্কে সন্দিহান হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। ৩ নভেম্বর বিকাল চারটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বটতলায় প্রায় ৫০০ লোকের জনসভা। সেখানে উপস্থিত প্রায় সকলেই চেনামুখ। মুহুর্মুহু জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান। একের পর এক বক্তা বক্তৃতা করছেন। তাদের দাবী ১৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাতে হবে। বঙ্গবন্ধু নেই, সৈয়দ নজরুল ইসলাম নেই তো কি হল। স্পীকার আব্দুল মালেক উকিলকে প্রেসিডেন্ট বানানো হোক। জনসভা শেষে মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা এবং বাকশাল সদস্য ভ্রাতা রাশেদ মোশাররফ। হাতে শেখ মুজিবের ছবি। খালেদ মোশাররফ নিজে কিছু তখন বলেননি। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে দেশবাসীর সকল সন্দেহ ও সংশয় নিমিষেই কেটে গেল। বাংলাদেশের মানুষ কোন ছলে দেশকে আবার বাকশালী দুঃশাসনে ফিরিয়ে নেবার পক্ষে যে নয় —৭ নভেম্বর তারই বজ্র নির্মোঘ অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

১৫ আগস্টের ঘটনার পিছনে নিশ্চয় পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের নায়ক সাধারণ মানুষ আর সাধারণ সৈনিক। বন্দী জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে তারাই তাঁকে জাতির নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। তারাই সেদিন নতুন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিঘোষিত করেছিলেন। ৩ নভেম্বরে পুতুল

www.nagorikpathagar.org

সরকারের পুনরুত্থানের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৭ নভেম্বরের অবদানগুলো কি?

১। বাংলাদেশে আরেকবার আরেকটি পুতুল সরকার বসিয়ে দেবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়া।

২। জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করা।

৩। একদলীয় স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বাক, ব্যক্তি ও সংগঠন গড়ার অধিকারসহ সকল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণকে ফিরিয়ে দেয়া।

৫। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা এবং প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করা।

এগুলো ৭ নভেম্বরের রাজনৈতিক অবদান। ৭ নভেম্বরের আরেকটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে তা হল আদর্শগত। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশী জনগণের জাতীয়তাবাদের আদর্শগত ভিত্তি এবং প্রধান উপকরণ ৭ নভেম্বর এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চিহ্নিত করেছেন এবং আমাদের সংবিধানে স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদাবান থাকাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রধান গ্যারান্টি। এই সঠিক উপলব্ধি থেকেই প্রেসিডেন্ট জিয়া সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এই আয়াত সন্নিবেশিত এবং সংবিধানের ৮ (১ক) ধারায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি—এই নীতি প্রতিস্থাপন করেছিলেন। ৭ নভেম্বর তাই বাংলাদেশের জনগণের এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর গর্ব।

www.nagorikpathagar.org

চেতনায় ৭ নভেম্বর ও শহীদ জিয়া

সুশীল তরফদার

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার চেতনায় উদ্দীপ্ত একটি দিন ৭ নভেম্বর। এদেশের মানুষের চেতনাকে শানিত করার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এদিন বিশৃঙ্খল ও কাণ্ডারীহীন জাতি অন্ধকার থেকে ফিরে এসেছিল আলোয়। পেয়েছিল পথের দিশা। এদেশের অকুতোভয় বীর সিপাহী আর জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রযন্ত্রে ফিরে এসেছিল শৃঙ্খলা। সেদিনের সেই সম্মিলিত শক্তি অচল হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে এক বীর যোদ্ধা ও অনন্য ব্যক্তিত্বকে। জাতি যখন কাণ্ডারীহীন হয়ে পড়ে তখন তিনি হাল ধরে ত্রাণকর্তা হিসাবে জাতিকে দেখান পথ। সংগ্রামে তিনি যেমন দীপ্ত, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল ফিরিয়ে আনতেও অনন্য। তিনি এদেশের মানুষের শ্রদ্ধেয় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র মানুষের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। বর্বর সে বাহিনীর নির্মমতায় গোটা জাতি দিশেহারা। দেশজুড়ে চলছে হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগসহ সব ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ। এমনি কঠিন মুহূর্তে জাতি হারিয়ে ফেলেছে তার করণীয় সম্পর্কে ধারণা। জাতিকে সে বিপদ থেকে উদ্ধারে তার করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিতে কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনে পলায়নপর জাতি তখন কান্ডারীহীন। পথ দেখাবার কেউ নেই। এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে হানাদার মুক্ত করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন অকুতোভয় মেজর জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা দিলেন ঐক্যবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার।

সেদিন তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিল গোটা জাতি। দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জাতি হিসাবে দীর্ঘদিন পর আমাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাই। এর পরই মেজর জিয়া ফিরে যান তার কর্মস্থলে।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার ভার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখলো, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে মুক্ত করেছিল সে সাধ পূরণ হবার নয়। ১৯৭২-এর শুরু থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল পাকিস্তানি লুটেরাদের বদলে দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাচ্ছে দেশীয় একশ্রেণীর স্বার্থবাদী ও লুটেরা শ্রেণীর হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে সমাজতন্ত্রের নামে ওই সব লুটেরার দল লুটেপুটে নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। দেশ চুরি, ডাকাতি, লুট, গুপ্ত হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের অরাজকতায় ভরে যায়। জনগণ এসব অপকর্ম অত্যন্ত অসহায়ভাবে সহ্য করতে থাকে। সে সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দেশ পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যেসব অপকাণ্ড ঘটাতে শুরু করলো তা এদেশের মানুষের কাছে ছিল অকল্পনীয়। গোটা দেশকে সন্ত্রাস আর নৈরাজ্যের মুখে ঠেলে দেয়া হয়। একথা ঠিক যুদ্ধে অংশ নেয়া নিয়ে যত বিতর্কই হোক তা সংঘটিত হয়েছিল শেখ মুজিবের নামেই। কেননা ১৯৭০ সালের ইয়াহিয়া খানের দেয়া সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ আসন লাভ করে দেশে প্রধান দল হিসাবে পরিচালিত হয়। আর সে দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিব এদেশের নেতা পরিগণিত হয়। এখন একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন সে সময় এদেশে অন্য কোনো বড় দলের উপস্থিতি না-থাকা এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ নির্বাচন বর্জন করায় এটা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল। এর আগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে এবং আটক করে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক দিক থেকে এদেশে পরিচিত করে তোলে।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ ঐতিহাসিক গতিধারায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে এদেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। আর তার অনিবার্য পরিণতিতে ১৬ ডিসেম্বর জাতি লাভ করে তার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সর্বস্তরের মানুষ আশা করেছিল গণতান্ত্রিক অধিকার, সুশাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা। তারপরও দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শেখ মুজিব বললেন, তিন বছর কিছু দিতে পারব না। জনগণ নির্বিবাদে মেনে নিল। কিন্তু প্রাপ্তিক্ষেত্রে যোগ হলো শূন্য তবে দেবার ক্ষেত্রে অনেক। একটি সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় জনগণ সবই মুখ বুঁজে সয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দেশের মানুষ কিছু না পেলেও আওয়ামী লীগের নামে তাদের নেতা-কর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতি দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। দেশবাসী আশাহত হতে থাকে।

ক্রমশ এ অরাজক অবস্থা বাড়তে থাকে। অব্যাহত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, জনগণের সম্পদ হরণের পাশাপাশি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাও ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতাসীনদের সীমাহীন শোষণ, লুণ্ঠন ও আধিপত্যবাদীদের সুকৌশল কর্মকাণ্ডের কারণে ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ আসে। খাদ্যের জন্য মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে। অপরদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা রাতারাতি ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। জনগণের প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু লোক মৃত্যুবরণ করে।

জনগণ পাকিস্তানি নির্যাতন-নিপীড়ন-শোষণ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য একটি মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র চেয়েছিল। যেখানে থাকবে সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, সবার জন্য সমান সুযোগ ও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার, থাকবে স্বাধীন সংবাদপত্র। অর্থাৎ মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ও শোষণহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা—যেখানে আইনের চোখে সবাই সমান। কিন্তু চাওয়া পাওয়ার মধ্যে এক বিপরীতমুখী ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাংবিধানিক ধারার পরিবর্তে দেখা গেল অসাংবিধানিক কার্যকলাপ, জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল আইনের শাসনের পরিবর্তে সুবিধাভোগী শ্রেণীর আইন। বিচার বিভাগের উপর সরকার দলীয় ব্যক্তিদের অযথা হস্তক্ষেপের কারণে তার স্বাধীনতা হল ক্ষুণ্ন। ফলে জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হল। দেশে আইনের শাসনের পরিবর্তে দেখা গেল ক্ষমতার দাপট।

একটি জাতি স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার আদর্শ থেকে সরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চাওয়া গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করে। তাদের অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতার কারণে সমগ্র জাতি একদলীয় স্বৈরশাসনের আওতায় বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সেই সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হারিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে হঠাৎ করে দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। একই বছর ১৬ জুন বন্ধ করে দেয়া হয় সরকারী ৪ টি পত্রিকা বাদে দেশের সকল সংবাদপত্র। সকল গণতান্ত্রিক আদর্শ ঐতিহ্য হারিয়ে ক্ষমতাসীন দলটি ও তাদের নেতা দেশের ৮ কোটি মানুষকে একদলীয় বাকশালী স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে ফেলার ষড়যন্ত্র করে না। দেশে আইন-শৃংখলা অবস্থার অবনতি মারাত্মক পর্যায়ে পৌছে যায়। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিক আওয়ামী পেটোয়া বাহিনী 'রক্ষীবাহিনী'র হাতে নির্মমভাবে নিহত ও আহত হয়। এসব নানাবিধ কারণে জাতি দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশা থেকে জন্ম নেয় বিক্ষোভের। এই বিক্ষোভের কারণে একটি জনপ্রিয় দল ও নেতার জনপ্রিয়তায় ধস নেমে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌছে যায়। এই হতাশা আর বিক্ষোভ ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অথচ বাস্তব পরিণতির জন্ম দেয়। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন। শাসন ক্ষমতার এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

এ ঘটনার পর সমগ্র দেশ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে সংকট দেখা দিল প্রবলভাবে। ১৫ আগস্টের ঘটনার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়

www.nagorikpathagar.org

অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কোনো সঠিক ও বাস্তব নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারল না। দেশে সে সময় একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ও নেতৃত্ব জাতির সামনে আশার এক মিনিট আলো দেখিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। জনমনে আবার হতাশা আর ক্ষোভের সৃষ্টি করল। এমনি এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে ৩ নভেম্বর দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আর একবার পরিবর্তন সূচিত হলো। কিন্তু এসব পরিবর্তন জাতির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দিতে পারল না। ফলে জনমনে দানাবেধে উঠা ক্ষোভ আর একবার বিস্ফোরিত হলো ৭ নভেম্বরে। এদিন জাতি আবার খুঁজে পায় সেই নেতৃত্ব। সিপাহী-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ও বাঁধভাঙ্গা বিপ্লবের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া গেল প্রতিশ্রুতিশীল এবং মানবকল্যাণে অঙ্গিকারবদ্ধ সৎ ও যোগ্য নেতাকে। যেন তিনি আবির্ভূত হলেন ত্রাণকর্তা হিসাবে। যেমন '৭১-এর ভয়াল দিনে জাতিকে শুনিয়েছিলেন অভয় বাণী, দিয়েছিলেন পথের দিশা। আজও তেমনি জাতির হতাশা আর গ্লানি মুছে দিতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আর বীর সৈনিকবৃন্দ তাকে পুনরায় নিয়ে এলেন স্বাধীনতার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর। তিনি জিয়াউর রহমান। এ দেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতায় এসে তিনি ঘোষণা দিলেন সব ধরনের অনিয়ম-বিশৃংখলা বন্ধের। '৭১-এর ২৬ মার্চের সেই স্বাধীনতার আহবানের মত জাতি ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার মিলিত বিপ্লবের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। একে একে তিনি ফিরিয়ে দিলেন জনগণের হৃত অধিকার। একদলীয় শাসনের বদলে কায়েম করলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের সব মৌলিক অঙ্গীকার ভোগের নিশ্চয়তা দিলেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করলেন। আর এসবই তিনি করলেন '৭৫-পূর্ববর্তী সময়ে জনমনে সঞ্চারিত ক্ষোভ, হতাশা আর ঘৃণা মুছে ফেলার জন্য, স্বাধীনতার চেতনা আর মুক্তিযুদ্ধে জাতিকে দেয়া অধীকার পূরণের জন্য। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা আর বাসস্থানের পাশাপাশি শান্তি আর সৌহার্দ্যময় পরিবেশে বসবাসে জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে। ৭ নভেম্বর তাই জাতির জন্য অঙ্গীকার পূরণের শুভ সূচনার একটি দিন। হতাশা আর ক্ষোভ ঝেড়ে জাতির এগিয়ে চলার প্রেরণার একটি উজ্জ্বল দিন। আর প্রেরণার উৎস হিসাবে একই সাথে এসে যায় সেই অমর নাম—শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের চেতনা

ড. জসীমউদ্দিন আহমদ

৭ নভেম্বরের চেতনার সম্যক উপলব্ধির জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্যের আবরণের চক্রান্ত আর স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের দুঃশাসন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিলো তার যেমন একটা রাজনৈতিক রূপ ছিলো একই সাথে ছিলো অর্থনৈতিক মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রথমদিকে মূলত এই সংগ্রাম আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকারকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিলো। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন সব ধরনের মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞে, তখন তৎকালীন আওয়ামী লীগের শীর্ষপর্যায়ের নেতাদের পলায়নপর মনোবৃত্তি ও আত্মসমর্পণের ঘটনা জাতিকে স্তম্ভিত, হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। দুঃসহ এই অন্ধকারে জাতি একটু আলোর প্রত্যাশায় ব্যাকুল ছিলো। এমন সময় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাতাসে ভেসে ওঠে এক অসম সাহসী মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশবাসী। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে প্রায় শেষ অবধি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাই অতুলনীয় দেশপ্রেম, অনুকরণীয় শৌর্যবীর্য এবং সাধারণ জনগণের অভূতপূর্ব সহমর্মিতা এবং সাহায্য সহযোগিতার ফলে দেশের ভেতরের সব রণাঙ্গনেই যুদ্ধ করে পাক হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে যখন বিজয়ের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলো তখনই ভারতীয় বাহিনী তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। কারও কারও মনে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে ভারতীয় বাহিনী সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে না-পড়লে হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হতো না। বাস্তব চিত্রটি ছিলো ভিন্ন। মুক্তিবাহিনীর অবধারিত বিজয়কে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্য ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের জনগণের বিজয়ের সিংহভাগ কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকেই তাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতাকে রক্ষা এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলো। এদেশের জনগণের স্বপ্ন ছিল, একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া, যে বাংলাদেশে থাকবে না কোনো শোষণ আর বঞ্চনা। আর বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে একটি আত্মনির্ভর দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অন্যদিকে ভারতের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবেশী ও এই অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী দেশ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুর্বল করে আঞ্চলিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। ভারতের গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জেনারেল সুজিত সিংহ ওভানের নাম এ দেশের অনেকের নিকটই বেশ পরিচিত। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও সার্বিক সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনীর বিকল্প হিসেবে 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। জেনারেল ওভান স্বপ্ন পূরণের কথা বলতে গিয়ে তার Phantoms of Chittagong নামক গ্রন্থে লিখেছেন —"We had for the first time in a thousand years of our history won a victory of such magnitude that it changed balance of power not only in Asia but in the world and set into motion process of peace which we had no lright even to dream of " অর্থাৎ "আমরা হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি বড় মাপের বিজয় অর্জন করেছি যার ফলে শুধু এশিয়ায় নয়, সারা বিশ্বেই শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়েছে এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চার হয়েছে, যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশ যাতে স্ব-নির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য ভারতীয় চক্রান্তের অভাব ছিলো না। প্রথমেই যাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধার করা সব ধরনের আধুনিক মারণাস্ত্র ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকেই ভারতে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। এর প্রতিবাদ করতে গিয়েই বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে 'রক্ষীবাহিনী' গঠন করা হয়। রক্ষীবাহিনী মুলত RAW-এর পরিকল্পনায় সৃষ্ট মুজিব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয় একং তাদের জন্য ভারতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। রক্ষীবাহিনীর দু'টি কার্যক্রম ছিলো—দৃশ্যত এই বাহিনী তখনকার শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করছিলো তবে অদৃশ্য সুতোর টানে ভারতের স্বার্থ রক্ষাই এদের প্রধান কাজ ছিলো।

স্বাধীনতার পরের সাড়ে তিন বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের এক কালো অধ্যায়। এসময় রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট, চোরাচালান, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পরিবারতন্ত্র আর রাষ্ট্রীয় দলীয় ও গোষ্ঠী সন্ত্রাসের ফলে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী একটি গর্বিত জাতি খুব অল্প সময়ের ভেতরই বিশ্বব্যাপী উপহাস ও করুণার পাত্র হয়ে ওঠে। এ সময় '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে শাসক

www.nagorikpathagar.org

গোষ্ঠীর লুটপাট ও অব্যবস্থাপনার ফলে কয়েক লাখ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। ওই সময় তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'একটি তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। রক্ষীবাহিনীর সে সময়কার হত্যা-সন্ত্রাস আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী যেটুকু বাইরে বেরুতো তাই বিশ্বের যে কোনো বিবেকবান মানুষকে আলোড়িত করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। এসব নিষ্ঠুরতার কাহিনী ধামাচাপা দেয়ার জন্যই ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত হানা হয়। সে সময় চারটি দৈনিক সংবাদপত্র রেখে অন্য সব ধরনের বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে একদলীয় শাসন প্রক্রিয়ায় বাকশাল গঠন করা হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেশের জনগণের ভেতর পরিকল্পিতভাবে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়।

এ পরিস্থিতিতে ঘটে ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তন। পটপরিবর্তনের পর ভারতীয় মহাপরিকল্পনা সাময়িকভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। কেউ কেউ এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদপত্রে নিবন্ধ/উপসম্পাদকীয় লিখেন। ১৯৯৬-২০০১ সালের সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন ২৭ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ১৫ আগষ্টের অভ্যুত্থানে নায়কদের অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন "এই কাজের জন্য তাঁহার সারা জাতিরই অভিনন্দন লাভের যোগ্য। গোটা জাতি যে সময় দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শুধু নীচের দিকে তলাইয়া যাইতেছিলো, সেই সময় তাঁহারাই জীবনের ঝুঁকি নিয়া এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।"

এরপর প্রতিবেশী দেশের চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র আরও প্রকট রূপ নেয় এবং নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে অর্থাৎ ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং জেনারেল জিয়াকে বন্দী করেন। এতে এদেশের রুশ ও ভারতপন্থীরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং রাজপথে আনন্দ মিছিল বের করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি গোষ্ঠীর এই ধরনের আচরণ ও ভারতের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে এ ধরনের আশংকায় দেশের জনগণ ও দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ফুঁসে ওঠে। এমনি অবস্থায় ঘটে ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিলো স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সব ধরনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

এরপর অনেক বছর পর আবার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আর দেশীয় আমলাসহ অশুভ গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ১৯৯৬ সালের এক বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। এই সরকারের গত চার বছরের একটু বেশী সময়ের শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫ সময়ের শাসনামলের সাথে অদ্ভুতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের স্বার্থবিরোধী কয়েকটি চুক্তি ভারতের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তির ফলে কি কি অসুবিধা হচ্ছে তা সবারই

www.nagorikpathagar.org

জানা। দেশের উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ প্রক্রিয়া, বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ ও তীব্রতা বৃদ্ধি সবই ফারাক্কা বাঁধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এমনকি সাতক্ষীরাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাম্প্রতিক অভাবনীয় বন্যা ভারত থেকে ঠেলে দেয়া পানির জন্যই হচ্ছে—এ কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাদের মুরুব্বীরা নাখোশ হতে পারে ভেবে এই নতজানু সরকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের গ্যাস সম্পদ ভারতে রফতানী করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

শেখ হাসিনার সরকার ভারতীয় পরিকল্পনায় বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের সব দেশকে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী করার বাস্তবায়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গ্যাস রফতানী ও বিদ্যুৎ আমদানীর মাধ্যমে বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে তুলে দেয়া, তথাকথিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তিচুক্তি ও সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির নামে বাংলাদেশের বাজার ভারতের হাতে তুলে দেয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করে ভারতের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ—এ সবই হচ্ছে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা। এসবের মাধ্যমে একটাই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা চলছে যাতে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। মাথা উঁচু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের মুরুব্বীয়ানা মানবে না এটাই স্বাভাবিক। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই ষড়যন্ত্রের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে পরিচিত করেছিলেন।

এ সরকার ক্ষমতায় এসেই ৭ নভেম্বর নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র করেছে। ৭ নভেম্বরের চেতনা এই সরকারের মুরুব্বীদের অসহনীয়। তাই আগামী নির্বাচনে দেশপ্রেমিক জনগণ ৭ নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের আর্শীবাদপুষ্ট এই সরকারের পরিবর্তে একটি দেশপ্রেমিক সরকারকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমরা কোন ভাবেই আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী কোনো কাজ হতে দেবো না, মাথা উঁচু করে আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবেই বেঁচে থাকবো। জাতীয় কবি নজরুলের কথায় বলতে হয়, ... "শির নেহারি আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।" আমাদের শির নত হবে না, হিমালয়ের শির নত হলেও-/ এই হলো ৭ নভেম্বরের মূল চেতনা।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের তাৎপর্য

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশে রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা সুনির্দিষ্ট হয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকেই। এর স্বতন্ত্র প্রকৃতি রয়েছে। রয়েছে এর নিজস্ব সুর-ছন্দ। এর নিজস্ব বাণী। নিজস্ব ব্যঞ্জনা। এ ধারার বিপরীতে গেলে তা দুর্যোগ কবলিত হতে বাধ্য। ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সরব উচ্চারণ তারই প্রতিফলন। এ সুর আত্মপ্রত্যয়ের। এ বাণী জাতীয়তাবাদের। এ ব্যঞ্জনা আত্মনির্ভরশীলতার।

তিনজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে ৭ নভেম্বরের অধ্যায়। ঢাকা ব্রিগেডের সহায়তায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। সশস্ত্র বাহিনী বঙ্গভবন ব্যতীত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে চীফ অব আর্মি স্টাফের পদ থেকে পদচ্যুত এবং বন্দী করা হয়। খালেদ নিজেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খন্দকার মোশতাক আহমদ পদত্যাগ করলে তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এ, এস, এম, সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দান করেন। মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করেন। জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সামরিক শাসন জারি করেন তিনি। মেজর হাফিজের মাধ্যমে ১৫ আগস্টে অভ্যুত্থানকারী মেজরদের সাথে এক ধরনের বোঝাপড়া করেন। স্থির হয়, তখনও বঙ্গভবনে অবস্থানকারী অভ্যুত্থানকারী মেজররা ৪ নভেম্বরে নিরাপদে দেশত্যাগ করবে। অস্ত্রশস্ত্র তখন ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আসবে। ৪ নভেম্বরে মেজররা দেশত্যাগ করল বটে, কিন্তু তারপূর্বে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ৪ জন জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সারা দেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তাঁর এ অভ্যুত্থান কিন্তু ছিল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। মাত্র ৪ দিনের মাথায় ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিপাহী-জনতার বিপ্লবে খালেদ মোশাররফের সকল পরিকল্পনার অবসান ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

সিপাহী-জনতার বিপ্লবের গভীরতায় তিনি হন হতচকিত। ঢাকা ত্যাগ করার সময় শেরে বাংলা নগরের উপকণ্ঠে বিপ্লবী সৈনিকদের দ্বারা তিনি হন নিহত। পরবর্তী পর্যায়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলেন। খালেদ মোশাররফ একজন কৃতি মুক্তিযোদ্ধা। ২ নং সেক্টরে তারই নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তাঁর নামের আদ্যক্ষর ধারণ করেই কে-ফোর্স (K-Force) সংগঠিত। তাঁর মতো একজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে কেন গেলেন? অভ্যুত্থানে তাঁর লক্ষ্য কি ছিল? তিনি কি পেতে চেয়েছিলেন?

এ সব প্রশ্নের উত্তর এক-একজন বিশ্লেষক এক-একভাবে দিয়েছেন। কেউ বলেন, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল এক ধরনের পাল্টা অভ্যুত্থান। শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি এবং তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রবর্তিত করার লক্ষ্যেই এ আয়োজন। খালেদ, শাফায়াত উভয়েই ছিলেন মুজিব-ভক্ত। আওয়ামী লীগের সাথে তাদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এমনকি, তাঁদের কোন কোন নিকট আত্মীয় শেখ মুজিবের এক দলীয় ব্যবস্থা বাকশালের সদস্য ছিলেন। ৪ নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ অভ্যুত্থানের পক্ষে যে মিছিল সংগঠিত হয় তার কিছু কিছু স্লোগানে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃত এবং ১৫ আগস্টে অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও ছিল। কেউ-বা বলেন, একজন প্রফেশনাল সৈনিক হিসাবে ১৫ আগস্টে অভ্যুত্থানকারী মেজরদের শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপারে তিনি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হন এবং এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদ সোপান, প্রত্যক্ষ নির্দেশসূত্র এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তখনও ৮ টি ট্যাঙ্ক এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মেজররা বঙ্গভবনে অবস্থান করছিল। সেনাবাহিনী যেন দ্বিধাবিভক্ত। এক অংশ বঙ্গভবনে অন্য অংশ ক্যান্টনমেন্টে—অসহায়, দায়িত্বহীন, অকর্মণ্য যেন। তাই তিনি সামরিক বাহিনীকে শৃঙ্খলার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে তার হতগৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

কারও কারও মতে, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল প্রতিনিয়ত অতি সঙ্গোপনে তথ্য সংগ্রহকারী ভারতীয় 'র' (RAW)-এর সহযোগিতায় ভারতপন্থী এক অভ্যুত্থান। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ভারতের জন্য শুধুমাত্র মারাত্মক ছিলনা—তা ছিল ভয়ঙ্কররূপে অপমানসূচকও, বিশেষ করে খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তানপন্থী, প্রো-চাইনিজ এবং সামরিক ঘেঁষা নীতির জন্য। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবের মৃত্যুতে ভারত শুধু যে এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারায় তাই নয়, এরপর বাংলাদেশে ভারতঘেঁষা কোন কিছুর অবশিষ্ট ছিল না। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে যে ভাবে চিত্রিত করে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় জনগণের যে আনন্দ-উল্লাস পরিলক্ষিত হয় তা এ মতবাদকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের কোন পত্র-পত্রিকায়ও এর আভাস মেলে।

www.nagorikpathagar.org

Bangladesh Times পত্রিকার ৮ নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে দেখা যায় "৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানে বিদেশী হস্তক্ষেপের আভাষ রয়েছে।"

বিশ্লেষকদের এসব যুক্তির কোন কোনটা খণ্ডনযোগ্য। আওয়ামী লীগের প্রতি খালেদ মোশাররফের দুর্বলতা হয়তো ছিল। তিনি হয়তো বা মুজিবভক্তও ছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ – '৭৫ আমলের আওয়ামী লীগ শাসনকে, বিশেষ করে বাকশালকে পুনরুদ্ধারে কোন সংকল্প তাঁর ছিলনা। আওয়ামী লীগ শাসন পুনঃপ্রর্বতনের কোন লক্ষ্য থাকলে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করতেন না। ভেঙ্গে দিতেন না জাতীয় সংসদ। সামরিক শাসন জারিরও কোন চিন্তা-ভাবনা করতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মিছিলটি সংগঠিত হয় এবং মিছিল থেকে যেসব শ্লোগান দেয়া হয় তাতেও তিনি খুশী হননি। জানা যায়, ঐ মিছিলের পরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি শেষ হয়ে গেলাম।' ঐ মিছিল সংগঠনের জন্য আওয়ামী লীগ যতটুকু তৎপর ছিল, মনিসিং-এর কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং মোজাফফর আহমদের ন্যাপও তেমনি তৎপর ছিল। তেমন হলে খালেদ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন, হয় অভ্যুত্থানের আগে অথবা পরে। কোন অবস্থায় কিন্তু তিনি সেদিকে যাননি। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় চার নেতার জীবন রক্ষা করে অবিলম্বে তাদের জাতির সামনে আনতে পারতেন। তাও তিনি করেননি।। এমনকি চার নেতার মৃত্যুর পর তাঁদের মরাদেহ হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে তিন জাতীয় নেতার মাজারের পাশে দাফন করার যে প্রস্তাব তিনি পেয়েছিলেন তাতেও রাজি হননি। আওয়ামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আগ্রহী থাকলে ৩ নভেম্বরেই অথবা অনতিবিলম্বে তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের সমন্বয়ে একটা মন্ত্রিপরিষদও গঠনের উদ্যোগ নিতে পারতেন। এগুলোর কোন দিকেই তিনি যাননি।

চেইন অব কমান্ড পুনর্বাসনের যুক্তিও অচল, কেননা খালেদ নিজেই সে সূত্র ভঙ্গ করে সামরিক বাহিনী প্রধানকে বন্দী করেন এবং নিজের বিশ্বস্ত সৈনিকদের নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটান। আমার মনে হয়েছে, খালেদের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল একটা ভেটো ক্যু বা প্রিম্পটিভ ক্যু (Veto or Preemptive Coup)। দুটি কারণে তিনি পূর্বাহ্নেই আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। তখন সামরিক বাহিনীর অবস্থা সন্তোষজনক ছিলনা। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী মেজররা সশস্ত্র বাহিনীর মৌল সূত্র ছিন্ন করে তার প্রাণ শৃঙ্খলাবোধ নিঃশেষ করতে চেয়েছিল বঙ্গভবনে সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় কারণটি ছিল আরও জরুরী। সৈন্য এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে তখন 'বিপ্লবী সংস্থা' গঠন করে প্রচুর সংখ্যক বিপ্লববাদী সৈনিক প্রস্তুত হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করতে। তাদের লক্ষ্য ছিল শ্রেণীহীন সশস্ত্র বাহিনীকে আরও তীক্ষ্মধার করে তার মাধ্যমে সমাজ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন। এ অবস্থায় খালেদ মোশাররফ সম্ভবত চেয়েছিলেন

www.nagorikpathagar.org

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দুই গ্রুপকেই এক সাথে নির্মূল করে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে সনাতন সশস্ত্র বাহিনীর আদলে পুনর্গঠন করতে।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী তাঁর কথা এ প্রসঙ্গে এসে যায়। তিনি কর্নেল তাহের। একজন কৃতি মুক্তিযোদ্ধা। কর্নেল তাহের ১১ নং সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কামালপুরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি এক পা হারান। মুক্তিযুদ্ধে শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তিনি হন বীরউত্তম। তিনি শুধুমাত্র একজন কৃতি ও দক্ষ সৈনিকই ছিলেন না, তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল বৈপ্লবিক। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাই তিনি ভাবতেন সামরিক বাহিনীকে সৃজনমুখী উৎপাদনক্ষম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে এবং সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের নিমিত্তে এ প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে। আর একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল জিয়াউদ্দীনের চিন্তাভাবনাও ছিল প্রায় অনুরূপ। কর্নেল তাহের এ লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আন্ডারগ্রাউন্ড শাখা বিপ্লবী গণবাহিনীতে যোগদান করেন এবং সমাজের বিপ্লবী শক্তিগুলোর সমন্বয়ে মনোযোগী হন। সৈন্য এবং বিমান বাহিনীতে প্রচুর সংখ্যক বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠিত হয়।

৩ নভেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে কর্নেল তাহের একদিকে অভ্যুত্থানকে ভারতপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে তার দুর্বল ভিত্তিকে আরও শিথিল করার দিকে যেমন মনোযোগী হন, তেমনি বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সৈনিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। ৫ নভেম্বরে ক্যান্টনমেন্টগুলো হাজার হাজার লিফলেটে ছেয়ে যায়। সামরিক কর্মকর্তাদের অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানে সাধারণ সৈনিকদের কোন আগ্রহ নেই এ যেমন বলা হয়, তেমনি জানিয়ে দেয়া হয় যে, বিপ্লবকে সফল করার জন্য সৈনিক সংস্থার সদস্যাদের সভায় ৭ নভেম্বরের সকাল ৯ টায় গুরুত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান সার্থক করার জন্য কতকগুলো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা, সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনার জন্য বিপ্লবী সামরিক পরিষদ গঠন করা, সকল দলের রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান, বাকশাল ব্যতীত অন্যান্য দলের সদস্যদের সমন্বয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবী বাস্তবায়ন করা। এভাবে ৭ নভেম্বরে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং বিপ্লবের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হন।

জেনারেল জিয়া ছিলেন একজন খ্যাতনামা সৈনিক। ১৭ বছর বয়সে ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে কৃতি যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধে ১ নং সেক্টরে তিনি নেতৃত্ব দেন। জেড ফোর্স (Z-Force) তারই পূর্ণ নাম ধারণ করে। বীরউত্তম অভিধায় জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে তাকে স্মরণ করে। ১৯৭২ সালে তিনি হন ডেপুটি চীফ অব স্টাফ। ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্টে তিনি হন সামরিক বাহিনী

www.nagorikpathagar.org

প্রধান। ৩ নভেম্বরে রাত ১ টায় তাঁকে খালেদ মোশাররফ বন্দী করেন। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবে তিনি শুধু মুক্তই হলেন না, তিনি এলেন জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে।

কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা কেন সফল হলো না তার পর্যালোচনা এ পরিসরে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় জেনারেল জিয়ার সাফল্যের কোন্-কোন্ উপাদান কার্যকর হয়েছিল তার পর্যালোচনা। শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন, ৭ নভেম্বরের বিপ্লবে জেনারেল জিয়া হয়ে উঠেন জাতীয় আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক। ভারতবিরোধী মানসিকতার কেন্দ্রবিন্দু। বাকশালবিরোধী চেতনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। জিয়া এই সন্ধিক্ষণে সিপাহী-জনতার সামনে দাঁড়ালেন ত্রাতা হিসাবে। নতুন যুগের পথ প্রদর্শক হিসাবে। বাংলাদেশের অধ্যাত্ম সত্তার রূপকার হিসাবে। ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব এ-কারণে জাতির নিকট এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। কর্নেল তাহেরের স্বপ্ন ছিল, সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন করে তার মাধ্যমে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের পূর্ণ সত্তার বিকাশ সাধন করা। জিয়া চেয়েছেন, জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিন্ধ্যাচল উল্লঙ্ঘন করতে। পরনির্ভরশীলতার সকল বাধা দুমড়ে-মুচড়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার আগুনে সব বৈষম্য-অনাচার ঝলসে জাতীয় সংহতির মূল সুদৃঢ় করতে। তিনি চেয়েছেন, বাংলাদেশ নিজের ওপর আস্থা রেখে বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। বাংলাদেশের জনগণ স্বীয় সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে মাথা উঁচু করুক সগৌরবে। তখন ভারত-বিরোধী মনোভাবের মতো স্থূল প্রবণতা অথবা ভারতের ওপর নির্ভরশীলতার মতো হীনমন্যতা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আর ব্যাহত করবেনা। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার উত্তরণ এই চেতনারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুরণন।

৭ নভেম্বরের বিপ্লবের মৌল সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিপ্লবী চেতনা দু'ধারায় ছিল প্রবাহিত ঃ এক খাতে ছিল সমাজ পুনর্গঠনের জন্য বিপ্লবী চিন্তাস্রোত; অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছিল ভারতবিরোধী এবং ভারতবিদ্বেষী চেতনা। চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতবিরোধী মনোভাব, বিশেষ করে আত্মনির্ভরশীলতার দুর্দমনীয় স্পৃহাই জয়ী হয় এবং তারই শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন জেনারেল জিয়া। এ দেশের রাজনীতির গতি ধারাই এই। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে যা ঘটেছিল, বাংলাদেশ রাজনীতির মৌল প্রকৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটলে পঞ্চাশ বছর পরেও এমনি অবস্থায় এই সুর স্পন্দিত হবে। উচ্চারিত হবে তেমনি বাণী। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ স্রোতের বিপরীতে চললে নিজের বিপদই শুধু ডেকে আনবে তাই নয়, অগ্নিগর্ভ এ-সমাজে বিপ্লবের শিখা আবার প্রজ্বলিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের শিক্ষা

ড. মাহবুব উল্লাহ

আজ ৭ নভেম্বর। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দিনটি আমাদের জাতীয় পরিচয়কে দিয়েছে সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা। ১৯৭১-এর যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের গৌরব ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ আগস্টের ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের সত্যিকার সার্বভৌম অস্তিত্ব ছিল না। ১৫ আগস্ট সিঁড়ি বেয়ে এসেছিল ৭ নভেম্বর। এই ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ ঘোষণা করল ঃ আমরা একটি জাতি, আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম। অন্য রাষ্ট্রের আশ্রিত রাজ্য হবার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও অগণিত জনগণ আত্মাহুতি দেয়নি। বাংলাদেশের জনগণই হবে বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা।

'৭৫-এর ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের কর্ণধারে পরিণত হন। এর পূর্বে ৩ নভেম্বর মুষ্টিমেয় সেনাকর্মকর্তা ও ভিনদেশী চক্রের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দী হন। ৩ নভেম্বরে কুচক্রীদের অভ্যুত্থান পরবর্তী ঢাকার চিত্র আজও আমার চোখের সামনে দীপ্যমান।

৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহর পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গেই আমার সাক্ষাত হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। রাজধানী ঢাকার প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল। সকলেরই একই প্রশ্ন বাংলাদেশ কি আবার ভারতের গোলাম হয়ে গেল? গণতন্ত্র বিরোধী ফ্যাসিস্টরা কি আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে? আবার কি দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কলাপাতা জড়িয়ে লাশ দাফন?

না। কুচক্রীদের সেই চক্রান্ত এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সৈনিক-জনতা নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বন্দীদশা থেকে তারা মুক্ত করে আনল এদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের মানুষ জিয়াকে। জিয়াউর রহমান আমাদের জাতির দুটি চরম ক্রান্তিলগ্নে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। প্রথমবার '৭১-এর ২৬ মার্চ, যখন এদেশের জনগণের উপর পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী চরম প্রতিশোধ গ্রহণের

www.nagorikpathagar.org

জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তাদের গণহত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়নের সমুচিত জবাব না দিয়ে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের ধারক বাহকরা ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেতে ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে হতবিহ্বল জাতিকে অভয়ের বাণী শোনালেন জিয়া। কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেয়ে সমগ্র জাতি আশ্বস্ত হয়েছিল। তারা জানল প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। জিয়া তাদের সঙ্গে আছেন।

জিয়া রাজনীতিক ছিলেন না। ছিলেন একজন সৈনিক। এদেশের জনগণ জিয়া নামে সেনাবাহিনীতে একজন মেজর পদের সৈনিক আছেন এ কথাটি জানত না। কিন্তু যে মানুষটির উপর সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাস সুমহান দায়িত্ব নিয়তির মতো অর্পণ করে রেখেছে সেই মানুষটি সময়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি। এই অপরিচিত সামরিক অফিসারটির নাম মুহূর্তেই বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে, লোকালয় থেকে লোকালয়ে। মানুষের ঘরে ঘরে, মানুষের অন্তরে অন্তরে। ইতিহাসে কখনো কখনো এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন কোন ব্যক্তির উচ্চারণ গোটা ইতিহাসটাকে অগ্রগতির নতুন ধাপে উত্তরণ ঘটায়। জিয়া ছিলেন তেমনি একটি মানুষ। সেদিন জিয়া যদি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিতেন তা হলে সম্ভবত এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। ইতিহাসের বিবর্তনে নানা মানুষ নানা সময়ে তাদের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু চরম ক্রান্তিকালীন মুহূর্তের ভূমিকাটি হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্ধারক। জিয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চরম সঙ্কট মুহূর্তের সেনাপতি ও পথপ্রদর্শক।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আরেকটি সঙ্কট মুহূর্ত ছিল'৭৫-এর ৩ নভেম্বর। কিন্তু এই সময়টিতে জিয়ার কিছুই করার ছিল না। তিনি ছিলেন কুচক্রীদের হাতে বন্দী। ইতিমধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র জাতীয় চৈতন্যের প্রতীক। তাঁকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই সংঘটিত হয়েছিল সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান। উপমহাদেশের ইতিহাসে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সংগঠিত হয়েছিল সিপাহীদের অভ্যুত্থান। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই অভ্যুত্থানকে আখ্যায়িত করেছিল সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে। কারণ তা ইংরেজ রাজশক্তির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ এই অভ্যুত্থানকে সিপাহী বিপ্লব নামে নামকরণ করেছিলেন। শাসকের দৃষ্টিতে যেটি ছিল মিউটিনি (Mutiny) জনতার দৃষ্টিতে সেটি ছিল অভ্যুত্থান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৮৫৭'র সিপাহী অভ্যুত্থান সফল হয়নি। উপমহাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রধান সিপাহী অভ্যুত্থানটি ঘটেছিল বাংলাদেশে, '৭৫-এর ৭ নভেম্বর। সিপাহীদের সেই অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল, পরাজিত হয়েছিল জাতিদ্রোহী রাষ্ট্রঘাতি শক্তি। '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবের সাফল্যের পেছনে ছিল তিনটি বিন্দু থেকে অঙ্কিত রেখার সার্থক সম্মিলনের ত্রিভূজ। এই ত্রিভূজের প্রথম বিন্দুতে ছিলেন এদেশের জনগণ। দ্বিতীয় বিন্দুতে এদেশের সাহসী

www.nagorikpathagar.org

সৈনিকেরা এবং তৃতীয় বিন্দুতে ছিলেন অন্তরীণ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত কিন্তু সৈনিক ও জনতা এই উভয়ের ভরসার স্থল জিয়া।

৭ নভেম্বর আমাদের কি শিক্ষা দেয় ? আমাদের যদি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, সৎ ও সাহসী নেতা থাকেন, যদি থাকে একটি দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, আর যদি থাকে সৈনিক ও জনতার দুর্ভেদ্য ঐক্য, তাহলে পৃথিবীর কোন আধিপত্যবাদী শক্তি আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ৭ নভেম্বরের এই মহান শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিতে বিগত দিনের তাঁবেদার সরকার জাতীয় জীবনের ক্যালেন্ডার থেকে এই দিবসটিকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। এই দিবস উদ্‌যাপন তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই দিবসের তাৎপর্য চর্চাকে তারা কলঙ্কের কালিমায় কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের জাগ্রত জনতা গত ১ অক্টোবরের নীরব ভোট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সিপাহী জনতার দেশপ্রেমিক অভ্যুত্থানের স্মারক এই দিবসটির মর্যাদাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু ভোটবিপ্লবের একটি বিজয়ের মধ্য দিয়েই ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে রক্ষা করা যাবে না। আমরা যদি বিভেদের পথ পরিহার করে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারি, আমাদের জাতীয় পরিচয়কে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে না পারি এবং বাংলাদেশের মৃত্তিকার গহ্বরে ও তার বহির্দেশে যেসব সম্পদ আছে তাকে রক্ষা করতে না পারি ; দোদুল্যমানতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা ও বিদেশ নির্ভরতা যদি আমাদের গ্রাস করে তাহলে ৭ নভেম্বর পালন পরিণত হবে নিছক আনুষ্ঠানিকতায়, তাৎপর্যহীনতায় ও শঠতায়।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের শপথ

সাদেক খান

'৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার ঐতিহাসিক পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে অনেক গবেষণা ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এবার সে আলোচনায় আমি যাব না। কারণ এবার সেই সিপাহী-জনতার বিপ্লব বার্ষিকী এসেছে এক নবতর ঐতিহাসিক দায়িত্বের ফরমান বহন করে।

প্রতিটি বৈপ্লবিক ঘটনার আবর্তে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা দানা বাঁধে। একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষক জিয়ার নেতৃত্ব আহবান করে পঁচাত্তরের সিপাহী-জনতার ঢল যে অটল আস্থা প্রকাশ করেছিল তার বলে সময়োচিত হস্তক্ষেপে নিষ্ফল হয়েছিল একটা পিঠাপিঠি প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র। 'সৈনিক সংস্থা' নামধারী একটা গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের গণতন্ত্রকামী প্রেরণাকে দমিত করে ক্ষমতা ছিনতাই-করার ফন্দী এঁটেছিল কর্নেল তাহের ও তার কতিপয় সঙ্গী। জিয়ার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেই হঠকারী তৎপরতার তাৎক্ষণিক মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যে বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের কবরের ওপর বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগৃতি ঘটলো, সেই বাকশাল বৃক্ষের কন্দ বহুদলীয় গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় মুকুলিত হয়ে আবার রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জা করতে পেরেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে নয়া বাকশালী কায়দায় আবার জোরেশোরে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতার অবতারণা হয়েছে। পিছনে রয়েছে আঞ্চলিক আগ্রাসী রাজশক্তি ভারত। আর মহাগোয়েন্দা বাহিনীর 'র' এখন ঘোমটা খুলেই এদেশে প্রতিবিপ্লবের কলকাঠি নিয়ে মাঠে নেমেছে। লক্ষ্য ঃ সরকারি-বেসরকারি সংঘ শক্তির দখল হাত করে ছলে-বলে-কৌশলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নৈতিক দুরাচার, উৎপাদন বিনাশ, মারোয়াড়ীর বাজার দখল, মোম্বাই মার্কা কালচার ইত্যাদির জাল বিস্তার করে এদেশের মানুষের উদ্যোগ ও মনোবল ভেঙে দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিলোপ সাধন, আর গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে কাগজেকলমে বাকশালী মন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই প্রতিবিপ্লবের কারসাজি সফল হবে না, হতে পারে না, কারণ বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের, নয়া বহুরূপী ভেক দেশবাসীর চোখে ধরা পড়ে গেছে। গদীনসীন হয়েই সরকারের অভ্যন্তরে ভারতের সেবাদাস চক্র রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলাকে

www.nagorikpathagar.org

সাবোটাজ করার অপচেষ্টায় রত হয়েছে। দেশপ্রেমিক শক্তির নিয়মতান্ত্রিক প্রতিরোধকেও কাবু করতে পারেনি চক্রান্তকারীরা। ভারতভক্তেরা মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্ণবিভেদ চালু করে রাষ্ট্রীয় অঙ্গোচ্ছেদের আমল দস্তক জারি করেছে। তার প্রতিবাদে জনতার লংমার্চ রুখতে পারেনি চক্রান্তকারীরা।

'৭৫-এর পরিবর্তনের অস্থির ঘাত-প্রতিঘাতে সংঘটিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলোর বাছাই করা বিচারের নাটককে পুঁজি করে এখন ভারতভক্তির সংঘশক্তি সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের নয়া প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছে। এমন সময়ে এসেছে সিপাহী-জনতা অভ্যুত্থানের বিপ্লব বার্ষিকী। এদিনের তাই একটাই শপথ, নয়া বাকশালী প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করতে হবে।

৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতা বিপ্লবের প্রথম ফসল বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের অঙ্গীকার। দ্বিতীয় ফসল ভারত মুখাপেক্ষিতা পরিহার করে মুক্তিযুদ্ধের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তৃতীয় ফসল ঔপনিবেশিকতার বিষবাষ্পে দূষিত আরাম কেদারার রাজনীতির আলখাল্লা ঝেড়ে ফেলে উৎপাদনের রাজনীতির জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উদ্ভাবন। তার ফলে যে গণচেতনার জোয়ার আর জাতিগঠনের স্পৃহা এদেশে জাগ্রত হয়েছে, ধোঁকা দিয়ে বা জবরদস্তি করে তাকে সাময়িকভাবে জব্দ করা গেলেও বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। নিজের কথায় আর কিছু না-বলে সুলেখক আহমদ ছফার "সাম্প্রতিক বিবেচনা ঃ বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস" গ্রন্থ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"বাংলাদেশে এখন একটি রেনেসাঁর সময়। কিন্তু নানামুখী ঘটনা প্রবাহ এবং সামাজিক শক্তিগুলোর ঘাত-প্রতিঘাতে একটি জাতির শিল্প সংস্কৃতিতে নতুনতরো অধ্যায় সংযোজন এবং বিজ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ নানা কারণে বিলম্বিত হতে পারে। কেননা পাকা বীজও পাথরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

তবু একটি রেনেসাঁ যে আসন্ন এদেশের তার সম্ভাবনাগুলো কি কি সংক্ষেপে আলোচনা করা মোটেই অসম্ভব নয়। একটি সমাজ যখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তার প্রতিষ্ঠিত বিচার-আচার, সংস্কার, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আইন-কানুন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তব জীবনের চাহিদা মেটাতে মোটেই সক্ষম হচ্ছে না, তখন সেই বিশেষ সমাজের বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনকে সমৃদ্ধ এবং গরীয়ান করার প্রেরণায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে নয়া দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার করতে হয়। নতুন চিন্তার অস্ত্রে সজ্জিত নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তারা পুরোনো সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গেচুরে নতুন যুগের প্রয়োজন মতো নতুনভাবে ঢালাই করে। তখন সমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ধরণটা একেবারেই বদলে যায়।

বলা হয়ে থাকে উনবিংশ শতাব্দীতে তৎকালীন বাংলাদেশেও একটি রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছিলো। প্রতিটি রেনেসাঁর একটি সামাজিক পশ্চাদভূমি থাকে। সমাজের

www.nagorikpathagar.org

একটি শ্রেণী আপনা থেকে উদ্যোগী হয়েই রেনেসাঁর বীজ ধারণ করে, বহন করে এবং লালন করে।

সে শ্রেণীটি মানব চেতনার নতুন দিক-নির্দেশ করতে প্রয়াসী হয় এ কারণে যে, তার মধ্য দিয়েই সে বিশেষ শ্রেণীটির জাগতিক আকাঙ্ক্ষা স্ফূর্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৎকালীন বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ফলে লাভবান হয়েছিলো যে শ্রেণীটি, তার বিত্ত, বৈভব এবং সামাজিক মান-মর্যাদা সবই বিদেশী রাজত্বের কারণে এবং এই শ্রেণীটিই ইউরোপীয় রেনেসাঁর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। তারাই নতুন মানব-ধর্ম প্রচার করলো; নতুন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলো এবং নতুনভাবে সমাজকে ঢালাই করতে উদ্যোগী হলো। তাঁদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি ফলবতী হয়নি। কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'লৌহ কাঠামো' মেনে নিয়েই তাদেরকে চিন্তা করতে হয়েছে, কাজ করতে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে তাঁদের অনেকেই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন একথা সত্যি। কিন্তু সামাজিকভাবে তাদের প্রচারিত মতবাদ খুব বেশী প্রসার লাভ করেছে একথা জোর করে বলার উপায় নেই।

সেকালে সাম্রাজ্য রক্ষার খুঁটি হিসেবে যে শ্রেণীটি সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, যারা রক্তে-মাংসে নেটিভ এবং মর্জি-মেজাজে বৃটিশ, সেই ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর স্তর অতিক্রম করে সমাজের প্রাকৃতজনের কাজে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দের কোন প্রভাব পড়েনি। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের মনে তাঁদের ভাবধারা সমানভাবে প্রেরণা জাগানোর কথা দূরে থাক, শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বমানুষকেও জ্ঞানের ভোজে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আহবান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর যে রেনেসাঁ তার মৌলিক উপাদান পুরোপুরি ধর্মবহির্ভূত হলেও তার চেহারাটি ধর্মীয় এবং আকারটি সাম্প্রদায়িক। সুতরাং বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁকে বাঙালী বর্ণ হিন্দুদের নবজাগরণ বলা নানাদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত। রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে কেউ নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন সত্যি সত্যি, সে রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ-সংস্কার প্রয়াস তাঁর আপন গণ্ডির মধ্যেই সীমিত ছিলো। শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে এ পর্যন্ত বর্ণ হিন্দুদের বাদ দিয়ে নীচুস্তর থেকে কোন উল্লেখ্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর এমনকি বিংশ শতাব্দীর শিল্পী-সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের জগতজোড়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি যেন সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষে ফসফরাসের মতো। নীচের দিকে আলোকিত করার কোন ক্ষমতা নেই। রেনেসাঁর ভাব তরঙ্গের বেগ বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে।

সূর্য পূর্ব দিকেই উদিত হয়। বাংলার এই পূর্ব অংশেই আর একটা রেনেসাঁ সম্ভাবিত হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অনেক বেশী হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

কথা। রেনেসাঁরও তো সামগ্রীর প্রয়োজন। তা বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন থেকেই অধিক হারে সঞ্চিত হয়ে আসছে। আইডিয়ার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি না থাকলে বিকাশ বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। উনিশ শতকে বৃটিশের দৌলতে ধনবান, প্রতিষ্ঠাবান এবং জ্ঞানবান একদল মানুষ চাইতেন সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার হোক, মানুষে মানুষে সহজ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু বৃটিশ তা চাইতো না এবং তাঁরা ছিলেন একভাবে না একভাবে বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু বাংলাদেশে সর্বমানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার এখন অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, জ্ঞান এবং যুক্তির আলোকে এযাবতকাল ধরে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সমাজের প্রাণহীন আচার-সংস্কারগুলো কখনো বিচার করা হয়নি। এবার সময় এসেছে। কামাল পাশার তুরস্কের মতো বাংলাদেশেও অনেকগুলো মজ্জাগত ধর্মীয় সংস্কার জোর করে পিটিয়ে তাড়াতে হবে। শুধু হিন্দু-মুসলমানে সৌভ্রাতৃত্ব নয়, গারো, হাজং, চাকমা, মগ যে সকল আদিবাসী আছেন, তাদেরও সংস্কৃতির বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া বৌদ্ধ, খৃস্টান এবং যে সকল অন্য ধর্মের অনুসারী আছেন, যে সকল উর্দুভাষী থেকে যাবেন তাঁদেরকে পুরোপুরি মানবিক মর্যাদা দিতে হবে। মানুষকে সত্যিকারভাবে মর্যাদা না দিয়ে মানুষের কোন শ্রদ্ধেয় সমাজ সৃজন সম্ভব নয়।"

এই যুক্তিবলেই শহীদ জিয়া মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, চাকমা, মগ, গারো, হাজং, টিপরা, মনিপুরী, সাঁওতাল, মুরং ইত্যাদি সব সম্প্রদায়কে একাত্ম করে বাংলাদেশী জাতিগঠনের সম্যক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরিহার করেছিলেন দেশবাসী সবাইকে খাঁটি বাঙালী হতে বলার বাকশালী ঔদ্ধত্য। আধিপত্যবাদের অনেক প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন আক্রমণকে প্রতিহত করে বাংলাদেশে জাতিগঠনের আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া নিজস্ব গতিতে সমানে চলেছে। হামলা-মামলা বা সরাসরি আগ্রাসন দিয়েও তাকে ঠেকানো যাবে না।

চারদিকে আওয়াজ উঠেছে, নয়া বাকশালী চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশবাসী সবাই রুখে দাঁড়াও। হামলা-মামলার আড়ালে নয়া বাকশালী রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের আসল চেহারা ফাঁস করে দিয়ে তাকে পরাস্ত করার লৌহদৃঢ় অঙ্গিকারই হবে এবারের ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক ফরমান।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের শিক্ষা এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

ড. তারেক শামসুর রহমান

৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই দিনটির যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এই দিনটির সাথে জড়িত রয়েছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি। গত একুশ বছর এদেশের জনগণ এভাবেই এ দিনটি স্মরণ করে আসছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মত একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপিত হচ্ছে। সরকারিভাবে এবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই দিবস পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে। গত ১৬ অক্টোবর এক মন্ত্রীর বাড়িতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মিসেস সালমা খালেদ প্রশ্ন তুলেছেন এই দিন একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং আমোদ-ফুর্তি করে এই দিনটি পালন করার যুক্তি কি? সংবাদপত্রে তার এই বক্তব্য ছাপা হয়েছে। দীর্ঘ ২১ বছর মিসেস সালমা এ প্রশ্ন তোলেননি। আজ তুলেছেন। নিঃসন্দেহে তার এই বক্তব্য গুরুত্বের দাবি রাখে। বলা ভালো, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর দেশে একটি সিপাই-জনতার অভ্যুত্থান হয়েছিল ও সেই অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নিহত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে খালেদ মোশাররফের এই মৃত্যু দুঃখজনক। কিন্তু ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর একটা প্রেক্ষাপট আছে। সেই প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, তাদেরকে উৎখাত করার লক্ষে ৩ নভেম্বর আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটলো। সেই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। ৩ নভেম্বরের পর ঢাকায় বাকশাল তথা আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি বড় মিছিল বের হলো। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন খালেদ মোশাররফের ছোট ভাই ও তার মা। মিছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে গেল। ফুলের মালা দিল। মানুষের মনে ধারণা জন্মালো বাকশাল বোধহয় আবার ক্ষমতায় আসছে। এ সময় জেলখানায় কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীকে হত্যা করা হলো। কারা হত্যা করল, কি জন্য তাদের হত্যা করা হলো, তা আজো জানা গেল না। ঐ সময় দেশে কি হচ্ছিল, তা বোঝা যায়নি। কোনো সরকারের অস্তিত্ব বলতে কিছু ছিলনা। মানুষ ছিল এক বিভ্রান্তির মধ্যে।

www.nagorikpathagar.org

লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস-এ প্রকাশিত একটি খবরে তখন সবাইকে অবাক করেছিল। খবরে বলা হয়েছিল বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতা বেড়ে গেছে। পত্রিকা আরো খবর দিল যে, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান মোকাবিলায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যা পরে আর কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির (?) কারণে এ ধরনের একটি ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশংকা ছিল। মৈত্রী চুক্তির (?) ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ দুটো কোনো একটি (অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারত) যদি তৃতীয় কোনো শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে দেশ দুটোর নেতৃবৃন্দ দ্রুত আলোচনার টেবিলে বসবে এবং আক্রমণকারী তৃতীয় শক্তি (তা অভ্যন্তরীণ শক্তিও হতে পারে) নিউট্রাল করার লক্ষ্যে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। খালেদ মোশাররফ এ ধরনের একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে গুজব আছে। খালেদ মোশাররফ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে 'কে' ফোর্সের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জাতি তার অবদান স্মরণ করবে। কিন্তু ৩ নভেম্বরের ভূমিকার কারণে তিনি বিতর্কিত হলেন। সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়ে তিনি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিলেন—এটা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ৩ নভেম্বরের ঘটনাবলীর সাথে বাকশাল রাজনীতির পুনরুজ্জীবন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতা ইত্যাদি কারণে খালেদ মোশাররফ বিতর্কিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যায়।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ষড়যন্ত্রের বীজ রোপিত হয়েছিল। লন্ডন টাইমস-এর ১৯৭১ সালের ১৭ নভেম্বরের সংখ্যায় ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে, ভারতের সাথে বাংলাদেশে একটি গোপন ৭ দফা চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তির অস্তিত্ব নিয়ে আজো মাঝে মধ্যে তর্ক ওঠে। যদিও আমরা আজো জানি না সত্যি সত্যিই এই ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কি-না। ভারতীয় সাংবাদিকরা আমাদের একথা জানাতেও ভোলেননি যে, শেখ মুজিব নিহত হলে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে ৩ ডিভিশন সৈন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন (আনন্দবাজার, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' যে বাংলাদেশে তৎপর, সে কথাও ভারতীয় সাংবাদিকদের লেখায় আমরা পাই। এমনকি জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের সাথে 'র' জড়িত ছিল বলে তারা উল্লেখ করেছেন (আনন্দবাজার, ১০ মার্চ, ১৯৮৯)। সুতরাং ৩ নভেম্বরের ঘটনাবলীকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিগেডিয়ার মোশাররফের ক্ষমতা গ্রহণের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েকদিনের। ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এ সময় সেনাবাহিনীর তৎকালীন চীফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন অসম্ভব রকম জনপ্রিয়। সাধারণ সেপাইরা ৭ নভেম্বর বিদ্রোহ করেন এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে জেনারেল জিয়াকে উদ্ধার করেন। সিপাইদের এই অভ্যুত্থানের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এদেশের লাখ-লাখ মানুষ। সিপাই-জনতা সেদিন এক হয়েছিল। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়া এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। জেনারেল জিয়া পরবর্তী ক্ষেত্রে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা করেন তার পেছনে ছিল ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী তাকে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ সেপাইরা কি চায়। আর তাই রাজনীতিতে তিনি সেই মূল সুরটি অনুধাবন করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে একটি প্লাটফর্মের আওতায় এনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা করেছিলেন।

৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর পেছনে মূল যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা হচ্ছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বাংলাদেশের জনগণের আপসহীন সংগ্রাম। বাংলাদেশীরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। তারা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়েই বাঁচতে চায়, কোনো শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে নয়। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর পেছনে মূলত কাজ করেছিল এই চিন্তাধারা। সেদিন ছাত্র, জনতা, সৈনিক সবাই মিলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এক হয়েছিল এবং সব ধরনের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। আজ একুশ বছর পরও এই আবেদনের এতটুকু কমতি নেই। বরং ভারতের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে ৭ নভেম্বরের চেতনা আবার নতুন করে উন্মোচিত হয়েছে। এদেশকে ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ভারতীয় স্ট্যাট্যাজির কোনো পরিবর্তন হয়নি গত একুশ বছরেও। সমস্যা জিইয়ে রেখেই ভারত বাংলাদেশ থেকে তার স্বার্থ আদায় করতে চাইছে। অপারেশন পুশব্যাক, ফারাক্কার পানি বন্টনে গড়িমসি, হাজার-হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কোনো উদ্যোগ না নিয়ে ভারত বাংলাদেশের ওপর আজো তার রাজনৈতিক 'চাপ' অব্যাহত রেখেছে। ভারতের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের গ্যাস, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ও বাংলাদেশ ভূখন্ডের উপর দিয়ে পূর্বাঞ্চলে সেনাবাহিনী চলাচলের সুবিধা আদায় করে নেয়া।

এক সময় ভারত বাংলাদেশ থেকে গ্যাস কেনার প্রস্তাব উথাপন করেছিল। আজ ভারত গ্যাসের কথা বলছে না। কিন্তু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট দাবি করছে। ভারতের যুক্তি ট্রানজিটের সুবিধা নিয়ে সে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাবে। বাংলাদেশের ভূমিকে ভারত করিডোর-হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। সমস্যাটা হচ্ছে ভারত যে অঞ্চলে তার পণ্য পাঠাতে চায়, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতা

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন চলছে, তার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লীর ঔপনিবেশিক আচরণ। এ অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। ওই প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে যে আয় হয় তা দিয়ে ভারতের উন্নয়নের কাজ হয়। এক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে এই অঞ্চল।

ফলে কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদেই এই অঞ্চলে জন্ম হয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ভয়টা হচ্ছে ভারতকে যদি ট্রানজিটের সুবিধা দেয়া হয় এবং ভারত যদি বাংলাদেশের রেলপথ ব্যবহার করে, তাহলে এই রেলপথ দিয়ে ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবে। ঐ ৭ টি রাজ্যে সেনাবাহিনীর দীর্ঘ উপস্থিতি রয়েছে। এ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে সৈন্য তথা অস্থানীয় নাগরিকদের মৃত্যুর খবর প্রায়ই ছাপা হয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে নগরবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন রয়েছে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির। এক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনীর জন্য রসদ পাঠানো একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। ট্রানজিটের সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারত সেখানে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধসরঞ্জাম পাঠাতে পারে। এর ফলে ঐ অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে ভারতীয় রেল পরিবহনের উপর হামলা চালাতে পারে। যে কোনো স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য এটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার।

বাংলাদেশ এখন ভারত থেকে বিদ্যুৎ কেনার উদ্যোগ নিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর হয়, তাহলে বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হবে। ভারতের নিজের বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে। পশ্চিম বাংলায় 'লোডশেডিং' নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে ভারত থেকে বিদ্যুৎ কেনার কি যুক্তি থাকতে পারে? পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করে নিতে চাইছে। বিদ্যুতের ব্যাপারটিও যদি ভারতের হাতে আমরা তুলে দেই, তাহলে ভারত আরেকটি সুযোগ পাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার। আমরা তখন পরিপূর্ণভাবে ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হব।

৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে সামনে রেখে এসব আজ ভাবতে হবে। আমরা আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধীন অর্থনীতি নিয়ে টিকে থাকতে পারবো কিনা, এটা আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী আমাদের দুটো জিনিস শিখিয়েছে ঃ এক, সেনাবাহিনী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, এবং দুই, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সেনাবাহিনী ও জনগণ মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারে। নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি আরো সত্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে জাতির জন্ম হয়েছে, সেই জাতি কারো গোলামির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না, ৭ নভেম্বরের শিক্ষা এটাই।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের প্রেরণা

নাগরিক

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ৭ নভেম্বর এক তাৎপর্যমন্ডিত দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে জনগণের বিজয় এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। দেশে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত করে এদেশের মানুষ তাদের ঐক্যচেতনা এবং স্বাধীনতাপ্রীতির উজ্জ্বল পরিচয়ই তুলে ধরেছে। যে-কোন সম্প্রসারণবাদী অভিসন্ধি প্রতিরোধে এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এদেশের মানুষ কৃতসংকল্প, আত্ম ত্যাগে প্রস্তুত। ৭ নভেম্বরের বিজয় এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন তারই পরিচয়বাহী।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যেমন সংহত করতে হবে, তেমনি তা রক্ষা করতে হবে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে। জাতীয় সংহতি, ঐক্যচেতনা, এবং স্বাধীনতাপ্রীতি এ ব্যপারে বড় শক্তি। দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ, সচেতন এবং কৃতসংকল্প হলে তাদের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী ৭ নভেম্বরের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার ভেতর দিয়েও তা প্রমাণিত। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত করা, যে কোনো মূল্যে তা রক্ষা যেমন আমাদের দায়িত্ব তেমনি দেশ গঠন এবং সুখী সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যাৎ নির্মাণের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোও আমাদের অবশ্য কর্তব্য। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পতাকা সমুন্নত রেখে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং সুখী সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের সংগ্রামে সফল হতে পারলেই হবে প্রকৃত বিজয়।

স্বাধীনতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্যেই দরকার জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। এই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই এদেশের মানুষ দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছে স্বাধীনতা। স্বাধীন স্বদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা অবাধ আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যেই এদেশের মানুষ বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীনতা। বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রমনা, এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা যেমন কৃতসংকল্প, তেমনি

www.nagorikpathagar.org

গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায়ও সংকল্পবদ্ধ। দেশ গঠন, নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন এবং সুখীসমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেও তারা প্রস্তুত।

এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত হয়েছে। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে তারা হয়েছে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও রোগ-ব্যাধির শিকার। স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত এ দেশের মানুষ স্বাধীন ও অবাধ আত্মবিকাশ এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ থেকেও হয়েছে বঞ্চিত। স্বাধীনতা তাদের এনে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভাগ্যোন্নয়ন এবং সুখী সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুযোগ। আমাদের দেশ নানা সম্পদে সমৃদ্ধ. এদেশে রয়েছে বিপুল প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ। দেশের জনশক্তিও এই সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন। এই লক্ষ্য হাসিল করতে হলে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পতাকা সমুন্নত রেখে, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে, অব্যাহতভাবে লড়াই করে যেতে হবে, দারিদ্র্য নিরক্ষরতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে। শোষণ-বঞ্চনামুক্ত এক উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে প্রত্যেককে।

৭ নভেম্বর জাতির সংহত সত্তার প্রতীক। এই ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দিনের রয়েছে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা। সেই প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন এবং সর্বতোভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গত তিন বছরে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। দেশ গঠন ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে চলেছে অব্যাহত কর্মপ্রচেষ্টা। কিন্তু এতেই সন্তুষ্টিবোধ করার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টা অবশ্যই আরও ব্যাপক এবং জোরদার করতে হবে। সরকার যেসব উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়েছেন, এবং ভবিষ্যতে আরও নেবেন—সেসবের সফল বাস্তবায়নের ওপর দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। জনগণই সব শক্তির উৎস, এবং তাদের সহযোগিতা ও সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায়, জনগণের সহযোগিতায় সবক্ষেত্রের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলেই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ, মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সহায়ক। সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ইতিমধ্যেই গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া দেশে শুরু হয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘোষণা করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়েই দেশে

www.nagorikpathagar.org

পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই পটভূমিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে তোলার আবশ্যকতা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। জাতির সংহতি সত্তার প্রতীক ৭ নভেম্বর এবার এসেছে এমন এক সময়ে যখন জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা অপরীহার্য হয়ে উঠেছে। স্বাধীন স্বদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ আত্মবিশ্বাস এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। এর সপক্ষেই সবার দৃঢ়প্রত্যয় ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত করা, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও অব্যাহত কর্মপ্রয়াসে উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মোচন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সরকার ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব এই দায়িত্ব পালন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন উৎপাদন বাড়ানো। অর্থনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা। দেশে উৎপাদন যত বাড়বে, সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের পথও তত প্রশস্ত হবে। উৎপাদন বাড়ানো, এবং সম্পদ বৃদ্ধিই অবশ্য যথেষ্ট নয়। এই সম্পদ যাতে পাচার হতে না পারে, জনগণের ভোগে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে লাগে, তাও নিশ্চিত করা দরকার। সরকার ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব দেশের সম্পদ পাচার রোধ, চোরাচালান বন্ধ করা, এবং মওজুদদার ও মুনাফাখোরদের তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া। দেশের সম্পদ রক্ষা, অবৈধ পন্থায় বিত্তশালী হওয়ার পথ বন্ধ করা, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই তা অপরিহার্য।

চোরাচালানী, মওজুদদার মুনাফাখোর এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির অন্যমত প্রধান কারণ, দ্রব্যমূল্যের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জনসাধারণের জন্যে দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। দ্রব্যমুল্য কমাতে এবং স্থিতিশীল রাখতে হলে পণ্যের উৎপাদান, আমদানী ও সরবরাহ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি নস্যাৎ করতে হবে চোরাচালানী, মওজুদদার, মুনাফাখোর ও অসাধু ব্যবসায়ীদের তৎপরতা, তাদের সবরকম কারসাজি। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের ঐক্যচেতনা ও সংহতিবোধ নিয়ে দাঁড়াতে হবে সবরকম শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে। এই দিনটি শুধু স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংকল্পেই উদ্বুদ্ধ করে না, অধিকন্তু দেশ গঠন, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের সংগ্রাম চালানোর অনুপ্রেরণাও জোগায়। শোষণমুক্ত সমাজ গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সুখী সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হলে জাতিকে ঐক্য চেতনা নিয়ে অব্যাহতভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দৈনিক বাংলা ঃ ৭ নভেম্বর, ১৯৭৯

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের কিছু কথা

মোবায়েদুর রহমান

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-এর ইতিহাস মাত্র ৫ দিনের। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর। কারণ সাদা চোখে দেখলে দেখা যাবে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'কাউন্টার ক্যু'বা পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের এই দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এসে যায় চূড়ান্ত পরিণতি বা শেষ দৃশ্য। ৬ নভেম্বর মধ্যরাত অথবা ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহর। রাত একটার পর থেকে রাজধানীর সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে সশস্ত্র বাহিনীর হাজার হাজার জোয়ান। বিজয় উল্লাসে উন্মুক্ত আকাশে গর্জে ওঠে তাদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও স্টেনগান। তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য রজনীর তৃতীয় প্রহর থেকে মহানগরীর রাজপথে নেমে আসে লাখ লাখ মানুষ।

একটি জাতির জীবনে মাত্র পাঁচ দিনে কি এমন কিছু ঘটতে পারে যা পরবর্তীকালে সমগ্র জাতির পথের দিশা হয়ে থাকে? না, পারে না। মাত্র পাঁচ দিনে যা ঘটে তা শুধুমাত্র পাঁচ দিনের কাহিনীই নয়, আসলে ঐ পাঁচ দিনে যা ঘটেছে তা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ও বদ্ধ দুয়ার ভেঙ্গে মুক্ত আলো-হাওয়াকে আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাস। এই বিষ্ফোরণ ও আলিঙ্গনকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদেরকে পেছনে ফিরে যেতে হবে। যেতে হবে ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বিবরণ ও ঘটনার পেছনের ঘটনায়।

বঙ্গভবনের উপর মিগ-২১ জঙ্গী বিমানের চক্কর

এ পর্যন্ত প্রকাশিত জানা কাহিনী ও অপ্রকাশিত অজানা কাহিনী থেকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার সেটা মেনে নিতে পারেননি। এদের নেতা হিসেবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রকাশ্যে পরিচিতি লাভ করলেও নেপথ্যে চালিকাশক্তি হিসেবে ছিলেন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল। ইনি পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে প্রমোশন

www.nagorikpathagar.org

লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অনেক পরে তার অবসর যাপনকালে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। তিনি ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শক্তিশালী পদটি ব্যবহার করেন। অভিযোগ ওঠে যে, সামরিক বাহিনীর মধ্যে ১৫ আগস্টের মুজিববিরোধী বিদ্রোহীরা 'চেইন অব কমান্ড' লংঘন করেছে।

উল্লেখ্য যে, আগস্টের পটপরিবর্তনকে সমর্থন করেছিলেন সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রধানরা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনীর তিন প্রধান, বিডিআর ও পুলিশ প্রধান। সকলেই প্রচার মাধ্যমে এসে ঐ পরিবর্তনকে সমর্থন প্রদান করেন। বস্তুত একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের খবর ১৯৭৫ সালের ১৭ অক্টোবর থেকেই উচ্চ পর্যায়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। এমনকি পাল্টা অভ্যুত্থানের দু'দিন পূর্বে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মরহুম জেনারেল ওসমানী ও তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে এই কথা জানান হলে তারা তা বিশ্বাস করেননি।

খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল ও কর্নেল হুদার নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে ৩ নভেম্বর রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে ঢাকা বিগ্রেডের পদাতিক সৈন্যদের একটি অংশ বঙ্গভবন ঘিরে ফেলে। ৩ নভেম্বর সকালে রেডিও'র সংবাদ বুলেটিন প্রচারে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে। সংশ্লিষ্ট সকলে যখন রেডিও বাংলাদেশের নীরবতায় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত তখন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি রুশ মিগ-২১ 'জঙ্গী বিমান (তখন সাকুল্যে জঙ্গী বিমান ছিলো ১২টি) ঢাকার আকাশে উড্ডয়ন করে এবং বারবার বঙ্গভবনের উপর চক্কর দিতে থাকে। পরবর্তীকালে জানা যায় যে, স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত এই বিমান চালনা করেন। উদ্দেশ্য বিমান দিয়ে সাঁজোয়া বাহিনীকে ভয় দেখানো এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

৩ নভেম্বর থেকে ৫ নভেম্বর ঃ সরকারবিহীন বাংলাদেশ

৩ নভেম্বর বেলা ১০টার মধ্যেই ঢাকার সচেতন মানুষের মধ্যে এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে এবং তারা দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছেন। ট্যাংক রেজিমেন্টের অফিসার কর্নেল ফারুকুর রহমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থানরত রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্ভাব্য মোকাবিলার জন্য পজিশন নেন। বিমান বাহিনীর তৎকালীন প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এমজি তোয়াব এবং তৎকালীন নৌ-বাহিনী প্রধানের মধ্যস্ততায় দেশ এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে বেঁচে যায় এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বিশেষ বিমানযোগে আগস্ট পট-পরিবর্তনের অফিসাররা ৪ নভেম্বর ব্যাংকক অবতরণ করে। এই অচলাবস্থার কারণেই ৩ নভেম্বর ক্ষমতা গ্রহণের পরেও পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর পদে বহাল থাকেন। এবং খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট থেকে যান।

www.nagorikpathagar.org

১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রমোশন পান এবং নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধানরূপে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করায় তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ জেনারেল জিয়াকে ৪ নভেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

জনাব রাশেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ঢাকার রাস্তায় মিছিল করেন। এই মিছিল থেকে 'জয়বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান উচ্চারিত হয়। আওয়ামী লীগারদের মিছিলের পুরোভাগে রাশেদ মোশাররফের সাথে তার মাতাও শামিল হন। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় আওয়ামী লীগারদের এই আনন্দ মিছিলের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জনগণ ধরে নেয় যে, খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পুনর্দখল করেছে। ইত্তেফাকের মাধ্যমে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। শুধুমাত্র দৈনিক ইত্তেফাকের মাধ্যমে নয়, ৩ নভেম্বরের পরবর্তী ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে বাতাসের আগে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, ৩ নভেম্বর প্রো-ইন্ডিয়া ক্যু হয়েছে। ইত্যবসরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জনগণ এবং সেনাবাহিনীর নিকট প্রচারপত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমে এই অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার উদাত্ত আহ্বান জানায়। ৪ নভেম্বর রাতে এবং ৫ নভেম্বর প্রাতঃকালে প্রচারিত বিবিসি'র সংবাদ বুলেটিনে এই অভ্যুত্থানকে ভারতপন্থীদের ক্ষমতা দখল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এসব কিছুর সম্মিলিত ফল হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ৫ নভেম্বর রাত ১০ টার পর থেকেই বিভিন্ন চ্যানেলে ঢাকায় খবর আসতে থাকে যে কুমিল্লা, বগুড়া প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরা ঢাকা অভিমুখে মার্চ করছে। ৬ নভেম্বর কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে খবর এসে পৌঁছে যে, কয়েকটি সেনাছাউনি থেকে জোয়ানরা হাতিয়ারসহ ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে। ৩ নভেম্বর ক্ষমতা দখল এবং ৪ নভেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ সত্ত্বেও ঢাকা এবং মফস্বলের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ সিপাহী এবং সামরিক ছাউনির বাইরে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী আধিপত্যবাদ বিরোধী জনতার প্রবল তৎপরতার মুখে খালেদ মোশাররফ কোনো সরকার গঠন করতে পারেনি।

৬ নভেম্বরের মধ্যরাত থেকে

এই সমস্ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক নীট ফলাফল হিসেবে রাজধানী ঢাকায় ৬ নভেম্বর মধ্যরাত অযুত কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবর' ও 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে বিদীর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে স্মরণকালের ইতিহাসে তিনবার সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা পাওয়া যায়। একটি ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহ; দ্বিতীয়টি হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অংশগ্রহণ। আর তৃতীয়টি হলো

www.nagorikpathagar.org

১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বরের মধ্যরাতের বিদ্রোহ; ঢাকার সিপাহীরা খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিলের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের সাথে যোগ দেয় বগুড়া ও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরা। বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে নিহত হন মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা, মেজর হায়দারসহ বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার। ঢাকা গ্যারিসনের, দুর্ধর্ষ বাহিনী নবম ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে একদল সিপাহী ও অফিসার বন্দিদশা থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করেন। হাজার হাজার সিপাহী বিজয় ও আনন্দ উল্লাস প্রকাশের জন্য সারারাত ধরে আকাশে ফাঁকা গুলী ছোঁড়েন। ৭ নভেম্বর সকাল থেকে ঢাকার রাজপথ একদিকে লক্ষ জনতার পদভার ও অন্যদিকে সেনাবাহিনীর ভারী যানবাহন ও ট্যাংকের বারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

৭ নভেম্বরের তাৎপর্য

আমাদের জাতীয় জীবনে ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুগভীর ও সীমাহীন। যেসব ক্ষেত্রে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সংহতি দিবস জাতীয় শ্লোগান হিসেবে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি পুনর্বার সমুন্নত করে।

(২) ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর বিপ্লবের নায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান ইতিপূর্বে নির্ধারিত বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করেন যার মূল স্তম্ভ ছিলো জাতীয় ঐতিহ্য এবং ধর্মবোধ।

(৩) ৭ নভেম্বরের প্রধান চালিকাশক্তি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান '৭২ সালে প্রণীত প্রধান দু'টি সাংবিধানিক মূলনীতি—সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করেন। এই দু'টি মূলনীতির স্থলাভিষিক্ত হয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য।

(৪) বাকশাল বিলোপ করে যে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী সরকার সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করেন।

(৫) ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী সরকার রক্ষীবাহিনী বিলোপের সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখেন।

(৬) পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দিল্লী-মস্কো অক্ষশক্তি পাখার তলে বেঁধে ফেলা হয়েছিলো। পরবর্তী সরকার চীন, পাকিস্তান ও সৌদী আরবের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী সরকার ঐ দিগন্তকে আরও সম্প্রসারিত করে সমগ্র মুসলিম জাহান ও পশ্চিমা দুনিয়া পর্যন্ত তা বিস্তৃত করে।

(৭) বৃহৎ শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানা সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে ঢালাও জাতীয়করণ করে যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ জন্ম দেয়া হয় তার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে ৭ নভেম্বরের বিপ্লবী সরকারই সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলেন।

www.nagorikpathagar.org

মুক্তির মিছিলে ৭ নবেম্বর

ড. নজরুল ইসলাম

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই সব দেশে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যায় না। কিছুসংখ্যক মানুষ, কতিপয় রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই সব ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর যতই চেষ্টা করুন না কেন, দেশের ইতিহাসে সেই ঘটনা ও দিন নিজস্ব গরিমায় ভাস্বর হয়েই থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনেও দেশের গণমানুষের নিকট ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতা সৃষ্ট ইতিহাস তেমনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যেভাবে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার আনন্দে মেতে উঠেছিল, ঠিক তেমনিভাবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর উপমহাদেশের আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক আওয়ামী বাকশালী শাসকদের হাতে পুনরায় নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনামুক্ত হওয়ার আনন্দে দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ আবার রাস্তায় নেমেছিল।

৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবকে অনুধাবন করতে হলে এর পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় আনতে হবে। এ কথা সবাই জানেন যে, ১৯৭৫ সালে বাকশাল নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে একদলীয় বাকশাল সরকারের পতন ঘটে। এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। একই সাথে তার স্ত্রী, ভাই, তিন পুত্র, দুই পুত্রবধুসহ কয়েকজন নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে আওয়ামী-বাকশাল মন্ত্রীরা।

খন্দকার মোশতাক সামরিক শাসন জারি করলেও তার মন্ত্রিসভায় সামরিক বাহিনীর কোন লোক ছিল না এবং তিনি প্রশাসনের কোন পর্যায়েই সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেননি। পার্লামেন্ট অটুট ছিল এবং পার্লামেন্টের স্পীকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল।

www.nagorikpathagar.org

১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাককে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ এবং তিনি বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। সত্যিকার অর্থে সামরিক শাসন শুরু করেন বিচারপতি সায়েম। কারণ, তিনি ডেপুটি সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তিন বাহিনী প্রধানকে নিয়োগ করেন। কিন্তু এই পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল ক্ষণস্থায়ী। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ পরাভূত ও নিহত হন। জেনারেল খালেদ মোশাররফ ছিলেন একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে কে ফোর্স-এর অধিনায়ক। ব্যক্তিগতভাবে খালেদ মোশাররফের এই ধরনের পরিণতি অনেকের নিকট বেদনাদায়ক হলেও ৭ নভেম্বর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে তিনি জনগণের আবেগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীর সকল স্তর, বিশেষ করে সিপাহীদের আবেগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। দেশের জনগণ বাকশালী দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ৩ নভেম্বরের পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান মানুষকে পুনরায় বাকশালী শাসনের যাতাকালে পিষ্ট হওয়ার আশংকায় আতঙ্কিত করেছিল। যে কারণে ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব পরবর্তী সময়ে তাদের সমর্থনে ঢাকার রাস্তায় লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল। আনন্দে আত্মহারা লাখো মানুষ হাজির হয়েছিল সেদিনের জুমার জামাতে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া জানিয়েছিল, পুনরায় বাকশালী শাসনে আবদ্ধ হওয়ার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে।

৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিবেচনায় নয়, একজন সাধারণ মানুষ যিনি ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন না, তিনি কেন সিপাহী-জনতার বিপ্লবে শামিল হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

৭ নভেম্বরের সফল সিপাহী-জনতার বিপ্লবে লাখো মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কেন রাস্তায় নেমেছিল এবং আল্লাহর নিকট শুকিয়া আদায় করেছিল, তা অনুধাবন করার জন্য বিশ্লেষণ করতে হবে। শেখ মুজিবের আওয়ামী-বাকশাল শাসনামলে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং একজন ব্যক্তি মানুষের জীবনযাপন ও নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব চিত্র।

শেখ মুজিবের শাসনামলে বাংলাদেশের অবস্থা কেমন ছিল তা অনুধাবন করার জন্য বেশী গবেষণার প্রয়োজন নেই। শেখ মুজিবের বাকশালী পার্লামেন্টের স্পীকার ও তৎপরবর্তী আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল, খন্দকার মোশতাকের দূত হয়ে লন্ডন গিয়ে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি

www.nagorikpathagar.org

পেয়েছে।' আমার ধারণা তৎকালীন আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীই শেখ মুজিব ও শেখ মুজিবের শাসনামল সম্পর্কে আব্দুল মালেক উকিলের মুল্যায়নের সাথে একমত ছিলেন। যদি তাই না হত, তাহলে কিভাবে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি বানাতে পেরেছিল। শেখ মুজিবের পর্লামেন্টের স্পীকার ও তৎপরবর্তী আওয়ামী লীগের সভাপতি যদি বলতে পারেন শেখ মুজিবের মৃত্যুতে দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাহলে অনুমান করা যায় সাধারণ মানুষের অবস্থা কি ছিল এবং কেনই বা তারা সিপাহী-জনতার বিপ্লবকে সমর্থন করে রাস্তায় নেমেছিল।

শেখ মুজিবের শাসনামল কেমন ছিল তা বোঝার জন্য শেখ মুজিবের কতিপয় উক্তি মূল্যায়নের নির্ণয়ক হতে পারে। যেমন—আওয়ামী-বাকশালী নেতা-কর্মীদের লুটপাট, চুরি-চামারীতে অতিষ্ট হয়ে শেখ মুজিব বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'সকল দেশ পায় সোনার খনি, আর আমি পাইছি চোরের খনি।' তাঁকে বলতে হয়েছিল, 'বিদেশ থেকে যা কিছু ভিক্ষা করে আনি চাটার দল সব খেয়ে ফেলে।' তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'সাত কোটি মানুষের জন্য সাত কোটি কম্বল এল, কিন্তু আমারটা কই।'

এবার দেখা যাক শেখ হাসিনা মন্ত্রী-সভার সদস্য ও তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি আসম রব শেখ মুজিব শাসনামলকে কিভাবে চিত্রায়িত করেছিলেন। জনাব রব ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে বলেছিলেন, 'মুজিব—তুমি বলেছিলে স্বাধীনতার পর এ দেশে কোন লোক না খেয়ে মরবে না, কিন্তু আজ খাদ্যের অভাবে লোক মারা যাচ্ছে। সরকারের মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারী ও চোরাচালানে লিপ্ত। দেশে একদিকে বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে, অন্যদিকে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো হচ্ছে, তাদের উপর চালানো হচ্ছে অমানুষিক নির্যাতন। পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার চালাচ্ছে দমন নীতি। আওয়ামী লীগের শাসকরা পাকিস্তানী শাসকদের তুলনায় বেশী দুর্নীতিবাজ।' জনাব রব দুর্নীতিবাজ মন্ত্রিসভা ও দুর্নীতিবাজ আমলাদের বহিস্কার ও গ্রেফতার দাবী করেন।

এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস তাঁর Bangladesh ; A Legacy of Blood বইতে আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশের সমাজচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের শহর, বন্দর, গ্রাম, হাট-বাজারে অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে লুটপাট চালাতো ও মানুষ খুন করত। লুটপাটের তালিকায় কোন কিছুই বাদ যেত না। নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার থেকে শুরু করে বাজারের মাছ, ডিম, তরকারি পর্যন্ত লুট করা হত। চোরাই গাড়ীর নম্বর প্লেট ঢেকে রাইফেল ও স্টেনগান হাতে সন্ত্রাসীরা মানুষের বাড়ীতে হানা দিত। তাদের দাবী না মানলে রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুনরায় হাজির হত।'

www.nagorikpathagar.org

শেখ মুজিব আমলের দুর্নীতি সম্পর্কে ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন, 'পৃথিবীর কোন কোন দেশে দুর্নীতি থাকলেও পৃথিবীর কোন দেশেই তার জন্মলগ্ন থেকে এই ধরনের দুর্নীতি দেখেনি। যেখানে সামান্য লাভের সম্ভাবনা সেখানেই প্লেগ ও পঙ্গপালের মত দুর্নীতিবাজরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও আমলারা দুর্নীতিতে জড়িত ছিল। সরকারী দলের লোক ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চোরাকারবার ও কালোবাজারী করত।'

ম্যাসকারেনহাস আরও লিখেছেন, 'মুজিবের আমলে গণভবন ছিল মুঘল দরবারের মত। এই দরবারে দলে দলে লোক আসতো, আসতো মোসাহেবরা। তারা শেখ মুজিবের গলায় পরাতো ফুলের মালা, কেউ পা ছুঁয়ে কদমবুচি করত, কেউ কাঁদতো, আবার কেউ কেউ মুজিবের নামে গান গাইতো। অনেকে আসতো চাকরির ব্যবসা বা অন্যান্য তদবিরের কাগজ নিয়ে। মুজিব তাদের হাত থেকে দরখাস্ত নিতেন। পিঠ চাপড়িয়ে বা গাল টিপে আদর করে বলতেন, 'যা আমি দেখব। কিন্তু এই পর্যন্তই। তিনি কিছুই করতেন না কিন্তু সকলকে আশ্বাস দিতেন।' মুজিবুর রহমান মারা যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের সমর্থক সাংবাদিক এ বি এম মুসা ম্যাসকারেনহাসকে বলেছিলেন, 'He (mujib) promised everything and betrayed everyone.'

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক বাকশাল শাসনের দিকে। বাকশাল শাসন মানুষের মৌলিক অধিকারকে কিভাবে হরণ করেছিল তার বয়ান রয়েছে বাকশাল শাসনের জন্য আনীত সংবিধানের ৪র্থ সংশোনী ও অন্যান্য বিধি-বিধানে। নিম্নে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ

১. **বাকশাল ও সংবাদপত্র ঃ** বাকশালী ব্যস্থায় ৪টি বাদে দেশের সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়। এই পত্রিকা ৪টিকে জাতীয়করণ বা সরকারীকরণ করা হয় এবং পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের জোরপূর্বক বাকশালে যোগদান করান হয়। জোরপূর্বক এ কারণে যে, বাকশাল সদস্য না হলে কোন সম্পাদক ও সাংবাদিক পত্রিকায় চাকরি করতে পারবে না বিধায় তারা বাকশালে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল। এই ৪টি পত্রিকা বাদে অন্য কোন পত্রিকা, সাময়িকী, বুলেটিন, লিফলেট প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। মোটকথা মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণ করা হয়। যে ৪টি পত্রিকা রাখা হয় সেগুলোকে পত্রিকা না বলে বাকশালের মুখপাত্র ও মুজিব বন্দনার কাগজ বলাটাই শ্রেয় ছিল।

২. **বাকশাল ও রাজনৈতিক অধিকার ঃ** বাকশাল ব্যবস্থায় দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন, সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক যারা সংসদ সদস্য হয়েছিলেন তাদের জন্য বিধান করা হয় যে, বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে সকলেই সংসদ সদস্যপদ হারাবেন। তবে বাকশালে যোগদান

www.nagorikpathagar.org

করলে সদস্যপদ পুনরায় বহাল থাকবে। অর্থাৎ বাকশালে যোগদান না-করলে কেউ সংসদ সদস্য থাকবেন না। বাকশালে যোগদান না-করার কারণে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সংসদ সদস্যপদ হারান। বাকশাল দলে ইচ্ছা করলেও কেউ যোগদান করতে পারত না। কারণ, বাকশাল ব্যবস্থায় বিধান রাখা হয় যে, শেখ মুজিবের অনুমতি ছাড়া কেউ বাকশাল সদস্য হতে পারবেন না। এ থেকে বলা যায় যে, বাকশাল ব্যবস্থায় মানুষের রাজনৈতিক অধিকারই শুধু হরণ করা হয়নি, এই অধিকারকে এক ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করে ফেলা হয়।

৩. বাকশাল সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ঃ বাকশাল শাসনামলে দেশের সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, রক্ষী বাহিনী ও আনসার বাহিনীর সকল অফিসার এবং সদস্যদের বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এইসব বাহিনী প্রধানদের বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। এ যোগদানও ছিল বাধ্যতামূলক। কারণ, বাকশালে যোগদান না করলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হত।

৪. বাকশাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যেসব শিক্ষক বাকশালে যোগদান করবে না তাদের চাকরিচ্যুত করা হবে। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বানানো হয়।

৫. বাকশাল ও বিচার ব্যবস্থা ঃ বাকশাল শাসনের আওতায় দেশের উচ্চ-নিম্ন আদালতগুলোকে দেশের নির্বাহী প্রধান বা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। ১৯৭২-এর সংবিধানের ৯৫(১) ধারায় বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করিবেন ও প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনা করে অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ করিবেন।' ৪র্থ সংশোধনীতে এই ধারা পরিবর্তন করে বলা হয়, 'প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।' ১৯৭২-এর মূল সংবিধান অনুযায়ী বিচারকদের অপসারণ ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রমাণিত অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে একজন বিচারককে অপসারণ করতে হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন দরকার ছিল। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীতে একজন বিচারকের অপসারণ রাষ্ট্রপতির মর্জির উপর ন্যস্ত করা হয়। ৪র্থ সংশোধনীতে বলা হয়, 'অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি কারণ দর্শাও নোটিশ দিয়ে একজন বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারবেন।' বিচারপতি কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থন বা অভিযোগের সত্যতা যাচাই নয়—কারণদর্শানোর নোটিশ দিয়েই বিচারপতিকে অপসারণ—কি তুঘলকি শাসন। অবশ্য জেনারেল জিয়া এই তুঘলকি শাসনের অবসান ঘটান (The 2nd proclamation, order No. 1 of 1977, With effect from 1-12-77)। ১৯৭২-এর সংবিধানে (১০২-১) মানুষের মৌলিক অধিকার বলবৎ

www.nagorikpathagar.org

করার জন্য নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা হাই কোর্টকে প্রদান করা হয়। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে হাই কোর্টের এই ক্ষমতা রহিত করা হয়। জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালে সামরিক ডিক্রিবলে হাই কোর্টের এই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন (2nd proclamation, order No 4 of 1976)।

শুধুমাত্র উচ্চ আদালত নয়, নিম্ন আদালতগুলোকেও তৎকালীন নির্বাহী প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি জেলা জজ ও বিচার ব্যবস্থায় নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী করবেন। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীতে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশ করার ক্ষমতাকে রহিত করা হয় (4th amendment act of 1975, article, 115)। জেনারেল জিয়াউর রহমান এক সামরিক ফরমান বলে সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা পুনরায় ফিরিয়ে দেন। (2nd proclamation order No. 4 of 1978)।

এর বাইরে ছিল কুখ্যাত বিশেষ ক্ষমতা আইন, যা এখনও বলবৎ রয়েছে। এই কুখ্যাত আইনে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। এমন একটি পরিস্থিতিতে সরকার বিরোধীদের দমন করার জন্য সমগ্র দেশ জুড়ে নামানো হয়েছিল রক্ষিবাহিনী, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ বিভিন্ন এলাকার আওয়ামী লীগ মন্ত্রী, এমপি, নেতা-কর্মীদের নিজস্ব বাহিনী। বর্তমানে দেশে এতগুলো পত্র-পত্রিকা, শক্তিশালী বিরোধী দল, স্বাধীন উচ্চ আদালত, দেশী-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন, নতুন বিশ্বব্যবস্থায় বর্তমানকালের আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস, চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হাট-ঘাট, বাজার-দোকান, ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি দখল ও বিরোধী দল দমনের যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে ১৯৭৫-পূর্ব আওয়ামী-বাকশালী শাসনের স্বরূপ কেমন ছিল।

১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনে মানুষ কেন প্রতিবাদ করেনি এবং ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লবে কেন দেশের লাখো জনতা রাস্তায় নেমেছিল এবং কেনইবা তাদের প্রিয় সেনাপতি জেনারেল জিয়াকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল—তার মর্মার্থ লুকিয়ে আছে ১৯৭৫ পূর্ব আওয়ামী-বাকশাল শাসনের কালো অধ্যায়ের মধ্যে। তাই তো দেখা যায়, ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে মানুষের মনে জমাট বেঁধেছিল শংকা ও ভয়ের কালো মেঘ। তাদের শংকা ও ভয় ছিল, আবার বাকশাল শাসন ফিরে আসে কিনা তাই নিয়ে। ৭ নভেম্বর মানুষ যখন জানতে পারল আওয়ামী-বাকশাল শাসনে বন্দী আশংকা সম্ভাবনা কেটে গেছ, তখনই তারা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের ন্যায় শামিল হয়েছিল সিপাহী-জনতার বিপ্লবের কাতারে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লব দেখে দেশের লাখ-লাখ মানুষ মসজিদে গিয়েছিল আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে। ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের মানুষের নিকট নিয়ে এসেছিল এক ধরনের ঈদের আনন্দ। আজকে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। কিন্তু সেটাই ছিল ৭ নভেম্বরের বাস্তবতা।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ৭ নভেম্বর

সিরাজুল হোসেন খান

সেই ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে যে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয়, তারই স্মরণ ও স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৬ সাল থেকে এ দিনটি 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' হিসেবে বাংলাদেশে পালিত হয়ে আসছে। ঐ সাল (১৯৭৬) থেকেই ৭ নভেম্বর পালিত হয় সরকারী ছুটির দিন হিসেবে। জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস নিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে দেশে কোন প্রকাশ্য বিতর্ক ছিল না, বিতর্ক ছিল প্রচ্ছন্ন। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ১৯৯৬-এর জুন মাসে। ঐ বছরও (১৯৯৬) ৭ নভেম্বর ছিল সরকারী ছুটির দিন। ১৯৯৭ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আদেশবলে ৭ নভেম্বর সরকারী ছুটির দিন বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ হাসিনা সরকার জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস প্রশ্নে একটি ভিন্নমত বা বিতর্ক প্রথম প্রকাশ্যে উত্থাপন করলেন। যা হোক, জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য নিয়ে যে কোন আলোচনা করতে গেলেই সর্বপ্রথমে তার পটভূমি স্মরণ করতে হয়। পটভূমিটি গড়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রার শুরু থেকেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ঢাকার রমনা রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। রেসকোর্সের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর কাছে আত্মসমর্পণ না- করে আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় সেনাপতি লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে। এমনকি, জেনারেল ওসমানী সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। কেন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, সে প্রশ্ন আজও জনমনে বিঁধে আছে এবং বলা যায়, সেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ওপর ভারতীয় আধিপত্যের ছায়া বিরাজ করে আসছে অথবা বিরাজ করার প্রয়াস পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৭২-এর জানুয়ারীর ১০ তারিখ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাবাস থেকে মুক্তি পেলে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করার পরপরই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, দল-মত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক পার্টির সাথে আলাপ-আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন। তদনুযায়ী ১১ জানুয়ারী আইনের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান সম্পন্ন করে তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে রাষ্ট্রপতির পদে

www.nagorikpathagar.org

বসান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে এবং নিজে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচক্ষণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বিবেচনায় জনমতের অনুকূলে তাঁর পদক্ষেপ সেখানে গিয়েই থেমে যায়। তিনি আর অগ্রগতি বা প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর পর চেপে বসে উপমহাদেশের শক্তিধর রুশ-ভারত মহল। ভারত-মার্কিন মহলের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা ছিল তখন অধিকতর প্রবল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের সঙ্গে যে মৈত্রী চুক্তি করে, তা ছিল মস্কো কর্তৃক একটি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ঘোষণা যে, রাশিয়া সে যুদ্ধে ভারতের পক্ষে প্রয়োজনানুযায়ী দাঁড়াবে। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত-মার্কিন মহলও একেবারে নিশ্চুপ বসে ছিল না। পাকিস্তানে, ভারতে এবং বাংলাদেশে তারাও ছিল সক্রিয়। বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী ভারতের মাঝে দ্বন্দ্ব এবং একইসঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে রুশ ও মার্কিন চক্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উপমহাদেশে যে উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির সৃষ্টি করে, তার মধ্যে মাথা উঁচু করে এবং মাথা ঠিক রেখে দাঁড়ানোর মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও শক্তি বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল না এবং ছিল না বলেই বাংলাদেশের ওপর সমূহ-বিপদ নেমে আসে এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারই দেশের জন্য একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে ওঠে। এ কথাটির আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যখন তাঁর পূর্বোক্ত ইচ্ছা বা অভিলাষ অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট সর্বদলীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা ও নতুন দেশ গড়ার কাজে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ কতে যাচ্ছিলেন, তখনই তার পূর্বে রুশ-ভারত চক্রের চাপাচাপিতে তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ভারতীয় ধনিক-বণিক শ্রেণীর হাতে তুলে দিতে এবং বাংলাদেশকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের জননেতা শেখ মুজিব দেশবাসীর কাছে বনে যান স্বৈরাচারী একনায়ক এবং আধিপত্যবাদী ভারতের কাছে মাথানত করে হয়ে যান তাদের তল্পীবাহক। জনগণের জন্য এটাই ছিল চরম দুর্ভাগ্য যে, তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের এমনি এক অসহনীয় পরিণতি দাঁড়াবে রাতারতি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার তার শাসন শুরুর কিছুকাল পর থেকেই শাসকদল আওয়ামী লীগ ও তাদের একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হয় রাজনৈতিক পদস্খলন এবং সেই পদস্খলন শেষপর্যন্ত একদলীয় বাকশালী রাজনীতি ও শাসনের মধ্যে দিয়ে হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক মরণ। ১৯৭৫-এর আগস্টের ১৫ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারসহ দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের মাসকয়েক পূর্বে ঘটেছিল সেই রাজনৈতিক মরণ।

আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক পদস্খলন থেকে রাজনৈতিক মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড় বয়ে যায়,

www.nagorikpathagar.org

তা ছিল অচিন্তনীয় এবং অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশের মানুষ ভাবতেও পারেনি, দু'দু'বার স্বাধীন হয়েও তাদের দুর্ভাগাই থেকে যেতে হবে। এককথায়, আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যায় এবং দেশটি এক অসহনীয় দুর্ভিক্ষের মুখে পতিত হয়ে ১৯৭৪ সালে ৫ লক্ষাধিক মানুষকে হারায়।

জিনিসপত্রের দাম হয়ে উঠে আকাশচুম্বি। এক সের লবণের দাম যখন হয় ৩০ টাকা থেকে ৯০ টাকা, তখন আওয়ামী লীগের জন্য সাধারণ মানুষের মুখে ছিল শুধু অভিসম্পাত। সর্বোপরি, আওয়ামী লীগ সরকারের অবর্ণনীয় দুঃশাসন, আওয়ামী লীগের লোকজনের দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্য, খুন-খারাবি-হাইজ্যাক, হত্যাকাণ্ড, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি সবকিছু মিলে বাংলাদেশকে রাতারাতি করে ফেলে একটা দুঃস্বপ্নের দেশ। এমনি অসহনীয় অবস্থার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যখন মানুষ সংগঠিত আকারে করতে থাকে, তখন চলে সরকারের 'রক্ষীবাহিনী' এবং সরকার দলীয় 'লালবাহিনী', 'নীলবাহিনী' ইত্যাদি কর্তৃক দেশময় হত্যাযজ্ঞ। তিন বছরে প্রায় ৩৭ হাজার বিভিন্ন বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে করা হয় হত্যা। তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রায় ৫ হাজার মানুষকে করা হয় বধ। এ পরিস্থিতিতে মুজিব সরকার যে চরম দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা সংক্ষেপে ছিল যে, ৬৪ টি মহকুমার (বর্তমানে জেলা) প্রতিটিতে একজন করে আওয়ামী লীগ দলীয় গভর্নর ও তার অধীনে বেশ কিছুসংখ্যক নরঘাতক 'রক্ষীবাহিনী' বসানো সম্পন্ন হয়। এ ব্যবস্থা স্পষ্টতই ছিল দেশময় একটা গণহত্যার আয়োজন। এমনি অবস্থায় যখন বাংলাদেশ এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন, তখনই ঘটে সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড।

স্মর্তব্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আচমকা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রেসিডেন্টরূপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার শীর্ষস্থানীয় সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদের নবগঠিত সরকারে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অনেক নেতা যোগদান করেন, দেশ তখন চলে সামরিক আইনের অধীনে। বলাবাহুল্য, শেখ মুজিব ও আওয়ামী বাকশালের পতনের পরও রুশ-ভারত মহল বাংলাদেশে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তাদের অনুসারীদের তারা গোপনে সক্রিয় করে তোলে।

এরই এক পর্যায়ে, প্রেসিডেন্ট হিসাবে মোশতাক আহমদের আড়াই মাস অবস্থানের পর ঐ বছর (১৯৭৫) পয়লা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশ বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মোশতাককে কার্যত ক্ষমতাহীন করে তাকে দিয়ে বিভিন্ন আদেশ জারি করে নেয়। এসব আদেশের মধ্যে একটি ছিল, খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেয়া। সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সে পদ থেকে অপসারিত করে করা হয় অন্তরীণ। পয়লা নভেম্বর খন্দকার মোশতাকের সভাপতিত্বে তার মন্ত্রিপরিষদের

www.nagorikpathagar.org

এক সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু ঐ মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্ত কোথাও প্রকাশ পায়নি। পরে জানা যায়, খালেদ মোশাররফদের পরিকল্পনা ছিল যে, খন্দকার মোশতাক আহমদকে দিয়ে একটি ঘোষণা জারি করাবেন, যার বলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মুজিব আমলের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের সূচনা করবেন। এ ধরনের একটি ঘোষণায় স্বাক্ষরদান করতে অস্বীকার করলে অন্য আরেকজন ব্রিগেডিয়ার খন্দকার মোশতাককে গুলী করতে উদ্যত হন। তখন বঙ্গভবনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত জেনারেল ওসমানী অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং সবাইকে শান্ত করেন। বঙ্গভবনে যখন এমনি এক টলটলায়মান উত্তপ্ত অবস্থা চলছে এবং যখন শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে জড়িত সেনাবাহিনীর অংশের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ দু-একদিনের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন এবং আওয়ামী বাকশালী রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন তাদের হাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপরোক্ত ৪ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে নিহত হন। তাদের মৃতদেহ ৪ নভেম্বর তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। ঐ ৪ নভেম্বর আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঢাকা শহরে ঘটে। ঐদিন আওয়ামী লীগের লোকজনের একটি মৌন শোক মিছিল ঢাকা শহরের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটিতে খালেদ মোশাররফের আত্মীয়-স্বজন অংশগ্রহণ করার ফলে জনমনে এবং সেনাবাহিনীর মাঝে এই ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে, খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে আওয়ামী বাকশালী রাজত্বের পুনরাগমন ঘটছে। এ থেকে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে, খন্দকার মোশতাকের স্থলে প্রেসিডেন্ট পদে কোন আওয়ামী লীগ নেতা বা কোন রাজনৈতিক নেতাকে বসানোর বদলে খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন করেন। প্রেসিডেন্ট মোশতাক তার দায়িত্বভার প্রধান বিচারপতির কাছে হস্তান্তরের ইচ্ছা ৫ নভেম্বর এক ঘোষণায় প্রকাশ করেন। বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৬ নভেম্বর এবং এক ঘোষণাবলে জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দেশে অবাধ সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানের পদে আসীন হলেও খালেদ মোশাররফের পক্ষে কোন আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠা করা যখন আর মোটেও সম্ভব ছিল না তখন তার সমর্থক ও রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের অনুসারী অধিকাংশ সেনাকর্মকর্তা তার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

খালেদ মোশাররফ এমনিভাবে দ্রুত সঙ্গী-সমর্থকহারা হয়ে পড়লে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরাটসংখ্যক সিপাহী ও অফিসারগণ মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ও

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তীকালে জাসদের প্রভাবশালী নেতা কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে খালেদ মোশাররফ গ্রুপের ওপর একটি সংগঠিত আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে ও তার কিছুসংখ্যক সাথীকে হত্যা করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পুনরায় সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেন।

পরদিন (৭ নভেম্বর) ভোরে ঢাকার রাজপথে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবিসহ ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিক যান নিয়ে উৎফুল্ল সিপাহী ও জনতার মিছিলের ঢল নামে। ঐ দিন ভোরে এক সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট সায়েম ঐদিন রাতে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদও এক সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে নির্দলীয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রধান বিচারপতি সায়েমের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণকে স্বাগত জানান।

আরও উল্লেখ্য, ৬-৭ নভেম্বরের উপরোক্ত ঘটনাবলীর পূর্বে সেনাবাহিনীর বিপ্লবী অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে ঢাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এ যোগাযোগ ছিল অতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং জনসাধারণের উদ্যম ও সাহসিকতায় ভরপুর। এই ছিল ৭ নভেম্বরের পটভূমি। এক্ষেত্রে মন্তব্য প্রয়োজন যে, সিপাহী-জনতার এই দেশপ্রেমিক অভ্যুত্থানের জন্য ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের ঐক্য ও সংহতিই ছিল যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মূলশক্তি তেমনি সেই একই সংহতির পুনরুত্থান ঘটে ৭ নভেম্বর। এই পুনরুত্থান অনিবার্য, অত্যাবশ্যকীয় ছিল এ কারণে যে, ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার মিলিত বিপ্লবী সংগ্রাম বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কাল মেঘমুক্ত করতঃ করে সংরক্ষিত। বলাবাহুল্য, ঐ ৭ নভেম্বর সংগ্রামী জনগণ ও সিপাহীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, বিপ্লবী ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি অর্জন না করলে বাংলাদেশের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদীদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল।

স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভারত ও পাকিস্তান যে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে সেই পরিস্থিতিতে ভূ-রাজনৈতিক কারণেই ভারতের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ওপর বরাবর তাদের আধিপত্যবাদী থাবা উদ্যত করে রেখেছে। উপমহাদেশের আঞ্চলিক রাজনীতির এ সত্য যারা চোখে দেখেও স্বীকার করে না, তারা প্রকৃতই জেগে ঘুমায় এবং তারা বাস্তবিক পক্ষেই আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের সেবায় নিয়োজিত। অন্য কথায়, যারা ৭ নভেম্বরকে 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' হিসেবে অস্বীকার করে, তারা আধিপত্যবাদের সেবাদাস হিসেবেই নিয়োজিত আছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ প্রতি ৭ নভেম্বর নতুন করে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের উদ্দীপ্ত দিন

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

এই স্বাধীন বাংলাদেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন, যাদের বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, তারা কেউ স্বচক্ষে দেখতে পারেননি যে, কি অমিত তেজ ও বিক্রমে এদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ-জনতা-সশস্ত্র বাহিনী এক কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে তাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি দিন ঃ ২৬ মার্চ ১৯৭১ এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫। বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ।

বাংলাদেশ ভূখন্ডের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই অঞ্চলের জনসাধারণ বরাবরই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং সকল রকম প্রতিকূলতার মধ্যদিয়েও তারা লড়াই করে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিই তাদের এই মনোভঙ্গি তৈরী করেছে। সমুদ্র উপকূলীয় বদ্বীপ বাংলাদেশ। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এখানে যখন বসতি গেড়েছিলেন, তখন প্রকৃতি ছিল আরও রূঢ়, আরও কঠোর, আরও ধ্বংসপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষের সাধ্য ও প্রযুক্তি বিকাশের স্তর ছিল আরও নিচে। ফলে সমুদ্র ফুঁসে উঠলে, নদীতে বান ডাকলে, প্রবল প্লাবন জনপদ ভাসিয়ে নিলে তার প্রতিরোধের সাধ্য ছিল সীমিত। আর প্রকৃতির এই বিপর্যয় ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু প্রকৃতির এই বিনাশী রোষের মুখেও আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ দুহাতে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন পরবর্তী প্রজন্মকে অর্থাৎ আমাদের প্র-পিতামহ-মাতামহদের। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন বলেই এই জনপদে এখনও মনুষ্যবসতি আছে। বসতবাড়ীর ধ্বংস্তূপের ওপর তারা নতুন করে সাজিয়েছিলেন সংসার। শস্যের জমিন ফুঁড়ে তুলে এনেছিলেন ক্ষুধার অন্ন।

এই জনপদে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা অবিরাম লড়াই করেছেন প্রতিকূল প্রকৃতি এবং আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে। সে লড়াইয়ে তারা বারবার জয়ী হয়েছেন। সাময়িকভাবে কখনও পিছিয়ে গেলেও সেটুকু পুষিয়ে নিয়েছেন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে। জীবিকার টানে, ভবিষ্যৎ

www.nagorikpathagar.org

বংশধরদের অন্ন-বস্ত্রের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা সকল বিপদ মাথায় নিয়েও ডিঙি ভাসিয়েছেন উত্তাল সমুদ্রে কিংবা প্রমত্তা নদীতে। কখনও বা বাণিজ্য তরী নিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন সমুদ্র অতিক্রম করে ভিন্ন কোন দেশে। নদীর নতুন চরের বিরান ভূমিতে বসতি গেড়ে কখনও বা ভেসে গেছেন বিপুল বন্যায়। কিন্তু কখনও পিছপা হননি আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা। অবিরাম জিতে-জিতে এসেছেন। সংগ্রামী চেতনা ও বিজয়ের গৌরব আমাদের দিয়েছে এদেশের মাটি ও প্রকৃতি—এই দুই আমাদের দিয়েছে শক্তি ও সাহস।

এই শক্তি ও সাহসে বলীয়ান জাতি ১৯৭১ সালে প্রতিরোধের যে-নজির স্থাপন করে, তা ছিল সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর, যখন সে সময়কার প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, শেখ মুজিবুর রহমান আত্মসমর্পণ করে চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তান। সে রকম অবস্থায় জনগণ নিজেরাই সংগঠিত হয়েছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘোষণার ওপর ভরসা করে।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে তাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি দিন ২৬ মার্চ ১৯৭১ এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী যখন এদেশের নিরস্ত্র-নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর হামলা চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছিল, তখন তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য কেউ ছিল না। তখন সম্পূর্ণ স্ব উদ্যোগে ২৬ মার্চ মেজর জিয়া (শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাথে-সাথে এ দেশের কোটি-কোটি মানুষের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় এবং তারা যে-যেখানে ছিলেন, স্ব-উদ্যোগে গড়ে তোলেন প্রতিরোধ ব্যূহ। স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যার যুদ্ধ-নেতৃত্বভাগেও ছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

আজ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই অবদানকে ছোট করার জন্য যাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন, তারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসকেই অস্বীকার করতে চাইছেন। এ সম্পর্কে বেশী বিতর্কে না গিয়ে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রথম বেতার ভাষণ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিলেও বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। মুজিব নগরে সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে ভাষণ দেন তাতে তিনি মেজর খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে বলেন, "সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের খালেদ মোশাররফকে আমরা সমর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিবাহিনী অসীম সাহস ও কৃতিত্বের সাথে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করছেন

www.nagorikpathagar.org

এবং শত্রু সেনাদের সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী শিগগিরই শত্রুকে নিঃশেষ করে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেছে।" (সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র--তৃতীয় খন্ড পৃঃ ৯)।

ঐ ভাষণেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মেজর জিয়া সম্পর্কে বলেন ঃ

"চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলার ভাই-বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রু মোকাবিলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাদের পাশে স্থান পাবে। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রম আজও শত্রুর কবলমুক্ত রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলাকে মুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (সূত্র পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০)।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে আরও বলেন ঃ

"..... আর একই সাথে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেড়ে নেয়া হাতিয়ার। এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। (সূত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০)।

অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাফল্য বর্ণনা করতে যেমন কুণ্ঠিত ছিলেন না, তেমনি তার সাফল্য স্ট্যালিনগ্রাদের সাফল্যের সাথে তুলনা করেছেন। একই সাথে তিনি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাকেই বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর।

মুক্তিযুদ্ধের এই স্বীকৃত ইতিহাসকে যারা অস্বীকার করতে চাইছেন, যারা কোন মেষ শাবককে পাম্প দিয়ে হাতি বানাতে চাইছেন, তারা আসলে ওই মেষ শাকবকে হত্যা করারই চেষ্টা করছেন।

মরহুম তাজউদ্দীনের ভাষায়ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। আর স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, কি অমিত তেজে ও বিক্রমে তিনি লড়াই করেছেন, তার সাফল্যের বর্ণনাও দিয়েছেন তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শহীদ জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার নয় মাস পর বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

www.nagorikpathagar.org

সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয়ের প্রেরণায় আমাদের ছিল অনেক স্বপ্ন অনেক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই ক্ষমতায় বসল যে আওয়ামী লীগ, তাদের মতলব ছিল ভিন্ন। তারা লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ফসল তুলে দিতে চাইল ভারতের হাতে। অস্বীকার করা যাবে না বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সে সাহায্যের উদ্দেশ্য মানবিক ছিল না। তা ছিল রাজনৈতিক।

বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানী দুঃশাসন-নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে একটি আত্মমর্যাদাবান জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। বাংলাদেশের সকল মানুষ যে পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরোধী ছিল তাও বলা যাবে না। কিন্তু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন রক্তপিপাসায় ঝাঁপিয়ে পড়ল এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর, চালালো বর্বর নির্যাতন, তখন এক রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিল এদেশের মানুষ। না আর নয়, আমরা স্বাধীনতা চাই। চাই না এই হিংস্র রক্তপিপাসু শোষকদের সাথে একত্রে বসবাস। শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর সম্ভবত সে কথা মনে রেখেই মরহুম তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর পুর্বোল্লিখিত ভাষণে বলেছিলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের ওপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

যাই হোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে আকাঙ্ক্ষা ছিল না ভারতের। ভারতের আকাঙ্ক্ষা ছিল পৃথিবীর মানচিত্রে একটি বিন্দুর মত ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশকে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আত্মীকরণ করে নেবে।

সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে দখল করার বিপদ বাংলাদেশের ভেতর থেকে যেমন ছিল তেমনি তার ছিল আন্তর্জাতিক বিপদও। সেজন্য নতুন বাংলাদেশ সরকারকে তারা যুদ্ধের সময়ই যেমন একটি দাসত্বের শৃংখল পরিয়ে দেয়, তেমনি নতুন সরকার পরিচালনায় তারা নিয়োগ করে উপদেষ্টামন্ডলী। এ ছাড়া ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই সম্পাদন করা হয় ভারত-বাংলাদেশ দাসত্ব চুক্তি। ভারতীয় এই আগ্রসন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখে তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কেড়ে নেয় মানুষের মৌলিক অধিকার, কেড়ে নেয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কেড়ে নেয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা। গঠন করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল। হাজার-হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা ও জেলবন্দী করা হয়। বাকশালী সরকারের নিয়ন্ত্রণে চারটি সংবাদপত্র রেখে অপর সকল সংবাদপত্র। অর্থাৎ বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভারতীয় করণের পথে যাতে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়, সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে এই অবস্থান গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেই শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ১৫ আগস্টের

www.nagorikpathagar.org

পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয় শেখ মুজিববিহীন আওয়ামী লীগই। এবং তারা জন আকাঙ্ক্ষিত অনুকূল কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ গ্রাসের ভারতীয় মূল পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ষড়যন্ত্র চলতে থাকে অব্যাহত গতিতেই। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই ঘটে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থান। সে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ পদচ্যুত হন। গৃহবন্দী হন সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিচারপতি সায়েম।

৩ থেকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত সারা দেশে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। খালেদ মোশাররফ যে ভারতীয় নীল নকশা অনুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৪ তারিখে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই রাশেদ মোশাররফের নেতৃত্বে শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে মিছিলের মাধ্যমে। যদিও রেডিও থেকে সকল মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ এ ধরনের ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও এ মিছিল করার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, মিছিল করলে তা মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগই করতে পারবে, অন্য কেউ নয়।

এই পরিস্থিতিও মেনে নেয়নি জনসাধারণ। মেনে নেয়নি দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী। পুনরায় ওই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য গোটা দেশ এক সাথে ফুঁসে ওঠে ৭ নভেম্বর সকালে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্ত করে আনেন জিয়াউর রহমানকে। মুক্ত করে আনেন, খোন্দকার মোশতাক আহমদকে। তাদের ছবি নিয়ে লাখো মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। জনতা-সিপাহী একাত্ম হয়ে শ্লোগান তোলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে—মোশতাক-জিয়ার পক্ষে। সে উৎসব চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ওই দিনের তুলনা করা হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর বিজয় দিবসের সাথে।

সিপাহী-জনতার সম্মিলিত প্রয়াসে আল্লাহর অসীম রহমতে রক্ষা পায় দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব। আর সে কারণে ৭ নভেম্বর হয়েছে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস।

আজ ২১ বছর পরে কূটকৌশলের নির্বাচনে* জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ সেই দিনটিকেই অস্বীকার করে বসেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি আর পররাষ্ট্র নীতিকে ইতিমধ্যেই ভারতের পরিপূরক করে ফেলেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে ফেলছে। ট্রানজিট, এশিয়ান হাইওয়ে ও বিদ্যুৎ আমদানির নামে বাংলাদেশকে ভারতের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করতে যাচ্ছে।

এই ষড়যন্ত্র রুখে দেবার জন্য ২৬ মার্চ আর ৭ নভেম্বরের চেতনায় জনসাধারণকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই হোক আমাদের আজকের শপথ।

---

* ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচন—সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ভাস্বর ৭ নভেম্বর

গাজীউল হাসান খান

ইতিহাসের কোনো কোনো ঘটনা অত্যন্ত সুখকর এবং গৌরবের। আবার কোনো কোনো ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়ক। কারও ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত পছন্দ-অপছন্দের কারণে বাস্তব কোনো ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না। ঢেকে দেয়া যায় না তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় ৭ নভেম্বর হচ্ছে তেমনই একটি ঘটনা যাকে কোনোদিনই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ আমাদের জাতির ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 'টার্নিং পয়েন্ট' এবং এ কথাও অনস্বীকার্য যে, এ ঘটনার জন্ম হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চরম ব্যর্থতার মাঝে।

আবার অনেকে বলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের এক চরম অরাজক ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় এবং নিদারুণ রাজনৈতিক শূন্যতার মাঝেই '৭৫-এর ৭ নভেম্বর 'সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তি সংগ্রামের পর নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যখন অর্থনৈতিক মুক্তিসহ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে দু'হাত বাড়িয়ে আছে তখন জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের উপর্যুপরি ব্যর্থতা তাদেরকে চরমভাবে হতাশ ও দিকনির্দেশহীন করে তুলেছিল। ঠিক তেমনি একটি দুঃসময়ে নেহায়েত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃত্ব ১৯৭২-এর প্রণীত সংবিধানকে সংশোধন করে '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারী এদেশে প্রতিষ্ঠা করে একটি একদলীয় শাসন। তারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করে গঠন করে বাকশাল (বাংলাদেশ-কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ)। সাথে সাথে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। চারটি জাতীয় দৈনিক রেখে দেশের বাকী সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন বিচার বিভাগকেও করা হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ।

এ ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক ঘটনার আকস্মিকতায় দেশের মৌলিক অধিকার হারানো সকল শ্রেণীর মানুষ বিক্ষুব্ধচিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে একটি মৃত্তিকা কাঁপানো পরিবর্তনের। দেশে দুর্ভিক্ষের রেশ তখনও কাটেনি। একদিকে অনাহারে

www.nagorikpathagar.org

বুভুক্ষু মানুষের মৃত্যু অপরদিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর জেল-জুলুম, সেই সাথে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতনে বিপন্ন হয়ে ওঠে সমগ্র দেশ ও জাতির অস্তিত্ব। ঠিক তেমনি একটি পরিস্থিতিতেই নেমে আসে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের সেই রাত্রি, যা এ দেশের ইতিহাসের তৎকালীন ঘটনাবলীকে বয়ে নিয়ে যায় এক ভিন্ন খাতে। তারপর এক ঐতিহাসিক নাটকের দৃশ্যপটের মতো অতিদ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এ দেশের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিত।

১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নিহত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদ। তার মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন সাবেক আওয়ামী লীগের (পরবর্তীকালে বাকশাল) অনেক প্রতিষ্ঠিত নেতা। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ২০ আগস্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক শাসন জারি করলেও তার কার্যকারিতা দেখিয়েছিলেন ১৫ আগস্ট থেকে। কিন্তু এর অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানে, অর্থাৎ ৩ নভেম্বরে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আরেক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন। সেই সাথে তিনি তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। স্বাধীনতার ঘোষক এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার গৃহবন্দী হওয়ার খবরে সেনাবাহিনী এবং দেশপ্রেমিক জনগণের মাঝে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৬ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তারই পরামর্শে বিচারপতি সায়েম এক ঘোষণাবলে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। এমতাবস্থায় তার জনসমর্থন ও রাষ্ট্রক্ষমতা সুসংহত ও নিঃসংশয় হবে বলে ভেবেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ। প্রয়োজন হলে বন্ধু দেশ থেকে সামরিক সাহায্য চাওয়ার মনোভাবও তিনি তার তৎকালীন অপর দুই উপসামরিক প্রশাসকের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন বলে শোনা যায়।

দেশপ্রেমিক জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর ব্যাপক অংশে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান কিংবা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়ার **বিরুদ্ধে তার কোনো** কর্মকাণ্ডকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। সেই পথ ধরেই ৭ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসের দেশপ্রেমিক জওয়ানদের মাঝে দেখা দিয়েছিল এক শক্তিশালী বিদ্রোহ। তারা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক এবং জনপ্রিয় জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে তাৎপর হয়ে উঠে। এ খবর রাজধানী ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে অগণিত মানুষ বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো ছুটতে শুরু করে সেনানিবাসের দিকে। এ অবস্থা মোকাবিলা করার মতো শক্তি কিংবা সাহস কোনটিই ছিল না খালেদ মোশাররফের । তাই সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যাবার পথে কয়েকজন সহকর্মীসহ

www.nagorikpathagar.org

অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণতি ঘটে তার। নিহত হন তারা। সিপাহী-জনতা গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করেন জিয়াকে।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী, সংকীর্ণমনা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিক এবং তাদের কিছু ঢাক পেটানো অনুসারী রয়েছে যারা প্রায়শই অভিযোগ করে থাকে যে, জিয়াউর রহমান এদেশে গণতন্ত্র হত্যা করেছেন এবং সামরিক শাসন জারি করেছেন। শহীদ জিয়া সম্পর্কে এ অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বার বার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিলেও সে শ্রেণীর মানুষ ক্ষান্ত হয়নি। এর অন্যমত প্রধান কারণ তাদের অতীতের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শহীদ জিয়া সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা আবশ্যক।

বাংলাদেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ এবং তথ্যাভিজ্ঞ মহল ভালো করেই জানেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে কারা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন।

৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার সেই নজিরবিহীন অভ্যুত্থানে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হবার পর জিয়াউর রহমান নিজের হাতে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে নিতে চাইলে তা অনায়াসে পারতেন। রবার্ট ব্রাইনিং-এর 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতায় বর্ণিত সে বীর পুরুষটি সেদিন যেমন আকাশের চাঁদ হাতে পেতে চাইলেও জনতা তা এনে দিতে সচেষ্ট হতো, তেমনি জিয়াউর রহমানও তখন সরাসরি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হতে চাইলে তা পাওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি তা না চেয়ে আগের মতো আবার উপ-সামরিক প্রশাসকের পদেই থেকে যান।

রাজনীতি কিংবা ইতিহাসে অদৃষ্টগত কিংবা দৈব পরম্পরের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তা বিতর্কসাপেক্ষ। তবে জাতির দুই মহাদুর্যোগময় মুহূর্তে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ছিল অলৌকিক ত্রাণকর্তার মতো। একাত্তরের ২৫ মার্চের পর সমগ্র জাতি যখন হয়ে পড়েছিল দিকনির্দেশনাহীন, তখন জিয়াই দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের ডাক। তাছাড়া '৭৫-এর ১৫ আগস্টে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর অর্থাৎ ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের উত্থান ছিল এ জাতির ইতিহাসে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা এদেশের ভবিষ্যতকে রক্ষা করেছে এক অশুভ রাহুগ্রাস থেকে।

৭ নভেম্বরের পর জনপ্রিয় জিয়া ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করা শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে এদেশে একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। সংবাদপত্র প্রকাশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ওপর বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করেন। তাছাড়া বাকশালী আইনে প্রণীত বিভিন্ন বিধি-বিধানের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে বিচার বিভাগকে যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল, জিয়াউর রহমন তার অবসান ঘটান। ১৫ আগস্ট থেকে খন্দকার মোশতাক কর্তৃক জারিকৃত সামরিক শাসন তিনি প্রত্যাহার করেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকল নর-নারীর ভোটাধিকারের ও বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছিলেন। প্রথমে জনগণের আস্থাভোটে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে জিয়াউর রহমান এদেশের রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন। জিয়া সুনিশ্চিত করেছিলেন জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার। পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমভূমি পর্যন্ত দেশের সকল মানুষের মাঝে একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করতে তিনি দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। শহীদ জিয়া প্রণীত ১৯ দফা আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী '৭৫-এর ১৫ আগস্ট-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে বিরাজিত সকল অবক্ষয় এবং স্থবিরতার মাঝে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন বয়ে আনে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষে যে দেশে খাদ্যের অভাবে প্রায় চার লাখ মানুষ মারা যায়, সেখানে শহীদ জিয়ার নেতৃত্ব বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চাল উৎপাদনে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে এবং বিদেশে কিছু চিনি রফতানীও শুরু করে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের জোয়ার অনুভূত হয় তাঁর শাসনামলে।

'৭৫-এর ৭ নভেম্বর এদেশের বীর সিপাহী-জনতা শুধু স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকেই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেনি, এদেশে পরিবর্তনের জন্য, উন্নয়নের জন্য সর্বোপরি এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন। ৭ নভেম্বর এবং এদেশের রাজনীতিতে শহীদ জিয়ার অভ্যুদয় যেন একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের জাতীয় জীবনে তাই ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব কোনো মতেই অস্বীকার করা যাবে না। ৭ নভেম্বর বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে এদেশের মুক্তিকামী জনতার অগ্রযাত্রায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ঃ স্বদেশ চেতনায় উদ্ভাসিত আলো

কাজী সিরাজ

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ চেতনার স্মৃতিতে উজ্জ্বল, অম্লান একটি অনন্য দিন। আধিপত্যবাদী হিংস্র হায়েনার আগ্রাসী 'ছোবল' থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার দিন হিসাবে যদি এ দিনটিকে মহিমান্বিত করা হয়, তা অতিরঞ্জিত কিছু হয় না। অনেক দেশপ্রেমিক মানুষ ৭ নভেম্বরকে বাংলাদেশের 'নতুন স্বাধীনতা দিবস' হিসাবেও চিত্রিত করতে চান। সেদিন ঢাকার রাজপথে যারা সিপাহী-জনতার অভূতপূর্ব মিলন মেলার দৃশ্য অবলোকন করেছেন, ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁদের অনেকে এখনও আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

এমন একটি দিনকে কলঙ্কিত করার হীন প্রয়াসে লিপ্ত ছিল বিগত আওয়ামী লীগ-সরকার। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসাবে দিনটি ছিল সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু ফাসিস্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে '৯৭ সাল থেকে সেই ছুটি বাতিল করে। শুধু তাই নয় ৭ নভেম্বরের গৌরবগাঁথাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এমন কোনো ঘৃণিত পথ নেই, যা বিগত লীগ সরকার অনুসরণ করেনি। কিন্তু অবিস্মরণীয় যে, মহৎ কর্ম এবং তার পুষ্পিত সৌরভ একটি জাতির অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, কোনো কুটিল চক্রান্ত অন্তরের সেই শিহরণকে স্পর্শ করতে পারে না।

কিছু পরদেশী-ক্রীতদাস বুদ্ধিজীবী ৭ নভেম্বরের চেতনা, গৌরব ও তার ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে 'কর্দমাক্ত' করার উদ্দেশ্যে কলমযুদ্ধ চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মুনতাসীর মামুন নামক একজন 'লীগ বুদ্ধিজীবী'সহ তার সমগোত্রীয়রা মিথ্যাশ্রয়ী কাহিনী ফেঁদে বারবার বলার চেষ্টা করেছে, ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সেই অভ্যুত্থান নাকি জনসমর্থিত ছিল না। তারা নাকি জনশূন্য রাজপথে শুধু কয়েকটি ট্যাঙ্ক ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। কি মিথ্যা ! কি নোংরামি ! অবশ্য, ভিনদেশী প্রভুর স্বার্থে মিথ্যার বেসাতি আর নোংরামি করা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়। এই কলমবাজ 'ক্রীতদাস'রা'৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত একটি নির্বাচিত, বৈধ ও গণতান্ত্রিক সরকারকে বিব্রত করার জন্য চূড়ান্ত নোংরামি করেছে।

www.nagorikpathagar.org

দিনাজপুরের এক হতভাগিনী ইয়াসমিনের ঘটনায় বেগম জিয়া সরকারকে জড়িয়ে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত, যে ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন সরকার বা সরকারি দলের কোন সংস্রবই ছিল না এবং যে ঘটনার ন্যায়ানুগ বিচার হয়েছে— দেশব্যাপী কি তোলপাড়ই না সৃষ্টি করেছিল তারা ! পাকিস্তান আর জিন্নাহর বন্দনায় শ' শ' কাব্যের রচয়িতা কবি সুফিয়া কামাল, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চাইতেও 'জগজিৎ সিংদের' অনুরাগে আত্মহারা ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম (পূর্ব নাম নীলিমা সেন), '৪৭-এর 'দেশ বিভাগ' ভুল ছিল বলে 'ফতোয়া' দানকারী কবীর চৌধুরীরা এখন অন্ধ আর 'কালা' হয়ে গেছেন। লীগ সরকারের আমলে ইয়াসমিনের মতো শ' শ' ঘটনায় তাদের বিবেকদংশিত হয়নি, খাটাশরা সরকারি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের দ্বারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনা দর্শন করেনি। তাদের সবার চোখে যেন 'ছানী' পড়েছিল। সীমা চৌধুরী ইয়াসমিনের মতোই পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হলো, নিরাপত্তা হেফাজতে মেয়েটি মরেও গেলো। প্রথম বিচারে অপরাধীদের কোন সাজাই হলো না। প্রবল গণচাপে সে ঘটনায় দ্বিতীয় পালায় বিচার চলছে এখন।

শুধু কি সীমা চৌধুরী ? সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ জেলায় তার ছাত্র সংগঠনের 'মর্দে মমিন' কালু আর গোফরান কর্তৃক ধর্ষিত হয় নার্গিস আর নাজনিন। বেতাগীতে ধর্ষিত হয় সুফিয়া। শুধু ধর্ষণ নয়, তার যৌনাঙ্গে গরু বাঁধার খুঁটি আর মারবেল ঢুকিয়ে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। বাঞ্ছারামপুরে নির্যাতিত হয় লাকি। চট্টগ্রামের নন্দনকাননে এক প্রকৌশলীর দু'কন্যাকে ধর্ষণ করে সরকারি দলের মস্তানরা। নবীগঞ্জের সুনীল সরকারের মেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল পিতার সামনে। রামগঞ্জ থানায় একজন শিক্ষিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল তার স্বামীর সম্মুখে। নোয়াখালীর সুধারামপুর থানার এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে আওয়ামী লীগ নেতা শরিয়ত মাস্টার। এ তালিকা অনেক দীর্ঘ। ১৯৯৬ সালে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৩শ'রও বেশি। '৯৭-এ এ সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ।

'৯৮ সালে তা ছিল আরো ভয়াবহ। শিশু তানিয়া, মৌসুমীরাও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি তাদের আমলে। কিন্তু সুফিয়া-নীলিমা, খুশি-মালেকা, কবীর-মুনতাসীর, মমতাজ-আবেদ খানরা এসব ঘটনায় ছিলেন নিশ্চুপ, নির্বিকার। তারা এসব দেখেননি তাদের চোখে তখন ছিল 'ঠুলি'। তাদের ক্ষমতা গ্রহণের আটাশ মাসেই দেশে খুন হয়েছিল শ' শ' আর ৫ বছরের শাসন আমলে খুন হয়েছে প্রায় ৩৭ হাজার মানুষ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যে ছেয়ে গিয়েছিল সমগ্র দেশ। আইনের রক্ষকদের কেউ কেউ তখন পালন করেছে ভক্ষকের ভূমিকা। নিরাপত্তা হেফাজতেও ছিল না মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু গ্যারান্টি। তুহিন, জুয়েল, বুবেল, আক্কাস, আকবরসহ পুলিশের হাতে মৃত্যুর তালিকাও ছিল বেশ দীর্ঘ। কোনো ব্যাপারেই ভারতপন্থী বলে চিহ্নিত এসব বুদ্ধিজীবীর বিবেক কথা বলেনি।

www.nagorikpathagar.org

এক কিশোরের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল ঃ 'ওদের বিবেক এখন 'ভ্যাকেশনে' আছে ভারতে।'

৭ নভেম্বরকেও তারা এ চোখেই দেখেছে, এই চোখেই দেখে। অথচ ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ছিল আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রক্ষার এক দুর্দমনীয়; সাহস-নন্দিত প্রয়াস। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান হয়তো সংঘটিত হত না, যদি তার আগে '৭৫-এর ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্ব সামরিক ক্যু-দেতা সংঘটিত না হত।

এ ব্যাপারে বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'বাংলাদেশ ঃ এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' থেকে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'মোশতাক আর মেজরদের উৎখাতের খবর শুনে আওয়ামী লীগার, ছাত্র এবং মুজিব সমর্থিত দলগুলো রাস্তায় নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার তারা মুজিব দিবস হিসাবে পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শহীদ মিনারসহ সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল বের হয় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।... তারপর ৭ নভেম্বর শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকসভার আয়োজন করা হয়। এসব কারণে জনগণের মনে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভ্যুত্থানের সূচনা করা হয় বলে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন জনগণ মুজিব শাসনামলের দুঃস্বপ্ন সবেমাত্র কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। পরন্তু ফারাক্কা বাঁধের জন্য তাদের মধ্যে ভারত-বিরোধী চেতনাও চরমে উঠেছিল। ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠানো হয় জেনারেল জিয়াকে আটক করার জন্য। তারা তার বাড়িকে সকল যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জিয়াকে হলঘরে আটকিয়ে রাখে, (গ্রন্থ -ঐ ঃ পৃষ্ঠা—১০৫)।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। পাকিস্তানী এককেন্দ্রীয় বিজাতীয় শাসক-শোষকদের শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসা স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ দিল্লীর দাসত্ব মানতে রাজি নয়। এই চেতনা শুধু জনগণের মধ্যেই নয়, ব্যারাকের সিপাহীদের মধ্যেও চাঙ্গা য়ে ওঠে। ৭ নভেম্বর তারই বহিঃপ্রকাশ।

৬ নভেম্বর দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম শপথ-গ্রহণ করেন। তিনি যখন খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ও তার নিজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ই পরিস্থিতি ক্ষমতা দখলকারীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জ্বলে ওঠে হান সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল। দেশপ্রেমিক জনগণও একাট্টা হয়ে যায়। সেই বিপ্লবী তরঙ্গ। ৬ নভেম্বর মধ্যরাতের পরই বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যায়। এই বিপ্লব প্রথমে একটা বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হচ্ছিল। জাসদ সমর্থিত কর্নেল (অব.) তাহেরের নেতৃত্বে গড়া 'বিপ্লবী সৈনিক সংঘ' স্লোগান তোলে—'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।'

www.nagorikpathagar.org

ম্যাসকারেনহাস তাঁর বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'এই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কা লাগে ১০ জন তরুণ আর্মি অফিসারের ওপর। ওরা তখন দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী ব্যারাকের কাছে একটি অফিসার্স মেসে অবস্থান করছিল। অফিসারদের একজনের 'ব্যাটম্যান' এই সময় বারান্দা দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'জীবন নিয়ে পালান।'

'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ট্যাংকের ওপর মানুষ ছুঁড়ে মারে পুষ্প-পাপড়ি। কেউ বা চড়ে বসে ট্যাংকে। সিপাহী-জনতা একে অপরের সঙ্গে করে কোলাকুলি। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।' 'অন্ধ'রা এসবের নাকি কিছু দেখেনি। অথচ এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস বলেছেন, 'উল্লসিত কিছু সৈনিক আর বেসামরিক লোক নিয়ে কতগুলো ট্যাংক ঢাকা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় চালাচল করতে দেখা যায়। এবার ওই ট্যাংক দেখে লোকজন ভয়ে না পালিয়ে ট্যাংকের সৈনিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। তিনদিন ধরে তারা মনে করেছিল, খালেদ মোশাররফকে দিয়ে ভারত তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খর্ব করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এতক্ষণে তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। জনতা সৈনিকদেরকে দেশের ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দিত করে। সর্বত্রই জওয়ান আর সাধারণ মানুষ খুশিতে একে অপরেরর সঙ্গে কোলাকুলি শুরু করে। রাস্তায় নেমে তারা রাতভর স্লোগান দিতে থাকে—আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ ইত্যাদি। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণের মতো জনমত আবার জেগে উঠেছে। এটা ছিল সত্যিই একটি স্মরণীয় রাত, (গ্রন্থ-ঐ, পৃষ্ঠা-১২২)

৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান দেশপ্রেমিক জনগণকে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-চেতনার ঐশীমন্ত্রে উজ্জীবিত, উদ্দীপ্ত করে। জাতীয় স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে আধিপত্যবাদী থাবার বিরুদ্ধে এক মহান জাতীয় ঐক্যের মজবুত ভিত রচনা করে। ৭ নভেম্বর স্বাধীনতাপ্রিয় সিপাহী-জনতার বিজয়ের এবং আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদার ও বশংবদদের পরাজয়ের দিন। তাই ওরা ৭ নভেম্বর ও সেদিনের চেতনাকে ভয় পায়। তারা ষড়যন্ত্র করেছে, এখনো করছে। কিন্তু যে মহান দিবস এবং বিপ্লব দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী জনগণের কাছে স্বদেশ-চেতনার উদ্ভাসিত আলো, তাকে চক্রান্তের চাদরে ঢাকা সাধ্য কার?

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ঃ ষড়যন্ত্র ও নাশকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম

শাহ্ আহমদ রেজা

চার বছর পর এবার ৭ নভেম্বর সরকারীভাবে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার দিনটিকে ছুটি ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সাল থেকে ৭ নভেম্বর এই সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাওয়ার পর। প্রথম বছরে সাহস না পেলেও আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে সরকারী ছুটি বাতিল করে দেয় এবং ৭ নভেম্বরকে "সৈনিক ও অফিসার হত্যা দিবস' হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। অন্যদিকে বিএনপিসহ দেশপ্রেমিক সকল দল ও সংগঠন দিনটিকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-এর সম্মান দিয়ে উদযাপন করতে থাকে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭ নভেম্বরকে আবারও সরকারীভাবে সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ৭ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান কোন বিচ্ছিন্ন বা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। এর কারণ জানতে হলে আমাদের ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ফিরে যেতে হবে। আলোচনায় আনতে হবে ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীকে। দেশ কাঁপানো সেই পাঁচটি মাত্র দিনের প্রথম পর্যায়ে একটি চিহ্নিত মহলের উদ্যোগে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন ও ধ্বংস করার ভয়ংকর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনীর মিলিত প্রতিরোধে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র ও আয়োজন।

ঘটনাপ্রবাহের সূচনা করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। '৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করেন। একই সাথে তিনি নিজে পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের পদটি দখল করে বসেন। সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানোর পর ৬ নভেম্বর তিনি বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ পদত্যাগ করেন এবং তার মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। খালেদ মোশাররফ প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্তি দেন এবং প্রেসিডেন্ট সায়েম জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন।

www.nagorikpathagar.org

যে কোন ব্যাখ্যায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সকল কর্মকাণ্ড ছিল অবৈধ, ক্ষমতাও তিনি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দখল করেছিলেন। কিন্তু সে সময় যেমন, পরবর্তীকালেও তেমনি, এ কথা প্রচার করা হয়েছে যে, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে শৃংখলা তথা চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই নাকি তিনি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। বাস্তবে এই প্রচারণা সত্ত্বেও খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানটি রাজনৈতিক পরিচিত পেয়েছিল এবং সঠিকভাবেই বাকশালপন্থী অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ভারতীয় বেতারে সমর্থনমূলক পরোক্ষ প্রচারণা, আওয়ামী-বাকশালীদের প্রকাশ্য তৎপরতা এবং তার নিজের মা ও ভাই-এর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "শোক মিছিল' সহ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে একথা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, নতুন পর্যায়ে আবারও একটি বাকশালী ও ভারতপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল খালেদ মোশাররফের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাকশালী ও ভারতপন্থী পরিচিতির সাথে যুক্ত হয়েছিল অন্য একটি প্রধান কারণ। সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে জনপ্রিয় জেনারেল জিয়াউর রহমানকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করে সেনাপ্রধানের পদ দখল করায় খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যেও খালেদ মোশাররফবিরোধী মনোভাব প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। এ সূত্র ধরেই ৭ নভেম্বর সংঘটিত হয়েছিল সিপাহী-জনতার বিপ্লব। এই বিপ্লবে খালেদ মোশাররফ চক্রের পতন ঘটেছিল, জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত ও সেনাপ্রধান পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

দেশকে ভারতপন্থী বাকশালী শাসনের অন্ধকার দিনগুলোতে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল '৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। দিনটির অন্য এক বৈশিষ্ট্য ছিল দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনীর অসাধারণ ঐক্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো জনগণ ও সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যর্থ ও প্রতিহত করেছে সকল দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র। সেনানিবাস থেকে সৈনিক ও অফিসাররা রাজপথে নেমে এসেছেন, জনগণ তাদের ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' ও 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শ্লোগান মুখে সৈনিক ও জনতা মিছিল করেছে। উচ্চারণ করেছে এই অঙ্গীকার যে, দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যাখ্যান করা হবে দেশ-বিদেশের আনুগত্য। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর প্রতিষ্ঠা ছিল ৭ নভেম্বরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন। সৈনিক-জনতার এই অর্জন পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং স্থাপিত হয়েছে সংবিধানের প্রারম্ভে। ৭ নভেম্বরের বিপ্লব অবশ্য রক্তপাতহীনভাবে সংঘটিত হয়নি, এর সাফল্য ও অর্জনের জন্যও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। নিন্দিত ও জনসমর্থনহীন খালেদ মোশাররফের পতনের পর মুহূর্তেই শুরু হয়েছিল নতুন ষড়যন্ত্র এবং সে পর্যায়ে দৃশ্যপটে এসেছিলেন লেঃ কর্নেল আবু তাহের। জাসদ এবং তাহেরভক্তদের পক্ষ থেকে এমন একটি প্রচারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে যে, কর্নেল তাহের নাকি ৭ নভেম্বর সংঘটিত বিপ্লবের নেতৃত্ব

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছিলেন এবং তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী ও সৈনিক সংস্থার সদস্যরাই নাকি খালেদ মোশাররফের পতন ঘটিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছিল। প্রচারণায় দাবী করা হয়, জেনারেল জিয়া তাহেরের কাছে তাঁর জীবন বাঁচানোর জন্য 'আবেদন' জানিয়েছিলেন এবং মুক্তিলাভের পর নাকি তাহেরের সাথে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছিলেন।

জাসদ এবং তাহেরভক্তদের এসব দাবী ও বক্তব্য কিন্তু তথ্যনির্ভর পর্যালোচনায় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বন্দী জেনারেল জিয়া আদৌ টেলিফোনে বা অন্য কোনভাবে 'আবেদন' জানানোর মত অবস্থায় ছিলেন কি-না, এ প্রশ্নের কোন বিশ্বাসযোগ্য সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। এদিকে জাসদের পাশাপাশি কর্নেল তাহেরকে কৃতিত্বদানকারী বামপন্থী নেতাদেরও অনেককে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, ৭ নভেম্বরের সফল বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা এমনকি গণবাহিনীর নামটি পর্যন্ত জানতেন না। সৈনিকরা বরং গণবাহিনীর কথিত সদস্যদের 'মুজিববাদী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। [বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠকরা হায়দার আকবর খান রনোর গ্রন্থ 'মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম' (১৯৮২) পড়তে পারেন।]

বস্তুত, প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, সাধারণভাবে আংশিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কর্নেল তাহের আসলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে ঘটনাপ্রবাহে জড়িত হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়াকে বিপাকে ফেলার এবং সাধারণ সৈনিকদের বিভ্রান্ত ও আকৃষ্ট করার কৌশল হিসেবে এমন এক অরাজক পরিস্থিতিতে তিনি ১২ দফা দাবী উপস্থিত করেছিলেন, যখন জিয়ার স্থানে তাহের নিজে থাকলেও তার পক্ষে এসব দাবী পূরণ করা সম্ভব হত না। কর্নেল তাহের একই সাথে তথাকথিত 'শ্রেণী সংগ্রাম'কেও সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করেছিলেন। জিয়াসহ অফিসার মাত্রের বিরুদ্ধেই তিনি সৈনিকদের উস্কানি দিয়েছিলেন এবং এর ফলে দেশের সকল সেনানিবাসে অসংখ্য অফিসারকে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যখন কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা ছাড়া সরকারের জন্য আর কোন পথ থাকেনি। '৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষে ফাঁসিতে তার মৃত্যু হয় '৭৬ সালের ২১ জুলাই।

পর্যালোচনায় দেখা যাবে, প্রধান তিনটি কারণে কর্নেল তাহের কোন জনসমর্থন পাননি এবং নিজেই নিজের মর্মান্তিক পরিণতিকে অবশ্যম্ভাবী করেছিলেন।

১। তেমন কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন না করেও তিনি নেতৃত্বের অধিকার দাবী করে বসেছেন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্য কোন পর্যায়ে উদ্যোগ পর্যন্ত না নিয়ে শুধু সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে তথাকথিত 'শ্রেণী সংগ্রাম' শুরু করেছেন। অফিসার মাত্রকে 'ধনিক শ্রেণীর সন্তান' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের হত্যার যে ভয়ঙ্কর কৌশল তিনি নিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়ন ঘটলে দেশের সেনাবাহিনী অফিসারবিহীন হয়ে পড়ত এবং একমাত্র কর্নেল

www.nagorikpathagar.org

তাহের ছাড়া আর কোন অফিসার জীবিত থাকতেন না। পরিণতিতে সেনাবাহিনীই ধ্বংস হয়ে যেত।

২। সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ধ্বংসের লক্ষ্যে প্রণীত এই কৌশল ও পরিকল্পনাকে জনগণ এবং দেশপ্রেমিক সৈনিকরা সে সময় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী এবং ভারতপন্থী নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে।

৩। কর্নেল তাহেরের আপন ভাইসহ চারজন যুবক ভারতীয় হাই কমিশনারকে অপহরণের নামে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে বাংলাদেশের ওপর ভারতের সামরিক আক্রমণ পর্যন্ত ঘটতে পারত (২৬ নভেম্বর ১৯৭৫)। এই ঘটনাকে উস্কানিমূলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আক্রমণকে অবশ্যম্ভাবী করা, বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ৭ নভেম্বরের সকল অর্জনকে ধ্বংস করে দেয়া।

বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা মানতেই হবে যে, কর্নেল তাহেরের সে সময়ের ভূমিকা দেশের স্বার্থ এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। আর তাই তাহেরভক্ত অনেককেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করা এবং ফাঁসি দেয়া হলেও কোন পর্যায়ে কোন 'বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়নি।

কর্নেল তাহেরের দুঃখজনক পরিণতির মধ্য দিয়ে ৭ নভেম্বরের বিপ্লব পরিপূর্ণতা পেয়েছিল এবং দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল নতুন এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। বাংলাদেশে এরপর বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাধাগ্রস্ত হয়েছে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা। সৈনিক-জনতার অসাধারণ ঐক্যের ফলে ভারতের পক্ষে সামরিক অভিযান চালানোও সম্ভব হয়নি।

এ প্রসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি বিচিত্র ঐক্যের দিক আলোচনায় আনা দরকার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ৭ নভেম্বর প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও জাসদের মধ্যে এক বিচিত্র ও কৌতুহলোদ্দীপক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ঐক্যের মূল উদ্দেশ্য হল জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো, 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' কে প্রত্যাখ্যন করা এবং শেষপর্যন্ত দল হিসেবে বিএনপিকে আক্রমণ করা। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল তাহেরের ব্যর্থতা ও পরিণতি আওয়ামী লীগ ও জাসদকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, দল দুটির নেতৃবৃন্দ এমনকি এক মঞ্চেও এসেছেন।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় দেখা যাবে, আওয়ামী লীগ ও জাসদের ঐক্য শুধু বিচিত্র নয়, এ ঐক্যের মধ্যে রয়েছে জনগণের সাথে প্রতারণার অঘোষিত উদ্দেশ্যও। দুটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

১। আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করেননি বলেই স্বাধীনতার পর পর ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি জাসদেও যোগ দিয়েছিলেন—যে দলটির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে।

২। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল একটি বাকশালী সরকারকে ক্ষমতাসীন করা। অন্যদিকে কর্নেল তাহের চেয়েছিলেন খালেদ মোশাররফকে উৎখাত করতে। অর্থাৎ, খালেদ ও তাহেরের সম্পর্ক ছিল চরমভাবে শত্রুতাপূর্ণ এবং তারা ছিলেন পরস্পরবিরোধী অবস্থানে।

সুতরাং খালেদ মোশাররফ ও আবু তাহেরের সমর্থকদের জন্যও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই, যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। কিন্তু তারপরও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন বলেই আরও একবার সামনে এসেছে পুরনো একটি অভিযোগ। অতিবিপ্লবী স্লোগান ও হঠকারী কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অভিযোগ উঠেছিল যে, জাসদ আসলে সমাজতন্ত্রের স্লোগানমুখে সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে চায়, দেশপ্রেমিক ও বামপন্থীদের ধ্বংস করতে চায় এবং টিকিয়ে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ সরকারকে। '৭৫ সালের নভেম্বরসহ পরবর্তী দিনগুলোতে এই অভিযোগ আরো শক্তিশালী হয়েছিল। সেই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, রুশ-ভারতের বিরোধিতার আড়ালে জাসদ বিশেষ করে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং সে লক্ষ্যেই কর্নেল তাহেরকে সামনে নিয়ে এসেছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, জাসদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করা সম্ভব। সাম্প্রতিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে বরং এ অনুমানও শক্তি অর্জন করেছে যে, জাসদ আসলে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় ফ্রন্টের ভূমিকা পালন করেছে—যার উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করা এবং আন্দোলনকামী ছাত্র-যুবকদের অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। জাসদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে অনেকাংশে। হাজার হাজার ছাত্র-যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। রক্ষীবাহিনীর গুলী ও নির্যাতনে কর্নেল তাহেরের মত বীর মুক্তিযোদ্ধাও জাসদের ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হয়ে গেছেন।

'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-এর বিরোধিতার মূল কারণটিও নিহিত রয়েছে এখানে। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, সুচিন্তিত হলেও জাসদের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, ৭ নভেম্বর কোন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের একক অর্জন নয়। দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য দিনটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সম্মান লাভ করেছে এবং এর সাথে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখার উপাদান। এত বিরাট একটি অর্জনকে মাত্র দুটি দলের পক্ষে নস্যাৎ করা সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর নিয়ে বিতর্ক ঃ
আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা

লেঃ আবু রুশদ (অব.)

পার্থ সারথি ঘোষ। ভারতের একজন প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা গবেষক। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, " মুজিব ও তার উত্তরসুরীদের সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে এটা বলা যায় যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মধ্যে ভারতের একটি শক্ত ভিত রয়ে গেছে। ... কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য কিভাবে প্রভাব খাটানো যায় ? এটি নিশ্চিত যে, শুধু কূটনীতি দিয়ে তা করা সম্ভব নয়, বরং রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আওয়ামী লীগকে গোপনীয়ভাবে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করতে হবে। এ রকম গোপন সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই যে কোনো প্রকার 'নৈতিক সংস্কার' বা নীতিকে বর্জন করতে হবে।"[১] দীর্ঘ ২১ বছরের 'নৈতিক সংস্কার' ও 'নীতি' বিবর্জিত ভারতীয় সহায়তায় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। এর পরপরই শুরু হয়েছে ২১ বছরের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাগুলো উল্টে দেয়ার রাজনীতি। এবং এ বিষয়ে স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসের সূর্যালোকিত সেইদিন সিপাহী-জনতার বিপ্লবী আবেগ-মথিত ৭ নভেম্বর।

আজ বলা হচ্ছে ৭ নভেম্বর কোনো বিপ্লবের দিন ছিল না। ছিল মুক্তিযোদ্ধা-সৈনিক হত্যা দিবস। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কথা মনে রেখে এ দিনের ছুটি বাতিল না করলেও সরকার প্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের কাছে আহবান জানিয়েছেন ৭ নভেম্বর নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখতে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবী মহল ও পত্র-পত্রিকা মারফত প্রচার চালানো হয়েছে তীব্র-তীক্ষ্ণভাবে সাইকোলজিক্যাল, ওয়ার-এর হাজারো কলাকৌশল। আজ ৩ নভেম্বর-এর ক্যু-দেতার সাথে জড়িত অনেক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাই এমন সব তথ্য দিচ্ছেন, যাতে ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হয়, লিখতে হয় নতুন ইতিহাস। সে ইতিহাস জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তমকে বন্দী করে কথিত চেইন

www.nagorikpathagar.org

অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার, কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো জেনারেল জিয়াই জড়িত থাকার ইতিহাস !

এখনো ভুলে যায়নি সেই মানুষগুলো, যারা এখনো বেঁচে আছে একুশ বছর পর ৭ নভেম্বর স্মৃতি নিয়ে। কেউ তা ভুলতে পারে না। সে কথা-যে, ভারত সবসময়ই ভেবেছে, "কেবলমাত্র একটি বন্ধুভাবাপন্ন বাংলাদেশ সরকারই ভারতীয় নিরাপত্তা স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে সহানুভূতির সাথে ভাবতে পারে[২] তাই তো স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে জিয়াউর রহমানের নাম, মনে পড়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সাহসী মুখগুলোর কথা।

৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে আজ যে সব কুৎসা রটানো হচ্ছে, অভিযোগ তোলা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবের বিপক্ষে তা কি আদৌ সত্য? মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকেরাই কি কেবল সত্যই নিহত হয়েছিলেন? না, কখনো নয়। সেদিন সাধারণ সৈনিকরা অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল শুধুমাত্র ভারতীয় আগ্রাসনের ভয়ে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দুর্বার তাগিদে। কারণ, ব্যাক্তিজীবনে, মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোয় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ-এর ইমেজ যাই থাকুন না কেন ৩ নভেম্বর-এর ক্যু'দেতার পর দেশপ্রেমিক সবার মাঝে "এমন একটি ধারণা জন্মে যে (৩ নভেম্বর-এর) অভ্যুত্থানের সাফল্য ও একে টিকিয়ে রাখার জন্য তার সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। এবং সেটি হলো ভারতীয় সাহায্য। এছাড়া যে পরিস্থিতিতে ও যেভাবে ৩ নভেম্বর-এর অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় (মুজিব হত্যাকাণ্ডের মাত্র ৮০ দিনের মাথায়) তাতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এতে পরোক্ষ বা গোপন ভারতীয় সমর্থন ছিল।"[৩] এরই পরিপ্রেক্ষিতে সৈনিকেরা বিপ্লবে অংশ নেয়। তবে তাদের একাংশ যে কতিপয় সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই একাংশ হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের ৭ নভেম্বর সংঘটনকারী জাসদের বিপ্লবীর গণবাহিনীর অন্তর্গত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকবৃন্দ।

এরা "৭ নভেম্বর ১৯৭৫ 'সিপাহী বিদ্রোহ' শুরু করে, যাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের একটি অফিসারবিহীন সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা।"[৪] কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে বহুপূর্ব হতেই সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে জাসদের এই 'উইংটি' গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের পিপলস আর্মি প্রতিষ্ঠা 'ইউটোপিয়ায়' এই রেভ্যুলুশনারী পিপলস্ আর্মি বা RPA'-র সামনে ৩ নভেম্বর একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দেয়। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর যাবৎ তারা সে গোপন পরিকল্পনা ও বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।[৫] ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে একটি 'Scape Goat' বা 'বলির পাঠা' বানিয়ে সেই লক্ষ্যই চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন কর্নেল তাহের ভক্ত-সৈনিকবৃন্দ এবং এরাই তাদের সেই অলীক স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিভোর হয়ে অফিসার হত্যায় মেতে উঠেছিলেন। এদেরকে

www.nagorikpathagar.org

কখনোই ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মূল চেতনার অনুসারী বলা যাবে না। মূলত "তাহেরের লক্ষ্য ছিল জিয়াকে ক্ষমতাহীন পুতুল সম্রাট করে নিজেই আসল ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। ... সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অতঃপর পরাজিত, উদভ্রান্ত তাহেরের অফিসার নিধন অভিযান শুরু হল। কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। অনর্থক রক্তপাত হত্যাকাণ্ড সেনাবাহিনীর প্রকৃত কোনো সৈনিক, NCO ও JCO -দের সমর্থন পায়নি।"[৬] এই যে অফিসার হত্যা তার দায় তাই নিতে হবে কর্নেল তাহেরকে, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে, কখনোই সাধারণ সৈনিকদের নয়। বরং সাধারণ সৈনিকেরা সম্পূর্ণ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, তাদের 'জনপ্রিয় নেতা,[৭] জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিত্ব হতে মুক্ত করার জন্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এখানে তাদের সামনে প্রশ্ন ছিল একটি—এ দেশ কি আবার দাসত্বের নিগড়ে বন্দি হতে চলেছে ? তাই বলা যায়, ৭ নভেম্বর সংঘটিত হয়েছে পুরো দেশকে সামনে রেখে, মুষ্টিমেয় সৈনিকের অফিসারবিহীন সশস্ত্রবাহিনী কনসেপ্ট বাস্তবায়নের জন্য নয়। অবশ্য বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকেরা যে বিপ্লবী সংগঠনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একথা মানতেই হবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল হায়দার, কর্নেল হুদা, মেজর আজিমসহ যে সব অফিসার সেদিন নিহত হয়েছিলেন তারা ৩ নভেম্বর-এর ক্যু'র সাথে জড়িত ছিলেন বলেই নিহত হন। এরা ছাড়া বিশেষ কোনো সেনা কর্মকর্তা সেদিন নিহত হননি। বরং জেনারেল জিয়া, ব্রিগেডিয়ার শওকত, কর্নেল আমিন, লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন, লেঃ কর্নেল এম. এ হামিদ ও আরো অনেক অফিসারই তখন নির্বিঘ্নে ক্যান্টনমেন্টে চলাচল করেছেন। কারণ, সাধারণ সৈনিকরা যারা একটি দেশজ লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব করেছিল তারা বিদ্রোহী ছিল না। তাই দেশপ্রেমিক কোনো সেনা কর্মকর্তাও তাদের হাতে লাঞ্ছিত হননি।

এদিকে খালেদ মোশাররফ হত্যায় অনেকে জেনারেল জিয়াকে অভিযুক্ত করতে চান। বলতে চান ক্ষমতার পথ পরিষ্কার করার জন্য জিয়া খালেদকে হত্যা করেছিলেন। অথচ এদের কারো মনেই কি এ প্রশ্ন জাগে না যে ২ নভেম্বর-'৭৫-এর যখন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠতে থাকে তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বা খালেদ মোশাররফকে নিউট্রালাইজ করে জেঃ জিয়াউর রহমান খুব সহজেই ক্ষমতা দখল করতে পারতেন ? ৭ নভেম্বর জিয়ার প্রতি সিপাহী-জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন প্রমাণ করে জিয়া নিজে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে না-চাইলেও খালেদ মোশাররফ সিপাহী-জনতার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, আর তাই তাকে (জিয়াকে) গ্রেফতার করে ক্ষমতার পদ নিষ্কন্টক করতে চেয়েছিলেন। এখানে জেনারেল জিয়ার প্রতি জনসমর্থনের মাত্রা বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখা দরকার ১৫ আগস্ট '৭৫-এ মুজিব হত্যাকাণ্ডের মতো বড় একটি ঘটনায় যদি তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকে গ্রেফতারের প্রয়োজন না হয় তবে ৩ নভেম্বর কেন নৌ ও বিমান প্রধানদের

www.nagorikpathagar.org

বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করা হলো? এর উত্তর একটিই—জিয়া ছিলেন সকলের প্রিয় একজন জেনারেল, যিনি সামরিক বাহিনীর সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেও সকলের জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু এই প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয় হয়েও জেঃ জিয়া নিজেকে কখনো অদ্বিতীয় ভাবেননি ; কখনোই হত্যা করতে চাননি মুক্তিযুদ্ধের একজন অসম সাহসী যোদ্ধা খালেদ মোশাররফকে। বরং সৈনিকরা যখন তাকে মুক্ত করে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীতে নিয়ে আসেন, তখন সেখানে তাকে ফোন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ-এর অবস্থানের কথা জানিয়ে দেন ১০ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক কর্নেল নওয়াজিশ। সে সময় খালেদ মোশাররফ ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

লেঃ কর্নেল নওয়াজিশের ফোন পাওয়ার পর জেঃ জিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট করে তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "See to it, that nothing happens to them, "[৮] অর্থাৎ খালেদ মোশাররফ, হায়দার ও হুদা'র যেনো কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বলেছিলেন জিয়া। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে টেলিফোনে ঐ নির্দেশ দেয়ার সময় তাহের সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেটাই ছিল তাদের মৃত্যুর আশু কারণ।

এবারে আসা যাক চেইন অব কমান্ড প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে অনেকেই বলেছেন, "[৯] নভেম্বর ১৯৭৫-এ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ যে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন তার লক্ষ্য ছিল সীমিত; সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা।"[১০] কিন্তু স্বয়ং সেনাপ্রধানকে গৃহবন্দী করে কি কখনো চেইন অব কমান্ড রক্ষা করা যায়? কারণ, শৃংখলা হোক, চেইন অব কমান্ডই হোক, তা প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাপ্রধানের অনুমোদনক্রমেই কেবল তা বাস্তবায়ন করা যায়। তাই একথা বলা এখানে অত্যুক্তি হবে না যে, খালেদ মোশাররফই সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠিত চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতেই এসেছিল বৈধ সেনাপ্রধানকে মুক্ত করার বিপ্লব।

এদিকে ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবকে যারা, 'সেপাই বিদ্রোহ' বলেন, একে চিহ্নিত করেন অফিসার হত্যা দিবস হিসেবে, সেই তারাই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অফিসার হত্যার আদেশ প্রদানকারী কর্নেল তাহের-এর বিচার নিয়ে প্রদর্শন করেন একটু ভিন্ন রকমের সহানুভূতি। এমনকি এরা জেনারেল জিয়াকে দায়ী করেন কর্নেল তাহের হত্যার জন্য। কিন্তু ইতিহাস বলছে মিলিটারী ল' বলছে, জেনারেল জিয়া কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেননি এবং কর্নেল তাহেরের ফাঁসি দেয়াও জেনারেল জিয়ার এখতিয়ারভুক্ত কোনো ব্যাপার ছিল না। আজ একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কর্নেল তাহের একটি অফিসারবিহীন সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকদের অফিসার হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি ৭ নভেম্বর-এর পরও ৮, ৯ নভেম্বরে পুরো ক্যান্টনমেন্টে "অফিস কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ।

www.nagorikpathagar.org

সর্বত্র বিরাট অচলাবস্থা। অরাজকতা.......... বিপ্লবীরা সর্বত্র ঘুরেফিরে সৈনিকদের উত্তেজিত করছিল। দাবি-দাওয়ার প্রচুর লিফলেট সর্বত্র বিতরণ করছিল।"[১১] নিঃসন্দেহে এ কাজগুলো হয়েছিল কর্নেল তাহেরের উস্‌কানিতে। অথচ, তখন প্রয়োজন ছিল শৃংখলা রক্ষা করা ও সৈনিকদের অনিয়মতান্ত্রিক কাজ হতে বিরত রাখা। "বিদ্রোহ পরবর্তী দিনগুলোতে জিয়া অতি দ্রুততার সঙ্গে তার সিভিল-মিলিটারী ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হন।"[১২] ৭ নভেম্বর-এর ঘটনার পর জেঃ জিয়া কর্নেল তাহেরকে পাইকারী হারে অফিসার হত্যার নির্দেশ দেয়ার জন্য গ্রেফতার করেও সসম্মানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্নেল তাহের ছিলেন একজন আগাগোড়া সমাজতান্ত্রিক। তিনি তখনো স্বপ্ন দেখতেন জিয়াকে সরিয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের। এজন্য বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে সেনানিবাসে ক্রমাগত উস্‌কানিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। ফলে এক পর্যায়ে সরকার তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিলেও সেনাবাহিনীতে মিউটিনি বা বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধসহ আরো অনেক ব্যাপারেই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা সেনা আইনের আওতাধীন থাকেন।

এক্ষেত্রে সাধারণত সেনা, নৌ ও বিমান আইনের তিনটি ধারার উল্লেখ করা যায়। এগুলো হলো ঃ

১। সশস্ত্র বাহিনীর একজন সদস্য চাকরিতে থাকাকালীন অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনী আইন (যেমন সেনা আইন-১৯৫২, নৌ অধ্যাদেশ-১৯৬১ এবং বিমান বাহিনী আইন-১৯৫৩)-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, উক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য কর্তৃক চাকরিতে থাকাকালীন যে কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য তাঁর চাকরি পরিসমাপ্তির তারিখের পরও (অর্থাৎ অবসর গ্রহণ/ চাকরি হতে অব্যহতি লাভ/ বরখাস্ত ইত্যাদি) ৬ মাস পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর আইনের আওতাভুক্ত থাকেন। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত রূপ চাকরিকালীন অবস্থায় সংঘটিত কতিপয় অপরাধের জন্য যেমন, চাকরি হতে পলায়ন (ডিসারশন), প্রতারণামূলক অন্তর্ভুক্তি (ফ্রেডিউলেন্ট এনরোলমেন্ট) এবং বিদ্রোহ (মিউটিনি) বা বিদ্রোহ সম্পর্কিত কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র বাহিনী আইনের অধীনে থাকবেন। অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনী আইনের অধীনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।[১৩]

২। সশস্ত্র বাহিনী অবসরপ্রাপ্ত সদস্য সাধারণত পেনশন, রেশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পাওয়ার অধিকারী হন। উক্ত সদস্যের উল্লেখিত সুবিধাদি পাওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করবে তাঁর অবসরোত্তর সু-আচরণের ওপর। অর্থাৎ যদি তিনি অবসরকালীন সময় রাষ্ট্র/সরকার বিরোধী বা আইন-শৃংঙ্খলার পরিপন্থী বা উহার প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো কার্যকলাপে জড়িত হন তবে সে ক্ষেত্রে সরকার ইচ্ছা করলে উক্ত সদস্যদের পেনশন/ ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থগিত বা প্রত্যাহার করে নেয়ার অধিকার রাখেন।[১৪]

www.nagorikpathagar.org

৩। কোন ব্যক্তি তার কোনো কার্যকলাপ বা বিবৃতি দ্বারা সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যকে সরকারের প্রতি অনুগত না থাকতে বা তার স্বাভাবিক কর্তব্য হতে বিরত থাকতে প্ররোচিত করলে বা অনুরূপ প্ররোচনা চালাবার কোনোরূপ প্রচেষ্টা নিলে সে সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে কোর্ট মার্শাল বিচার করা যেতে পারে। [১৫]

উপরোক্ত আইন ও ধারা হতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তদানীন্তন সরকার কর্নেল তাহেরকে কোর্ট মার্শালে বিচার করে কোন অন্যায় করেননি। এ ছাড়া তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন রাষ্ট্রপতি সায়েম, জিয়াউর রহমান নয়। কারণ, সে সময় সিএমএল, এ বা চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন বিচারপতি সায়েম: জিয়াউর রহমান ছিলেন তাঁর অধীন একজন ডিসিএমএলএ বা ডেপুটি চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর। যদি তাহেরকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রশ্নও আসে সেক্ষেত্রেও সে দায়িত্ব বর্তায় বিচারপতি সায়েমের ওপর। সবচেয়ে বড় কথা হলো—উপরোক্ত আইন বলে কর্নেল তাহেরের বিচার হয়েছিল কোর্ট মার্শালে। এবং ফাঁসিও হয় সেনা আইনের আওতায় সেনা আইনের সম্পূর্ণ নিজস্ব পথে।

আজ আমরা বহু পথ পেরিয়ে এসেছি। ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়েছে দীর্ঘ একুশ বছরের কতকথা। এসব নিয়ে হয়তো বিতর্ক আছে, আছে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভারতীয় সমরবিশারদ রবি রিখি এক সময় যা বলেছিলেন তা এখনো রয়েছে 'সত্য' হয়ে। ভারতের আচরণ এখনো পরিবর্তন হয়নি। তাই তো আমাদের শুনতে হয়, "শেখ মুজিবুর রহমান যখন নিহত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে ঠিক করেছিলেন হস্তক্ষেপ করবেন। সেনাবাহিনীর তিনটি ডিভিশনকে সতর্কও করে দেয়া হলো, কিন্তু শেষে সরকার গড়িমসি করলেন এবং সুযোগ পেরিয়ে গেল। ফলে হল কি ? কিছুই না, বাংলাদেশকে আমাদের শিবিরে রাখার সুযোগ হাতছাড়া করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যুক্তিতে পোল্যান্ড ও আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রেনাডায় সেনা নামিয়েছিল, সেই যুক্তিতে ভারতও বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে তা অসঙ্গত হতো না।"[১৬]

ভারতের এই 'যুক্তি আজো আছে। আছে অভিলাষ। আছে পঞ্চম বাহিনী। ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বরও (হয়তো) এমনি একটি যুক্তির বাস্তবায়নের অশনি সংকেত দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতায়। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই ৭ নভেম্বর। এখনো রয়েছে কোটি বাংলাদেশীর হৃদয়ে-চির অম্লান চেতনায়।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র ঃ

১। Limits of diplomacy; Bangladesh-by partha S. Ghosh, Published in 'Mainstream'- 29 August 1981 issue.

২। National Security and armed Forces in Bangladesh—by Srikant Mohapatra. Strategic Analysis. August 1991. page-585.

৩। ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক শ্রীকান্ত মহাপাত্রের সাথে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। পূর্বোল্লিখিত ক্রমিক (২)-এ উল্লেখিত, পৃঃ ৫৮৯।

৪। Lawrence Lifschult 'Bangladesh The crisis has not passed' Far Eastern Economic Review. December 1975.

৫। লেখকের সাথে কর্নেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রমের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার; নভেম্বর ১৯৯৬।

৬। তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা ঃ লেঃ কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পি এস সি পৃঃ ১৪২।

৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।

৮। লেখকের সাথে লেঃ জেঃ মীর শওকত আলী, বীর উত্তমের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ১৯৯৬।

৯। সাপ্তাহিক বিক্রম, ৭ নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৮।

১০। H. H. Khondoker, "Bangladesh; Anatomy of an unsuccessful military coup". Armed Forces and Society (Chicago) Vol. 13, No-1 Fall 1986 P. P. 125-143.

১১। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক (৬) দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২৪।

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩।

১৩। সেনা আইন, ধারা ৯২, নৌ-অধ্যাদেশ-ধারা ১০৬ এবং বিমান বাহিনী আইন-ধারা- ১২১।

১৪। কমপেনডিয়াম অব মিলিটারী পেনশন- ১৯৮১, বিধি-৫।

১৫। সেনা আইন ধারা ২(১) ডি (১), নৌ অর্ডিন্যান্স ধারা (৩) (১) ও বিমান বাহিনী আইন ধারা ২ (ডিডি) (১)।

১৬। রবি রিখি, দৈনিক আনন্দবাজার, কলকাতা, ১১/১১/৮৮ সংখ্যা।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর আছে ৭ নভেম্বর নাই

জাভেদ জহীর

৭ নভেম্বর আছে, ৭ নভেম্বর নেই। এক অদ্ভুত রাজনৈতিক দোলাচলে দুলছে এবার ৭ নভেম্বর। ঢাকার কোনো কোনো পত্রিকায় ইদানিং একটি লাইন প্রায়ই দেখা যায়। লাইনটি হলো "অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ"। এই লাইনটি কে লিখেছেন জানিনা। কোন্ প্রসঙ্গে লিখেছেন তাও জানিনা। তবে এর আক্ষরিক অর্থ বলতে হয়, অদ্ভুত প্রশাসনের পিঠে উঠেছে মানুষ। ৭ নভেম্বর থাকবে সরকারী ছুটি। এর অর্থ এই যে, তথ্যগতভাবে সরকার ৭ নভেম্বরের আদর্শে বিশ্বাসীই কিন্তু অন্যদিকে এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, ৭ নভেম্বর হলো, সৈনিক হত্যা দিবস। আমেরিকার বোস্টন, নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের একাধিক জায়গায় সরকার প্রধান এবং দলীয় নেতারা বলেছেন যে, ৭ নভেম্বর সেনাছাউনির শৃংখলা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় এবং সাধারণ সৈনিকরা অফিসার হত্যা শুরু করে। ৫ নভেম্বর এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত সরকারীভাবে এই দিবসটি পালনের কোন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়নি। তার মানে হলো এবার ৭ নভেম্বর সরকার কোন কর্মসূচী পালন করবেনা। কিন্তু সরকারীভাবে ৩ নভেম্বরের রয়েছে দুটি দিক ঃ একটি হলো রাজনৈতিক দিক। আর একটি হলো বিয়োগান্ত দিক। বিয়োগান্ত দিক হলো জেল হত্যা। একটি দেশের কারাগারের নিরাপদ বেষ্টনীর মাঝে অবৈধভাবে প্রবেশ করে চার জন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার পর মানুষের নিরাপত্তার আর জায়গা থাকে কোথায়? জেলের অভ্যন্তরে এই হত্যাকান্ড অবশ্যই নিন্দার যোগ্য। আমরাও এর তীব্র নিন্দা করছি। এই বিষয়টির নিন্দাবাদের মধ্যেই যদি সরকারী ক্রিয়াকান্ড সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে হয়তো বলার কিছু ছিল না। কিন্তু দেখা গেল যে, জেল হত্যার নিন্দা করতে যেয়ে এবং ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীর বিরোধিতা করতে গিয়ে ওরা ৩ নভেম্বরের পাল্টা এবং অবৈধ সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছে। এই সম্পর্কে ৩ নভেম্বর টেলিভিশনের যে লম্বা আলোচনা হলো সেখানে দেখা গেল যে, ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক বিষয় নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও টেনে আনা হয়েছে। রুশ-ভারতের মৈত্রী এবং সউদী আরব, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রের বৈরিতা ছিল আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। এর পাশাপাশি ৭ নভেম্বর কোন কর্মসূচী না দিয়েও দিবসটিকে কৃষ্ণ দিবস হিসেবে চিত্রিত করার জন্য শাসক দল এবং এর বিভিন্ন অঙ্গ

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন এবং অনুগত প্রচার মাধ্যম থেকে অবিশ্রান্ত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, শাসক দল এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩ নভেম্বরকে মহিমান্বিত এবং ৭ নভেম্বরকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। এটা একটা অদ্ভুত অবস্থা। স্ববিরোধিতার নজির এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না। কাঠালের আমসত্ত্ব অথবা ধান গাছের তক্তা, সোনার পাথর বাটি বলে যে সব বাগধারা রয়েছে তার প্রয়োগ '৯৬-এ ৭ নভেম্বরের সরকারী কর্মকান্ড ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

[দুই]

এই প্রজন্ম জানে না, ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য কি। এই প্রজন্ম আরো জানে না যে, ৭ নভেম্বরে আসলেই কি ঘটেছিল। কেন ৭ নভেম্বর এতবড় একটি বিপ্লব ঘটল সেটাও জানেনা এই প্রজন্ম। এই প্রজন্ম জানে একটি বিকৃত শ্লোগান 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই'। এই প্রজন্ম আরো জানে যে, একটি চক্রান্ত এবং হত্যাকান্ডকে মদদ দিয়ে সেনা ছাউনিতে যে খুনাখুনি হয়েছিল (তাদের ভাষায়) সে খুনাখুনির দিনই ৭ নভেম্বর। এ খুনখারাপি করে ক্ষমতা দখলের দিনই হলো ৭ নভেম্বর। অথচ অবাক ব্যাপার হলো এই যে, যত দূর মনে পড়ে, ১৯৮৮ সাল থেকেই শুরু হয়েছে ৭ নভেম্বরের বিরুদ্ধে এই ধরনের মতলবী প্রচারণা। '৮৮, '৮৯ এবং '৯০ সাল, এই তিন বছর বিএনপির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এ জনপ্রিয়তার জোয়ারে অবগাহন করেই '৯১ সালে বিএনপি এবং তার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে বিরাট বিজয় অর্জন করেন। আরো অবাক ব্যাপার হলো এই যে, '৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পরই ৭ নভেম্বরের বিরুদ্ধে প্রচারণা আরো জোরদার হয়। এটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য বিষয় যে, '৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ৭ নভেম্বরের বিপক্ষ শক্তির দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা যত জোরদার হয়, ৭ নভেম্বরের স্বপক্ষ শক্তির ভূমিকাও ততই দুর্বল হতে থাকে। '৯২ সালে দেখা যায় যে, নেহায়েত দায়সারা গোছের বিপ্লব দিবস পালিত হচ্ছে। টেলিভিশনে আধঘন্টা কি পৌনে এক ঘন্টার জন্য তিন-চার ব্যক্তির একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যেই ৭ নভেম্বর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই আলোচনাতে শুধু এটুকু বলা হয় যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বস্তুত ৭ নভেম্বরের প্রতি ক্রিমিন্যাল উদাসীনতা দেখিয়েছেন সামরিকশাসক জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। ১৫ আগস্টে সূচিত বিসমিল্লাহ এবং বাংলাদেশ জিন্দাবাদ তিনি বহাল রাখলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত সংশোধনীও তিনি বহাল রাখলেন। বাংলাদেশ জিন্দাবাদকেও তিনি রাষ্ট্রীয় শ্লোগান হিসেবে বহাল রাখলেন। কিন্তু তারপরেও ৭ নভেম্বর পালনের ব্যাপারে তিনি এক অমার্জনীয় উদাসীনতা বজায় রাখেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ৭ নভেম্বরের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক জিয়াউর রহমানের লালিত সন্তান বিএনপিও '৯২ সাল থেকে ৭

www.nagorikpathagar.org

নভেম্বরের প্রতি অমার্জনীয় উদাসীনতা প্রদর্শন করে। পরবর্তী চার বছর অর্থাৎ '৯৬ সাল পর্যন্ত ৭ নভেম্বরের প্রবেশ এবং প্রস্থান ঘটে, নিঃশব্দে নীরবে হেলায় ফেলায় পালিত হয় একটি জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস। এর পাশাপাশি চলতে তাকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক জিয়াউর রহমান এবং বিএনপির রাজনৈতিক চরিত্র হনন।

[তিন]

এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। মহিমান্বিত ৭ নভেম্বর ধীরে ধীরে তার মহিমা হারিয়েছে। আর কলংকিত ৩ নভেম্বর ধীরে-ধীরে কলংকের কালি মুছে ফেলেছে। বিএনপি ৭ নভেম্বরের ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছিল। এই ভিত যখন সরে গেছে তখন বিএনপি সরকারের পতন হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দলীয় নীতি এবং আদর্শের প্রতি কেমন অনড় এবং অবিচল থাকতে হয়। ১৫ আগস্টের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বিন্দুমাত্র আপস করেনি। ঐদিনকে তারা শোক দিবস ঘোষণা করেছে এবং সরকারী ছুটি হিসেবে পালন করেছে। রেডিও এবং টেলিভিশনে দিনের-পর-দিন ঘন্টার-পর-ঘন্টা শেখ মুজিবের ওপর লাগাতার অনুষ্ঠান করেছে। এসব অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে শুধু মাত্র মহিমান্বিতই করা হয়নি, আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শ এবং নীতিও ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। বিসমিল্লাহ তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাতিল করেছে। রেডিও বাংলাদেশকে বিদায় করেছে। জয় বাংলা চালু করেছে এবং বাংলাদেশ বেতার জারি করেছে।

ইনডেমনিটি বিল বাতিল হচ্ছে এবং ১৫ আগস্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাওয়াতপত্রেও বিসমিল্লাহ নেই এবং মক্তব ও মাদ্রাসাতেও শেখ মুজিবের ছবি টাঙ্গানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ তার দলীয় আদর্শ এবং দলীয় নীতির প্রতি যে কতখানি আপসহীন সেটা আওয়ামী লীগ ভালোভাবে প্রমাণ করছে। ক্ষমতার মসনদে বসেও যে তারা অক্ষরে-অক্ষরে আদর্শ পালন করছে সেটাই তারা এবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ৭ নভেম্বর আছে, ৭ নভেম্বর নেই। '৯৬-এর ৭ নভেম্বর এই শিক্ষাই দিচ্ছে। সুবিধাবাদ ক্ষণস্থায়ী। আদর্শ চিরস্থায়ী। জাতীয়তাবাদীরা আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেনি। আওয়ামী লীগের আদর্শকে আরেকটি আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে, সুবিধাবাদ দিয়ে নয়।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ও সাম্প্রতিক প্রচারণা

আহমেদ মূসা

আমাদের অনন্ত সঙ্গী হচ্ছে ইতিহাসের সেই মহত্তম স্বপ্ন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শোষণমুক্ত সমাজ। এটা হচ্ছে সেই স্বপ্নের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যার স্ফুরণ ঘটেছিল পৃথিবীতে। উত্থানের সেই ধ্রুপদী অঙ্গীকার থেকে কতবার সরে গেছে পৃথিবী। কিন্তু স্বপ্নের মৃত্যু হয় না।

স্বপ্ন পূরণের মহতী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা কতবার উঠে দাঁড়িয়েছি, আন্দোলনে-সংগ্রামে স্পন্দনে ও যুদ্ধে কত না সময় বয়ে গেছে আমাদের। ত্যাগ আর সাহসের অভাব ঘটেনি কখনো। আমরা নিরন্তর বেড়ে উঠেছি বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। অনেক স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বিরাজিত আমাদের বুকে। বর্গীরা কতবার হানা দিয়েছে আমাদের স্বপ্নের মিছিলে। কিন্তু মিছিল থেমে থাকেনি। আমাদের বুকের ভেতর কতনা স্বজনের বধ্যভূমি। স্মৃতির নিষ্ঠুর কোদাল চলে চেতনায়। রক্তাক্ত হই, হই অনুপ্রাণিতও।

মানুষের ইতিহাসে সংগ্রামে ও বিশ্বাসঘাতকতা পাশাপাশি চলে। শক্তি ব্যবহার করে দেশপ্রেমিক হয় বীর, আর বিশ্বাসঘাতক হয় দস্যু। বীরত্ব আর দস্যুতার একটানা দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় আমরা অর্জন করেছিলাম মহার্ঘতম বস্তু স্বাধীনতা। জয় হয়েছিল দেশপ্রেম ও বীরত্বের। পরাজয় ঘটেছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও দস্যুতার। এই নিকট ইতিহাস আমাদের কমবেশি জানা। কিন্তু মানুষ যা জানে, তার সঙ্গে ইতিহাসের নামে মানুষকে যা জানানো হয়, তার তথ্য একরকম হয় না। একজন মনীষী দুঃখ করে বলেছেন, যা ঘটে তা ইতিহাস নয়, যা লেখা হয় তাই ইতিহাস। সুতরাং কোন্ ঘটনার ইতিহাস লিখছেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এমন একটা সময় অতিক্রম করছি যখন ইতিহাস অনেকের হাতেই নিরাপদ নয়। সত্য যে ইতিহাস, সে কখনো নিন্দা বা স্তুতি কোনোটাকেই গ্রহণ করে না। নির্মোহ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিন্দুক ও স্তাবকের কোনো স্থান নেই। কিন্তু, আমাদের আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস লেখার ভার তুলে দিয়েছে স্তাবক এবং নিন্দুকের হাতে। একজন লেখকই একই সঙ্গে একটি ঘটনা বা একজন ব্যক্তির স্তাবক এবং সেই ঘটনা-ব্যক্তির প্রতিপক্ষের নিন্দুক। এখানে ইতিহাসবিদই নেই। তাই 'ইতিহাসের' নামে এসব রচনার বহু তথ্য মানুষ বিশ্বাস করে না। ইতিহাস বিকৃতির

www.nagorikpathagar.org

অভিযোগ এনে এক পক্ষ যখন অন্য পক্ষকে আক্রমণ করে তখন মানুষ কৌতুকও অনুভব করে। রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস বর্ণনায় 'কানু ছাড়া গীত নাই।'

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পূর্বাপর সময়ে আমাদের সামরিক-বেসামরিক জীবনের ঘরে বাইরে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সে সব ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিস্তারিত জানার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সমকালীন ঘটনাবলী ও বাস্তবতার ফসল ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার মিলিত প্রচেষ্টায় জিয়াউর রহমানের উত্থান ছিল স্বাগতিক। প্রাক-পঁচাত্তরের 'আদর্শ' কায়েমে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহ, সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক ক্যাডার ঢুকিয়ে ও বেসামরিক ক্যাডারদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেনাবাহিনীর একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে অপর অংশের দ্বারা ক্ষমতা দখল করতে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের হটকারিতাপূর্ণ চেষ্টা এবং এই দুটো ধারারই বিরোধিতা করে বাকশালের পুনরুত্থান ও সেনাবাহিনী ধ্বংসের প্রয়াস রোধ করে জিয়ার উত্থান—এই তিনটি ঘটনাই ছিল নভেম্বরের আলোচিত ক'দিনের মূল প্রতিপাদ্য। পরস্পর-বিরোধী এই ত্রয়ী ঘটনায় খালেদ মোশাররফ কর্তৃক জিয়া বন্দী থাকার সময়ই খালেদ মোশাররফ ও তাঁর দুই সহযোগী নিহত হন এবং তাদের অনুসারীরা বিদ্রোহে ক্ষান্ত দেয়। জিয়া মুক্ত হয়ে এবং পরিস্থিতি উপলব্ধি করে কর্নেল তাহেরের অফিসার নিধনের হঠকারিতা দমন করেন। কর্নেল তাহের সেই সময় তার অনুগতদের লেঃ কর্নেলের ওপরে সব অফিসারকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে পরবর্তীকালে জানা যায়। কর্নেল তাহেরের উদ্দেশ্য ছিল, জিয়াউর রহমানকে দিয়ে তার রহস্যময় লক্ষ্য সাধনের হটকারিতাপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা। কিন্তু জিয়া সে ফাঁদে পা দেননি। বরং সেই হটকারিতা দমন করে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ও জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর সক্রিয় চেষ্টায় হত্যাকান্ড বন্ধ হয়। নভেম্বরের সেই কয়েকদিনের তিনমুখী ঘটনায় জনগণ এবং সেনাবাহিনী ত্রাতার ভূমিকায় জিয়াউর রহমানকে কামনা করেছিলেন খুবই সঙ্গত কারণে। সেনাবাহিনীর সমকালীন অবস্থায় জিয়ার চেয়ে বেশি পরিচিতি ও অত্যুজ্জ্বল অতীত অন্য কারো ছিল না। একাত্তরের ২৫ মার্চে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণায় দিশেহারা মানুষ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। মানুষের হৃদয়ে তখন থেকেই গেঁথে গিয়েছিল এই নামটি। তাই রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্বের শূন্যতার কারণে জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে পরিপূরক ভূমিকায়। মুজিব হত্যাকান্ড, চার নেতার হত্যাকান্ড, খালেদ মোশাররফ ও তার অনুসারীদের হত্যাকান্ড এবং সেনা অফিসার হত্যাকান্ড এসবের কোনটিতেই তিনি জড়িত ছিলেন না বলে তার গ্রহণযোগ্যতাও ছিল বেশি। সংকট থেকে অতিক্রমের জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টায় জনগণ ও সেনাবাহিনী আন্তরিকভাবে সহায়তা করায় জাতির হাল ধরে সফলতা লাভ করেন জিয়া। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর থেকে

www.nagorikpathagar.org

জিয়াউর রহমানের উত্থানের ঘটনা পর্যন্ত সময়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, জিয়াউর রহমানের ওপর দেশ পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে মাত্র। ক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি চিন্তা বা চেষ্টা কোনোটাই করেননি। সমকালে তাঁর বিকল্প ছিল না বলেই তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল সেই দায়িত্ব জনগণ ও সেনাবাহিনীর তরফ থেকে। বিভিন্ন কারণে এতোদিন ধরে আমরা সে সব সত্য ও তথ্য পাশ কাটিয়ে এসেছি, আজ সেগুলো খোলাসা করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ যদি দেশ শাসনে মোটামুটি সাফল্যও লাভ করতো তা হলে রাষ্ট্র ও সমাজে এক ধরনের মীমাংসা এসে যেত। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা পারেনি। আবার, ব্যর্থতা ঢাকার জন্য আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন ও এক দলীয় শাসন কায়েমের যে চেষ্টা করেছিল সে চেষ্টায় পুরোপুরি 'সাফল্য' লাভ করলেও এক ধরনের মীমাংসা হয়ে যেত। দেশে তখন হয়তো বিরাজ করতো কবরের শান্তি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন ও গণতন্ত্র-নির্বাসিত অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতারা মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো দেশশাসন করতে পারতেন। কিন্তু জনগণ সেই ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। যে গণতন্ত্রের জন্য জনগণ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ করেছে, সে বাংলদেশে একনায়কতন্ত্র কেউ মেনে নেয়নি। ফলে নিষ্ঠুর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলেও মানুষ নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তন এবং ৭ নভেম্বরের বিপ্লব যদি সামরিক শাসন চিরস্থায়ী করার কাজে ব্যবহৃত হতো তা হলে জনগণ এটিও মেনে নিত না। মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা লাগাতার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিল এবং আজো আছে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পর জনগণের কাছে যখন প্রতিভাত হলো যে, একদলীয় শাসন ও বাক-স্বাধীনতা হরণের ব্যবস্থা পরিবর্তন করে শিগগিরই দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মসূচি গৃহীত হতে যাচ্ছে তখন, জনগণ মধ্যবর্তীকালীন সামরিক শাসনকে মেনে নিয়েছিল। এবং অল্প দিনের ব্যবধানে জনগণ তাদের হৃত অধিকার ফিরেও পেয়েছিল, এমনকি আজকের আওয়ামী লীগও সেদিন নতুন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে রাজনীতি করে ক্রমান্বয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। এবার নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যে, ক্ষমতায় এলে তারা ২১ বছরের বিদ্যমান ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করবে। কিন্তু নির্বাচনের পর তাদের বাস্তব তৎপরতা পাল্টে গেছে। তারা নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহ পালনের বদলে রাষ্ট্রদর্শনকে আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশটিকে ভারতের পরিপূরক রাষ্ট্রের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে আওয়ামী লীগ যে ক্ষতিটি করেছিল, ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবে সে ব্যবস্থা ভেসে গিয়েছিল। বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পরিপূরক রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্বাধীন

www.nagorikpathagar.org

সত্তা ও পরিচয় নিয়ে। এখানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর ফারাক রয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসীদের। কিন্ত কৌতুকের বিষয় হচ্ছে, ক্ষমতায় আসার জন্য আওয়ামী লীগ দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের গোপন মদদ ছাড়াও কর্মসূচী অনুসরণ করেছে জাতীয়তাবাদী দলের। আওয়ামী লীগ সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছে বিএনপি'র মতো আচরণ করতে— তাদের গোপন ইচ্ছা সঙ্গোপনে রেখে। কিন্তু গোপন ইচ্ছা আড়ালে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর এখন আওয়ামী লীগ প্রবল বেগে আক্রমণ চালিয়েছে ৭ নভেম্বরের মূল চেতনার ওপর। এই আক্রমণ চালাতে গিয়ে তাদের মিথ্যা প্রচারণার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। তাই ১৫ আগস্টসহ পরবর্তী ঘটনাবলীতে জিয়াউর রহমানকে জড়ানোর একটা অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি সেসব ঘটনার ত্রয়ী পক্ষের দু'টি পক্ষ আওয়ামী লীগ ও জাসদ এক সঙ্গে এক সুরে একই কথা বলে চলেছে। সৈনিক হত্যার জন্য মূলত দায়ী জাসদ। তারাই আজ দিনটিকে অভিহিত করছে সৈনিক হত্যা দিবস বলে এবং আওয়ামী লীগ তাতে সায়ও দিচ্ছে। এ এক অদ্ভুত প্রচারণা। বাংলাদেশে এখন 'দশ চক্রে ভগবান ভূত' হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের বেনিফিসিয়ারী যারা, দিবসটির রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকটি তারা কখনো ভাল করে তুলে ধরার গরজ অনুভব করেনি। তাই বৈরী আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে আজ তাদের দিশেহারার মতো অবস্থা। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে যুক্তি-তর্ক-তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে মোকাবিলা করার প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশি। আজকের বাস্তবতায় এটা প্রমাণিত যে, আওয়ামী লীগ তার পূর্বেকার রাষ্ট্র-চিন্তা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেসব কথা বলেছে সেগুলো এখন অসার বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

একটি দেশের সরকার তার নিজ দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যদেশের স্বার্থ রক্ষায় অষ্টপ্রহর মুখিয়ে থাকার নজির পৃথিবীতে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

আমাদের স্বপ্ন বার-বার আক্রান্ত হয়, পর্যুদস্ত হয়, এটা যেমন আমাদের ট্রাজেডি, তেমনি স্বপ্ন পূরণের মহতী আকাঙ্ক্ষায় বার বার জেগে ওঠাও আমাদের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের কাছে সমর্থিত হওয়ার সময় আবার এসেছে।

www.nagorikpathagar.org

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি ও প্রেরণার উৎস ৭ নবেম্বর

ড. খলিলুর রহমান

এ দেশের আপামর জনগণ ও সেনা সদস্যগণের মধ্যেও ৭ নভেম্বর একটি প্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বিএনপি এই দিবসটিকে "জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস" হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে পালন করে আসছে। ৭ নভেম্বর আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। ৭ নভেম্বর সৃষ্ট সিপাহী-জনতার অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক বীরগাঁথা কোন দেশপ্রেমিক নাগরিকই ভুলতে পারবেন না। যে সময়কালে ৭ নভেম্বরের ইতিহাস রচিত হয় তা ছিল ১৯৭৫ সাল। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে দেশে অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল ; অপরদিকে শাসকগোষ্ঠী মত্ত ছিল আরাম-ভোগ-বিলাসিতায়, রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে অঢেল খরচাদিতে নিমগ্ন, জনগণবিচ্ছিন্ন বাকশালী প্রতিষ্ঠায় বিভোর, পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধের কীর্তিতে উদ্ভাসিত ! দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল আর লুটপাটে অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারে উপনীত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের বছরটি বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতা থেকে অমোচনীয় একটি বছর। এ বছরই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তৎকালীন সরকার প্রধান সামরিক বাহিনীর অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসারদের দ্বারা ঘটানো ক্যু'তে সপরিবারে নিহত হন। দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন আওয়ামী লীগেরই নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ। আর মন্ত্রিসভার নতুন মন্ত্রীবর্গ নিয়োগ পান প্রায় সবাই আওয়ামী লীগার। এত বড় হত্যাকাণ্ডের পরও রাস্তায় হত্যার প্রতিবাদে কোন মিছিল, শোক মিছিল বের হয়নি। উল্টো অনেকেই রাস্তায়, অফিসে আনন্দ-উল্লাস করেন। কারণ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশ চালনায় যারপরনাই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দুর্নীতি ও লুটপাটে দেশ ভরে যায়। একনায়কত্বের দিকে দেশ ধাবিত হচ্ছিল। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা ছিল না। খন্দকার মোশতাক আহমদের আড়াই মাস দেশ শাসনে দেশের জিনিসপত্রের দাম বেশ কমে যায় ও ঘুষ-দুর্নীতি কিছুটা কমে যায়। এরপরই দেশে ঘটে আবার সামরিক অভ্যুত্থান। জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩রা নভেম্বরে। দেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল

www.nagorikpathagar.org

জিয়াউর রহমানকে পরিবারের সকল সদস্যসহ বন্দী করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। জেনারেল খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা দখলে জনগণ খুশী হতে পারেননি। সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ গড়ে উঠে, গুঞ্জন শুরু হয়, অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়, কর্মস্থবিরতা দেখা দেয় সর্বত্র। দেশ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। সেনা ছাউনিতে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। ফলশ্রুতিতে ৭ নভেম্বর প্রত্যুষে ঘটে সিপাহী-জনতা বিপ্লব। সৈনিকরা সবাই একত্র হয়ে দুর্গ ভেঙে বন্দী জেনারেল জিয়াউর রহমান ও তার পরিবারকে উদ্ধার করেন। তাকে জোর করে আবার চীফ অব আর্মী স্টাফ পদে বসানো হয়, সেদিন রাস্তাঘাটসহ সর্বত্র লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সিপাহী-জনতা এক হয়ে রাস্তায় নেমে আর্মির গাড়ীতে উঠে আনন্দ-উল্লাস করেছিলেন। পরবর্তীকালে দিনটি সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করার পরই এই দিনটির প্রতি বৈরী আচরণ শুরু করে। দিনটিতে সরকারী ছুটি প্রত্যাহার করা হয়। যদিও জেনারেল জিয়া বহুমুখী গণতন্ত্রের প্রবক্তা ; উৎপাদনমূখী রাজনীতি ও গণমুখী অর্থনৈতিক প্ল্যান প্রণয়ন করে, কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন করেছে, খাল খনন করে, পল্লী উন্নয়ন করে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সবসময়ই দেশপ্রেমের পরীক্ষিত সৈনিক জেনারেল জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বিষোদগার করে থাকে। জেনারেল জিয়া সংসদ ভেঙে দেননি, মার্শাল ল' জারি করেননি—তিনি ছিলেন সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক জেনারেল, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের স্থাপতি ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা।

প্রকৃতপক্ষে জেনারেল জিয়া ভারতীয় আগ্রাসনী শক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সতর্ক। এ জন্যই ভারতীয় আগ্রাসনীর হোতারা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তারা ছিলেন কোণঠাসা। বস্তুত, ভারত যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই তার আগ্রাসনী বিষধর হাত বাংলাদেশের প্রতি প্রসারিত করেছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা চলাকালের সুযোগেই ভারত ফারাক্কা বাঁধ তৈরি শেষ করে এবং তা চালু করে। এ বাঁধটি আমাদের জন্য এক মরণবাঁধ। দেশের একটি বিরাট অংশ আজ শুষ্ক মরুভূমি। আবার বর্ষাকালে সব গেট খুলে দিলে দেশে হয় ভয়াবহ বন্যা। ১৯৯৬ সালে দেশে ভারতের পছন্দনীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় আধিপত্যবাদী চক্রটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনপ্রবাহকে ভারতীয় ধারায় ঢেলে সাজানোর জন্য তাদের চেষ্টা ও কষ্টের (?) ত্রুটি নেই। এভাবেই সম্পাদন করা হয়েছে ক্লজবিহীন গঙ্গার পানি প্রবাহ চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এবার এসেছে—বাংলাদেশের রোড, রেল ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের বায়না। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরপরই এ দেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহারের খায়েশ ভারতের পুরোপুরি জেগে উঠে। করিডোর তাদের দরকার, কারণ, তার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিরাট এলাকা শাসন করার স্বার্থে। খাদ্য-দ্রব্য, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ-সামগ্রী

www.nagorikpathagar.org

সবই পাঠানো অপরিহার্য সেখানে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রয়োজন চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের। ভারতের রাজনীতিবিদগণ অত্যন্ত ঝানু, তারা জানেন কখন কি আদায় করতে হয়। তাদের রয়েছে দেশপ্রেম আর সঠিক পররাষ্ট্রনীতি। আজ বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত সরকার তাদের বিরুদ্ধে শক্ত কিছু করতে অপারগ অসমর্থ, পূর্ব থেকেই বোঝাপড়ার সমঝোতায়। আর এ সুযোগ ভারত গ্রহণ করেছে কড়ায় গণ্ডায়।

ইতিমধ্যে বাস চলাচল চুক্তি হয়েছে, রেল চালু হবে অতি শীঘ্রই। কারণ, বেনাপোল ও পেট্রাপোলের ট্রেনলাইনের পরীক্ষামূলক মহড়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। কারণ, বাংলাদেশ ভারতে তেমন কিছু আজ লাভজনকভাবে পাঠাতে পারছে না। যাচ্ছে দেদারসে কাঁচা চামড়া, কাঁচা পাট, রোগী, ছাত্র—যা আমাদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর। আসছে ভারত থেকে গার্মেন্টিস সামগ্রী, পোশাক, কল-কারখানা, ওষুধ, কেমিক্যালস্, বই, অপসংস্কৃতি। দেশীয় এসব শিল্প হচ্ছে আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। বাংলাদেশের সীমিত গ্যাস সম্পদ্ নিঃশেষ করে দেয়ার চক্রান্তে মেতেছে দেশী-বিদেশী সুবিধাবাদী চক্র। অতি সম্প্রতি যে ভয়াবহ কান্ডকারখানা ভারত করে চলেছে তা হল— বিএসএফ দ্বারা বারবার বাংলাদেশের সীমানা লংঘনের ঘটনা। তাদের দ্বারা অনেক বাংলাদেশীকে হত্যা করা হচ্ছে। লোকজন ভয়ে সীমান্ত এলাকা ছেড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আবাসন গাড়ছে। আর এ সুযোগে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তের হাজার হাজার একর জমি দখল হচ্ছে। সীমান্তের অধিকাংশ নো-ম্যানস্ ল্যান্ড-এ ভারতীয় লোকজন চাষাবাদ করছে আর আমাদের লোক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দেশের আরও ভিতরে ঢুকে পড়ছে। ভারত কর্তৃক আকাশসীমাও একাধিকবার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ তালপট্টিসহ বেশকিছু অমীমাংসিত ইস্যুর সমস্যা সমাধানের দিকে ভারত মোটেই উৎসাহ দেখায় না— চাপ প্রয়োগের অভাবেই। বর্তমান সরকারের আমলে ঘটেছে বঙ্গভূমি আন্দোলনের ভয়াবহ প্রসার। আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি চিত্তরঞ্জন সূতার ও অপর নেতা ডাঃ কালিদাস বৈদ্য এ আন্দোলনের হোতা। তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বহুদূর বিস্তৃত করেছে বলে অতি সম্প্রতি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের জুনের পর তাদের 'লাইন অব এ্যকশন' হল প্রথম সীমান্ত ব্যবস্থাকে শিথিল করে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। জাল ভোটার বানানো ও বাংলাদেশের একাংশে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখাই। এসব নেতা কলিকাতায় আস্তানা গেড়েই প্রোগ্রাম করে বলে পত্রিকায় প্রকাশ।

দেশপ্রেমিক জনগণ আজ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির জন্য, ভারত তোষণ নীতির জন্য, দলবাজির মাধ্যমে শোষণ, দখল, দলীয় সন্ত্রাসী ও সুবিধাভোগীদের প্রশ্রয়দানের জন্য, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের জন্য, বিরোধী দলীয়

www.nagorikpathagar.org

নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও নির্যাতনের লক্ষ্যে কথায় কথায় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ আবিষ্কারের জন্য চরমভাবে অব্যক্ত বেদনায় জর্জরিত। দেশে আজ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে আশাতীতভাবে, জনগণ হয়ে পড়েছে অসহায়, হতাশ ও সরকারের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে সরকারের উচিত এখনই সাবধান হয়ে যাওয়া নতুবা সরকার পতনের একদফা আন্দোলন মহীরুহ রূপ ধারণ করবে।

আজকে জনগণের জন্য দরকার দেশপ্রেমের আগুনে জ্বলে খাঁটি দেশপ্রেমিক হওয়া। ৭ নভেম্বর থেকে শিক্ষা নেয়া, অনুপ্রেরণা নেয়া, জাতীয় ঐক্য ও দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখা, বিদেশী আগ্রাসনী শক্তিকে ঘৃণা করা, তাদের বিরুদ্ধে অসীম সাহস সঞ্চয় করে শত্রুকে প্রতিহত করা—এসব দেশপ্রেমেরই অংশ। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করে জাতীয় উন্নতি ও সংহতির জন্য আমরা একযোগে কাজ করে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ব, আগ্রাসনমুক্ত বাংলাদেশ গড়ব—এই হোক আজকের অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রত্যয়।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর না ঘটলে যা হতে পারত

এডভোকেট বদরুদ্দিন আহমদ

৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংঘটিত না হলে, বাংলাদেশের ভাগ্যে কি ঘটতে পারতো, তা বিশ্লেষণযোগ্য। তবে খালেদ মোশাররফ যদি তার কতিপয় অনুগত সৈন্যের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে টিকে থাকতে পারতো, তা'হলে বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হত। তার নীলনকশা শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর পরই প্রস্তুত করা হয়েছিল।

শেখ মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ধানমন্ডিতে সৈয়দ আনোয়ার চৌধুরীর বাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই বক্তব্য রাখেন। তারা প্রায় সবাই একই ভাষায় কথা বলেন। দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতের সাহায্য ব্যতীত মোশতাক সরকারকে উৎখাত করা যাবে না, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়াও সম্ভব হবে না। খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার স্বপ্ন দেখছে। আর সহ্য করা যায় না, এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে। ভারতের সাহায্যে আবার মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। এবার বলুন, আপনারা কবে ভারতে যাচ্ছেন?

মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাদের সব কথাই শুনলাম। বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা মনে হলে বুক ভারী হয়ে আসে, কান্না চেপে রাখতে পারি না। এখন আমরা তো ভারতের সাহায্যে মোশতাক সরকারকে উৎখাত করতে চাই, কিন্তু মোশতাক মন্ত্রিসভার সব সদস্যই তো বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। শুধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামন আর মুনসুর আলী বাদে। সবই ঠিক আছে, শুধু আজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। এই অবস্থায় তো আমরা মোশতাককে উৎখাত করার জন্য অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না। জাতীয় সংসদে মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে No confidence Motion এনে মোশতাককে out করতে হবে। অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হলে আমাদের সার্বভৌমত্ব খর্ব হবে। আর ভারতই বা কেন এই অবস্থায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে? ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আর্মি crack down-এরপর সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভারতে গিয়ে ভারত সরকারের সহায়তায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করেছিলাম। ভারতের মত পৃথিবীর বহু

www.nagorikpathagar.org

দেশ বিপুল পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেছে। এখনকার পরিস্থিতি ভিন্নতর। মোশতাক বাংলাদেশী, বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার একজন সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি এই সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়, তাহলে দেশের অভ্যন্তর থেকে তা করতে হবে। ভারতে গিয়ে নয়। এই পরিস্থিতিতে আমার অনুরোধ, আপনারা কেউ ভারতে যাবেন না।

সৈয়দ আনোয়ার চৌধুরী বা অন্য কোন নেতা কোন কথা বললেন না, শুধু একে অপরের দিকে চাওয়া চাউয়ি করতে লাগলেন। মিটিং শেষ হল। এর কিছুদিন পর সত্যি সত্যি কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে চলে যায়। তারা কিন্তু ফিরে আসে খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থানের কয়েকদিন আগে। সৈয়দ আনোয়ার চৌধুরীও ভারত থেকে ফিরে এসেছেন। হাতে একটা লিস্ট। ভারতে যেতে যারা নিষেধ করেছিলেন, তাদের বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভার একটা লিস্ট করছিলেন তিনি।

৩/৪ দিন পর খালেদ মোশাররফের সামরিক উত্থান ঘটল ঠিকই। জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হল। দ্রুত এই উত্থানের খবর রটে গেল বাংলাদেশের প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে। স্তব্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশের মানুষ। "আবার কি শেখ মুজিবের ভূত বাংলার মানুষের ঘাড়ের উপর চেপে বসবে।" মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত। বঙ্গ ভবনের আশপাশে লক্ষ জনতার ভীড়। কি হচ্ছে বঙ্গ ভবনের ভেতর। শুধু কারি কারি গাড়ী আনাগোনা। তিন দিন রেডিও টেলিভিশন বন্ধ। কোন প্রশাসন নেই দেশে। ৬ই নভেম্বর শেষরাত্রির দিকে শত শত ট্রাক বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থকে এসে গেছে ঢাকায়। স্লোগান হচ্ছে ট্রাক থেকে—সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। সিপাহীরা ইচ্ছুক জনতাকে ট্রাকে তুলে নিচ্ছে। শেষরাতে যেন ঢাকার মানুষ জেগে উঠেছে। অনাবিল আনন্দে মুহুর্মূহু স্লোগান হচ্ছে। নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার। সিপাহী জনতা ভাই ভাই।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে সিপাহীরা বেরিয়ে এল। অভ্যুত্থানকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। খালেদ মোশাররফ পালিয়ে নিস্তার পেলেন না। বহু অফিসারের সঙ্গে তাকেও হত্যা করা হল। অনেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। এই অভ্যুত্থান সংঘটিত করার জন্য বহু কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। কর্নেল মালিক ব্রিগেডিয়ার রউফ প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন সে সময়। সেই অর্থেই নাকি ব্যবসাক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার বিপ্লব সংঘটিত হয়।

জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে ডেপুটি সামরিক প্রশাসক পদে নিয়োগ দান করা হয়। বিচারপতি সায়েম হলেন চীফ 'মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এবং

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। জিয়া নিজে কখনও ক্ষমতা দখল করেননি। জাতির প্রয়োজনে তাকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ব্যাপক ষড়যন্ত্রের মুখে জিয়াকে ক্ষমতা সুসংহত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ঐ সময় আওয়ামী লীগের বহু নেতা কর্মী ভারতে চলে যায়। এরা সম্ভবত খালেদ মোশাররফের উত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল। কাদের সিদ্দিকীও ভারতে গিয়ে সীমান্ত এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে মাঝে মাঝেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিয়া সরকারকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। এই অবস্থা বজায় থাকে দীর্ঘ দিন। এরপর ভারতের সঙ্গে আলোচনা করে সীমান্ত এলাকার ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়া হয়। এদিকে জিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে, ভারত থেকে বিদ্রোহী গ্রুপ ফিরে আসে।

৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংঘটিত না হলে, খালেদ মোশাররফ ভারতের হাতে বাংলাদেশ তুলে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন। আওয়ামী কিছু নেতৃত্ব এ কথাও নাকি সেদিন প্রকাশ করেছিল—বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্র আজ নির্বাসিত। ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে, আলাদা একটা প্রদেশ হিসাবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে। নির্বাচন হবে। আমরাই এদেশের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব। ভারত আমাদের বিপদে আপদে সবরকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে। ঐ বিপ্লব সংঘটিত না হলে, আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বিত হতো। ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে হত বাংলাদেশের। বীর সিপাহী-জনতা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর জিয়ার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারছি। সেই মহান বিপ্লব দিবসের ছুটি পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছিল ভারতের অনুগত সরকার।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ভারতীয় পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে স্বাধীনতা ও আলোর পথে যাত্রার শুভদিন

সুরঞ্জন ঘোষ

আজ ৭ নভেম্বর। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। দিনটি আমাদের দেশের রাজনীতির ইতিহাসে সুবিখ্যাত। মোশতাকের নেতৃত্বে '৭৫-র পট-পরিবর্তনই ৭ নভেম্বর প্রসূতিমাত্র। সেদিকে স্মৃতিচারণ করা যাক। এখন থেকে ২৬ বছর আগে তথাকথিত জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের দল তাদের শাসনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় তংকালীন বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের বুকে একদলীয় বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের বিষপাথর চাপিয়ে দেয়। আওয়ামী-বাকশালীদের লুটপাট, হত্যা, খুন ও জালিমীপনার নজির স্মরণকালের এ বিষয়ক সব ঘটনাগুলোকে হার মানায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানুষের কথা বলার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নির্বিঘ্নে ধর্মপালনের অধিকার বাকশালী রক্ষীবাহিনীর বুটের নীচে শুকনো বাঁশ পাতার মতো মরমর করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সরকারি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উদ্বেলিত বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ আওয়ামী-বাকশালীদের এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অধীর হয়ে উঠে। তারা এই জঘন্য বন্দীদশা থেকে মুক্তির সুবাতাস খুঁজতে থাকে।

এমনি এক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে এক সর্বাত্মক সেনা-গণঅভ্যুত্থানে ভারতের দালাল বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের হোতা শেখ মুজিবের সরকার উৎখাত হয়। দেশের মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা উদার গণগন্ত্রী মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে নতুন করে সরকার গঠিত হয়। কট্টর আওয়ামী-বাকশালী এবং ভারতের তাঁবেদার চক্র আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মোশতাকের এই বিজয় এবং তাদের শোচনীয় পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। আওয়ামী বাকশালীরা তাদের পরিচিত সুবিধাভোগী সেনাকর্মকর্তা ও ভারতের 'র'-এর যোগসাজসে ষড়যন্ত্র আর সামরিক ক্যু-দেতার মাধ্যমে তাদের লূটপাটের সিংহাসন পুনরায় দখল করার

www.nagorikpathagar.org

নেশায় মেতে ওঠে। এ সময় আওয়ামী-বাকশালী চক্র ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির সূত্র ধরে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অজুহাতে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করে। আওয়ামী-বাকশালীদের হাবভাবে পরিষ্কার হয়ে পড়ে 'দেশটা যেহেতু আমাদের বাপের জমিদারী হলোই না, সুতরাং দেশটা ভারত এখনও দখল করে না কেন ?' এই মনোভঙ্গি থেকে এখনও তারা মুক্ত নয়। অপরদিকে '৭৫-র পটপবিরর্তনের অব্যবহিত পরেই ভারতের কোলে আশ্রয় নেয়া আরেক আওয়ামী কাদের সিদ্দিকীর গড়ে তোলা তথাকথিত কাদেরীয়া বাহিনীর সীমান্ত সন্ত্রাসে বাংলাদেশের বি ডি আর ও সীমান্তবর্তী থানার পুলিশ প্রশাসন তাদের অনেক তাজাপ্রাণ সদস্যদের হারায়। অনেকে কাদেরীয়া বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে চিরপঙ্গুঁত্ব বরণ করেন। কাদেরীয়া বাহিনীর অত্যাচারে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী গ্রমগুলোতে শান্তিপ্রিয় মানুষের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। ভারতে আশ্রিত কাদের সিদ্দিকী চক্র আর দেশের অভ্যন্তরে ভারতপন্থী সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফপন্থীরা মিলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অসার করে তুলে। অবশেষে ভারতের কুপরামর্শে ও ১৫ আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী বাকশালীদের মদদে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ তথাকথিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। ঢাকার সেনানিবাসে নিরপরাধ সৈনিকদের রক্ত ঝরায়। দেশমাতৃকার দুঃসময়ের মহাবীর সূর্যসৈনিক স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে হত্যার উদ্দেশে ঢাকা সেনানিবাসে আটক করে রাখে। মেজর জিয়াকে আটকের সংবাদ সেনাবাহিনীর সকল স্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার করে। এই সংবাদ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় দেশবাসীর মনেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়ার আকাশচুম্বী সমর্থন, দেশের জনগণের তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অন্যদিকে ভারতের মাতব্বরীমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের তখনকার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে সময়ের সাহসী প্রত্যয় এই তিনটি রাজনৈতিক গণচেতনা (People's general will) মিলে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র গণনায়ক মেজর জিয়ার পক্ষে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়। গোটা দেশের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা এবং সেনানিবাসের সৈনিকরা মেজর জিয়াকে বাঁচাতে, অন্য অর্থে ভারতের আগ্রসন থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে রাজপথে নেমে আসেন। তাদের হাতে সেদিন ছিল বাংলাদেশের পতাকা, বুকে মেজর জিয়ার ছবি আর গলায় আকাশ ফাঁটানো স্লোগান *'মেজর জিয়া এগিয়ে চল। আমরা আছি তোমার সাথে'।*

৭ নভেম্বরের এই সর্বাত্মক সেনা-গণঅভ্যুত্থান বাকশালীদের হাতের খেলনা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠীর নির্বোধ ক্রীড়নক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশররফের দেশদ্রোহী ভারতপন্থী প্রতিবিপ্লবকে সমূলে উৎপাটন করে। বাংলাদেশ ভারতীয় সেনা অভিযানের সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পায়। মেজর জিযার নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের আধিপত্য থেকে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশকে ভুটান ও সিকিমের মতো

www.nagorikpathagar.org

করদরাজ্য বানানোর দিল্লীর কুস্বপ্ন ভেঙে যায়। বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে ভারতের পরাধীনতা শৃংখল ভেঙ্গে আলোর পথে। স্বাধীনতার পথে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আটক অবস্থা থেকে ফুলের মালা গলায় বীর সেনানী জনতার প্রিন্স মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দিশাহীন জাতি, বিপদগ্রস্ত জনতা আর ভাইহারা সৈনিকদের মাঝে উপস্থিত হন অমানিশার অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হিসেবে। তাঁর নেতৃত্বের অপেক্ষায় অপেক্ষামাণ জনতাকে তিনি গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং ধর্ম-জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সময়োপযোগী আহবান শুনান। দেশের মানুষ জিয়াউর রহমানের আহবানে কায়মনোবাক্যে সাড়া দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার শপথ গ্রহণ করে। তাই, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ৭ নভেম্বরের আহ্বানই হল প্রকৃত গণতন্ত্র, জাতীয় অর্থনীতি বিনির্মাণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং দেশের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ও জাতিগত সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার গণতান্ত্রিক-মানবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কালজয়ী শুভ আহ্বান। ৭ নভেম্বরে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে খালেদ মোশাররফ চক্রের বিরুদ্ধে জনতার যে বিজয় তা হলো বাকশালী স্বৈরশাসক ও তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিজয়।

জনগণই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। আওয়ামী বাকশালী চক্রের নেতা শেখ মুজিব তা বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস তিনি, তার ৩২ নম্বরের বাড়ির ব্যালকনি কিংবা দিল্লীর গোপন ফরমান। স্বৈরশাসক শেখ মুজিবের এই হীন মনোবৃত্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি তার আমলে ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ে এবং ৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপিতে। গণতন্ত্রের মানস সন্তান জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম শুনালেন জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। শহীদ জিয়ার এই political philosophy মেনে চলার মধ্য দিয়েই শত বাধা-বিপত্তির পরও তাঁর গড়া বিএনপি আজ দেশনেত্রী বেগম জিয়ার নেতৃত্বে দেশের সর্ববৃহৎ দলে পরিণত হয়েছে। দেশের মানুষ এখন তাদের হৃদয়ের দল বলতে বিএনপিকেই বুঝেন। শ্রদ্ধার নেত্রী হিসেবে বেগম জিয়াকেই মানেন। বিএনপি এবং বেগম জিয়ার এই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা এবারের নির্বাচনে পুনরায় প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু হাস্যকর সত্য হলো শকুনিমনের শেখ হাসিনা বিএনপি এবং ৪ দলের এই বিপুল বিজয় মেনে নিতে পারেনি। প্রথমে তিনি স্থুল কারচুপির কথা বলে লোক হাসিয়েছেন। এখন তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও অভিযুক্ত করেছেন তার ভাষায় ভোট-কারচুপির অভিযোগে। এই কাথাগুলো বললাম একটা জিনিস বুঝার জন্য তা হলো—পৃথিবী বহুদূর এগিয়েছে। গত দুই দশকে পাল্টে গেছে অনেক দেশের রাজনৈতিক ভূখণ্ড পরিবর্তন পরিমার্জন কিংবা সর্বাংশে পতন হয়েছে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপের। ঐসব দেশে সেনাবাহিনীর জোরে জারি রাখা গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার (Tottalitariom political system) পতন হয়েছে। চীনও এখন মাওসেতুং-এর কথায় চলে না। অথচ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এখনও চলছে ফ্যাসীস্ট বাঙালী জাতীয়তাবাদী শেখ মুজিবের হিটলারী চিন্তার আলোকে। মুজিব কন্যা আওয়ামী লীগকে আধুনিক পৃথিবী অথবা বিকশিত আধুনিক গণতন্ত্রের স্বপ্নে স্বপ্নবান করতে পারেননি। আওয়ামী লীগ এখনও পড়ে আছে পরশ্রীকাতর, হিংসুটে, সন্ত্রাস লালন, হানাহানি এবং মিথ্যাবাজির রাজনীতিতে। তাই সংসদের বাইরে কিংবা ভেতরে আওয়ামী লীগকে শর্তহীন বিশ্বাসে নেয়া ঠিক হবে না দেশনেত্রীর এবং তাঁর ৪ দলীয় জোটসরকারের। গণতান্ত্রিক আচরণ তাদের বেলায় শোভা পায় যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন। স্বৈরতন্ত্রী, ফেরেববাজ ও ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক কুকাণ্ড ঘটানোর হোতা আওয়ামী লীগের ব্যাপারে সচেতন এবং সাবধান থাকতে হবে। এদের জন্য সরকারী নীতি হবে 'যেমন কুকুর তেমন মুগুড়'। কেননা, '৭৫-এ এরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্ষমতা হারিয়ে হত্যা, ষড়যন্ত্র ও সামরিক ক্যু দাতার পথে গদি ফিরে পেয়েছিল। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আর কোন হীন রাজনৈতিক চাল হিংসুটে নেত্রী হাসিনা চালবেন কি না কে জানে? সুতরাং দেশনেত্রী এবং তাঁর সরকারকে এক মুহূর্তের জন্যও শহীদ জিয়ার কথা ভুললে চলবে না। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস', আওয়ামী লীগ নয়। সুতরাং তাদের অতিরিক্ত তোয়াজ তোষামোদের প্রয়োজন নেই।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। দিবসটি তার গুরুত্বের কারণেই বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছে। এই দিনে বাংলাদেশের মানুষ অপশক্তির সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির স্থাপন করতে সমর্থ হয়। সিপাহী-জনতার অপূর্ব সংহতি স্থাপিত হয়। দেশ ও মাটির শত্রুরা এদিন সবার সামনে চিহ্নিত হয়ে যায়। এই দিন দেশের সর্বস্তরের মানুষ নতুন অনুভবে স্বকীয় সত্তার বুনিয়াদ মজবুততর করে তোলে। ঈদের খুশির আমেজে বিজয়ের অপূর্ব পরশে সমগ্র বাংলাদেশ আনন্দ-উৎসবে মিলিত হয়। মহানগরী ঢাকার রাজপথ সিপাহী-জনতার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর সমগ্র জাতি এক অনন্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, সংহতির এক অবর্ণনীয় ছটা ছড়িয়ে পড়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ—জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতার ঐক্য—জিন্দাবাদ ইত্যাদি হৃদয় নিংড়ানো শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস। পদ্মা-মেঘনা-মধুমতি আর রূপসার কূলে কূলে জোয়ার আসে আনন্দ-উল্লাসের। বিপ্লবের অফুরন্ত আনন্দ অনুভবে জেগে ওঠে সমগ্র জাতি। জেগে ওঠে সমগ্র বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো এদেশের মাটি আর মানুষ জাত বিপ্লবী। কোনোদিন এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী কারো তাঁবেদারী মেনে নেয়নি। কিন্তু কেউ যদি এদেশের মাটি ও মানুষকে ভালবেসে এদেশে স্থায়ী আবাস স্থাপন করেছে, একাত্মতা ঘোষণা করেছে—এ দেশের সাথে সেও হয়ে উঠেছে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে সোচ্চার, হয়ে উঠেছে বিপ্লবী। আমরা জানি সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন বাংলার বিদ্রোহ দমন করে এখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন তারই পুত্র বুগরা খানকে। কিন্তু দেখা গেল বুগরা খানও বিপ্লবের এই উর্বর ক্ষেত্রে এসে এদেশকে ভালবেসে ফেললেন, তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে এদেশ পরিচালনা করেন। বাংলার মাটি সত্যি এক দুর্জয় ঘাঁটি।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য হারিয়ে গেল। এদেশটা ইস্ট

www.nagorikpathagar.org

ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা সাত সমুদ্র তের নদীর পারের বেনিয়া ইংরেজদের খপ্পরে চলে গেলে এদেশের প্রতিবেশী সমাজ অর্থাৎ জগৎ শেঠদের সমাজ তাদের সাথে হাত মিলালেন। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথা তৌহিদী জনতা পরাধীনতার শৃঙ্খল মেনে নেয়নি। তারা ঋজুতার বৈভবে মাথা উঁচু করে থেকেছে। ফকীর মজনু শাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে, তিতুমীরের নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, হাজী শরীয়তুল্লাহ, পীর দুদু মিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন রেখেছে। এদেশের মানুষ জান দিতে রাজি কিন্তু স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে রাজি নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার বৃহৎ মানবগোষ্ঠী দারিদ্র্যকে আপন করে নিয়েছে, কিন্তু স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে কখনও পশ্চাদপদ হয়নি। ইতিহাসের পতায় পাতায় এদেশের মানুষের বিপ্লবী ভূমিকার তেজোদীপ্ত কাহিনী জ্বলজ্বল করছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিপ্লবের সময় ঢাকার রাজপথে চলমান আশুরার মিছিল পরিণত হয়েছিল বিপ্লবী মিছিলে। ইংরেজ বিরোধী সে মিছিল ব্রিটিশ শোষকদের দুর্গে আঘাত হেনেছিল। এতে ঢাকা নগরীর কত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল তার হিসাব রাখা হয়নি। পুরাতন ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে সেসব শহীদানের স্মৃতি মিনার এখন তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর পুরাতন ঢাকার মানুষের মুখে তাদের সেই বীরত্ব কাহিনী এখনও শোনা যায়।

১৯০৫ খ্রির্স্টাব্দে বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বকীয় সত্তা বিকাশের সুযোগ লাভ করে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। কিন্তু সেই পূর্ব বাংলা তথা আজকের বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা বিকাশকে সেদিন মেনে নিতে পারেনি প্রতিবেশী সমাজ। ইতিহাসের সত্য কথনে সেই দিনগুলোর স্বাক্ষর লিখিত রয়েছে স্পষ্ট হরফে। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য প্রতিবেশী সমাজ উঠে-পড়ে লেগে যায়। প্রতিবাদ, হরতাল, মিছিল, জনসভা এমনকি সন্ত্রাসের পথ তারা বেঁছে নেয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে কাশিম বাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজা সভাপতির ভাষণে সেদিন বলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বাঙালী হিন্দুরা পরিণত হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজে। আমাদের নিজেদের দেশে আগন্তুকের মত থাকতে হবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যৎ যে কি হবে তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

বিশিষ্ট নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিতো পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠনের তীব্র নিন্দা করে বলেন, এই বিভক্তির ফলে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে। কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেয়। শুরু হয় অরাজকতা, সন্ত্রাস, বোমাবাজি। কংগ্রেস নেতা বাল গংগাধর তিলক হিন্দু জাতীয়তাকে সুসংহত করা জন্য শিবাজীকে হিন্দু জাতীয় বীরের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমরা জানি শিবাজী মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে মুসলিম নিধনের শপথ নিয়ে তার সন্ত্রাসের নখর চালিয়েছিল। অথচ সেই শিবাজীকেই হিন্দুদের বীর এবং তার সংগ্রামকে জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা করা হয়। (দ্র. এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস পৃঃ ২০৫-২০৬)। এমনিভাবে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন সাক্ষ্য যদি গ্রহণ করি তাহলে সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, বাংলাদেশের মানুষকে তাদের ভাগ্য রচনার ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বার বার। কিন্তু 'বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই সেই লড়াইয়ে জিততে হবে'—এই দৃঢ় শপথে এখানকার মানুষ এগিয়ে চলেছে সকল বাধাকে ছিন্ন করে।

উপমহাদেশের মুসলমানদের আলাদা ভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এদেশের মানুষ অগ্রণী ভূমিকা রাখে। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানকে পাঞ্জাবী চক্রের খপ্পরে এনে যখন বাংলার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছিল, এদেশের মানুষের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করে ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠেছিল, তখনও এদেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। বিপ্লবের নতুন সড়কে তারা সংঘবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ১৭ দিন পর এদেশের ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গঠিত হয় তমুদ্দুন মজলিস। আর এই মজলিসই রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—এই চেতনার বীজ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের মহাসড়ক নির্মাণ করে। সৃষ্টি হয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য প্রাণ দেন সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক প্রমুখ। সময়ের গতিবেগ বাংলার মানুষের বিপ্লবকে ঠেকাতে পারেনি। অপরিহার্য কারণেই ১৯৭১ সালের ন'মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নয় মাসের যুদ্ধে তারা প্রাণ দিয়েছে জান দিয়েছে, হানাদার বাহিনীর ঔপনিবেশিক দন্তনখর ভেঙে দিয়েছে। ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা-সূর্যকে একান্ত আপনার আঙিনায়। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটেছে। উড্ডিন হয়েছে সবুজ চত্বরের ওপর রক্ত রাঙ্গা বিপ্লবের ছাপমাখা পতাকা। কিন্তু তার পরেও এদেশের মানুষ সহসা হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। তাদের মনে প্রশ্ন উদয় হয়েছে আমরা কি এক হানাদার থেকে মুক্ত হয়ে আরো এক হানাদারের খপ্পরে পড়লাম? ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মনের ভেতর প্রশ্ন গুমরে মরেছে, তারা আশার স্বপ্ন দেখেছে, সময়ের অপেক্ষায় থেকেছে। ১৯৭৪ সালের মহাদুর্ভিক্ষে তারা জর্জরিত হয়েছে। চারদিকে রব উঠেছে—অন্ন চাই-বস্ত্র চাই বাঁচার মত বাঁচতে চাই। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো'। ছড়ার রাজ্যে বিদ্রোহ এসেছে, 'ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা/ রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা।' এদেশের মানুষ উচ্চারিত হতে শুনেছে, 'সবাই পায় হীরার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি, চাটার দল সব চেটে খেলো, আট কোটি কম্বল এলো আমারটা কই'? মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে সোচ্চারিত হয়েছে বিপ্লবের মহামন্ত্র। লুটপাট সমিতির বিরুদ্ধে তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিপ্লবী মোর্চা। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের ইতিহাস মূল অরাজকতার ইতিহাস। লুট, খুন, আর গুমের ইতিহাস। এ দেশের সম্পদরাজি প্রতিবেশী দেশে পাচারের ইতিহাস। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে শ' শ' মানুষের না খেয়ে মরার ইতিহাস। এ সব খবর ছাড়াও রয়েছে রক্ষীবাহিনীর কাহিনী, দেশপ্রেমিকের হত্যা, লাল ঘোড়া দাবড়ানো কাহিনী। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার করুণ কাহিনী, দেশপ্রেমিককে হত্যা করে দম্ভভরে আস্ফালন করা ইত্যাদি। সৃষ্টি হয়েছে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের। রচিত হয়েছে পট-পরিবর্তনের ইতিহাস। তারপর চলেছে সময় আপনার গতিতে। এ দেশের মানুষের অন্তরে এসেছে প্রশান্তির ছোঁয়া।

দু'লাখ মসজিদের এই দেশে, শ' শ' অলী-আউলিয়ার এই দেশে ধর্মহীনতার যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে যেনো বাংলার মানুষ নতুন করে বুক ভরে স্বাধীনতার বাতাস গ্রহণ করেছে। তারা যেন খাঁচার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীনভাবে শক্তি লাভ করেছে। তারা যেনো আর এক ঈদের অনুভবে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ষড়যন্ত্র চলতে থাকে অতি সন্তর্পণে অতি নীরবে, নির্জনে। ষড়যন্ত্রকারীরা আঘাত হানে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে। ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত বাংলার মানুষ হতবাকের মতো তাকিয়ে থাকে। সবার মুখে একই প্রশ্ন—কি হয়েছে? মানুষের মনে সমূহ বিপদের আশংকা। এবার বুঝি আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের স্বাধীন সত্তাকে। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার বুঝি সম্প্রসারণবাদীদের খপ্পরে পড়ে যায়। কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৭ নভেম্বর গভীর রাতে নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ—জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্য দিয়ে নীরব বিপ্লবের মহাবিজয় ধ্বনিত হলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে হানাদারদের আঘাতে বাংলার মানুষ যখন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল আর সেই মুহূর্তে যে মহান নেতা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সশস্ত্র লড়াইয়ে জাতিকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন সেই মহান নেতা সিপাহসালার জিয়াউর রহমান এগিয়ে এলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে বন্দী করে রেখেছিল কিন্তু সত্যিকার দেশপ্রেমিকরা তাকে বের করে আনেন। চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল—জেনারেল জিয়া, জেনারেল জিয়া—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ-বাংলাদেশ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

আর বিপ্লবের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো, আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ হলেও জাতি হিসেবে এ দেশের মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। পৃথিবীর কোনো শক্তিই এর স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এদেশের মানুষ চিরবিপ্লবী। তারা সেদিন দৃঢ় প্রত্যয় নিলো কোনো অপশক্তিকে বা কোনো হানাদারকে প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না, আমার সাহিত্য, আমার সংস্কৃতি, আমার ইতিহাস, আমার ঐতিহ্য, আমার জীবন-চেতনা সবই আমার নিজস্ব—এসবকে লালন করবো আমরা সবাই মিলে, আমরা সবাই মিলে অনেক কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা রক্ষা করব, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলব। আর এখানেই ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য নিহিত।

www.nagorikpathagar.org

তাৎপর্যমণ্ডিত ৭ নভেম্বর ঃ ফিরে আসা, ফিরে দেখা

ড. আফতাব আহমাদ

৭ নভেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি লাল হরফ দিবস। আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় অস্তিত্ব নিয়ে আমরা যতদিন এই ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকব ততদিন বারে বারে ফিরে আসা এই দিবসটি আমাদের হতোদ্যম জীবনে নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। আমাদের সকল অসহায়ত্ব ও ব্যর্থতাকে ঝেরে ফেলার এক অনির্বচনীয় তাগিদ আমরা অনুভব করি এই দিবসটিতে। সকল কাপুরুষতা ও হীনমন্যতাকে বিসর্জন দিয়ে এক মুষ্টি খুদ-কুঁড়োর জন্য আত্মাকে বিক্রি করে হাঁটু ভেঙ্গে পেটের উপর হামাগুড়ি দিয়ে সমর্পণবাদী দাস মনোবৃত্তি ত্যাগের প্রণোদনা যুগ যুগ ধরে যুগিয়ে যাবে এই লাল হরফ দিবসটি। ৭ নভেম্বরে প্রজ্বলিত শিখাই দিক-ভ্রান্ত জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে। কারণ এই শিখাই আলোকবর্তিকা হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমাদের জাতিকে তার সিরাতুল মোসতাক্বীমে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যাবার অনিমেষ সাহস যোগাবে।

কি এমন ঘটেছিল ৭ নভেম্বরে? ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টে একবার ফিরে দেখা যাক। পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী অবিমৃষ্যকারী শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর ও বর্বর গণহত্যা যখন আমাদের অজেয় জনতাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করে তখন থেকে শুরু হয় আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধে একের পর এক বিরল সামরিক সাফল্য আমাদের অভিষিক্ত করে অতুলনীয় মর্যাদায়। এই সময় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সংশ্লিষ্টতা, সহানুভূতি ও মানবতাবোধ সঞ্জাত ছিল না। সহমর্মিতার আড়ালে ভারতের সকল পদক্ষেপই ছিল সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী। আর এই জন্যই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সেজেও ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করেছিল নিম্নমানের সমরাস্ত্র এবং গোটা দেশেই একটি সুপ্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী দক্ষ নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার ঘোর বিরোধিতা করে আসছিল। অবশ্য বঙ্গবীর ওসমানী ও দেশনায়ক জিয়ার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ও অটল মনোভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় কুচক্রীরা মুক্তিবাহিনীকে স্থায়ী ব্রিগেড গঠন করতে দিতে রাজি হয়। আর এভাবেই পর্যায়ক্রমে জন্ম নেয় জেড ফোর্স, এস ফোর্স ও কে ফোর্স—যা পরবর্তীকালে আমাদের সেনাবাহিনীর মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

www.nagorikpathagar.org

ভারতীয়দের মেকী দরদ ও ছলনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা যখন রণাঙ্গনে একের পর এক বিজয় অর্জনের মাধ্যমে আমাদের অবিনাশী জাতীয় শক্তির প্রমাণ রচনা করছিল তখন ভারতীয়দের পরশ্রীকাতরতা ও হীনতা এক বীভৎস রূপ ধারণ করে। যৌথ কমান্ডের ছদ্মাবরণে ভারতীয় সামরিক আধিপত্য বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের সকল গৌরব ছিনতাই করে ভারতীয়রা তা আত্মসাৎ করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত অতি উচ্চমানের সামরিক সরঞ্জামাদি ও অস্ত্রভান্ডার ভারতীয়রা লুট করে নিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের অন্যতম জাতীয় দিবস। এই দিবসটি গৌরব ও গ্লানিতে মেশানো আমাদের জন্য এক বেদনাবিধুর দিবস। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপর ভর করে আওয়ামী তস্কররা একটি দলীয় সরকার এদেশবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়, যখন সময়ের দাবী ও চাহিদা ছিল একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী দুর্বৃত্তরা এদেশের সম্পদ ও অর্থ লুণ্ঠন করে গোটা অর্থনীতিটাকেই ফোকলা করে ফেলে। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি জারি রাখে এক মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী শাসন। হত্যা, গুম, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং সহিংসতা ও সন্ত্রাস ছিল এই শাসনকালের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গণতন্ত্র, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবতা, আইনের শাসন এবং সকল সুনীতি ও শ্রেণীচেতনা এই সময়ে এদেশ থেকে নির্বাসিত ছিল। আমাদের অজেয় জনসাধারণ কিন্তু নীরবে-নিশ্চুপে এই পরিস্থিতি মেনে নেয়নি। তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্ষমতাসীন লুটেরাও স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ঘোষণা করে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

স্বজনতোষণকারী, দুর্নীতিবাজ মুজিব বাহিনী ক্ষমতাকে একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ করার জন্য দেশ ও দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেয় একদলীয় ও এক ব্যক্তির শাসন।

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট এক অনন্যসাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমগ্র জাতি নাজাত লাভ করে। ক্ষমতালিপ্সু মুজিব সপরিবারে নিহত হয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে পূর্ণতা দান করার পথ অবারিত করে তোলে। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী সরকার ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা অত্যন্ত দুর্বল একটি সরকার। সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় চর ও নিয়োগীরা সংগোপনে তৎপরতা চালায় বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ভারতের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার এবং ভারতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি শিখণ্ডী সরকার প্রতিষ্ঠার। ঐ তৎপরতা ও কর্মজালের অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন ৩ নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান।

ততদিনে বাংলাদেশের মানুষ, দেশপ্রেমিক সিপাহী ও সশস্ত্র বাহিনী দোলাচলের ব্যূহ ভেদ করে সম্বিৎ ফিরে পায় এবং উপলব্ধি করতে পারে রাষ্ট্রঘাতী চক্রান্তের স্বরূপ। প্রতিটি

www.nagorikpathagar.org

সেনাছাউনিতে প্রস্তুতি পালা শুরু হয়। ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর অন্যতম সংগঠন জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা প্রতিবিপ্লবী তৎপরতার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সিপাহী ও সশস্ত্র বাহিনীর গৌরব ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এবার কিন্তু ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া হয়নি। দেশপ্রাণ সকল শক্তি এবার পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও সাবধানতা অবলম্বন করেই মাঠে নেমেছিল। এতদসত্ত্বেও বহু দক্ষ সেনা অফিসারকে ভারতীয় বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাতে হয়। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলা। আর তাই সকল ষড়যন্ত্রের জাল অঙ্কুরেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়। প্রথম মুহূর্ত থেকে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর গতিরোধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ৭ নভেম্বরকে জাসদের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' যতই নিজেদের কৃতিত্ব বলে জাহির ও দাবী করার চেষ্টা করে থাকুক না কেন তা আদৌ ধোপে টেকেনি। দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ও সিপাহীরা সমরভান্ডার নিয়ে সেনাছাউনি ছেড়ে রাজপথে জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে এক বোলন্দ আওয়াজ উচ্চারণ করে। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে 'জয়বাংলা' ধ্বনির (যা দলীয়করণে ও জ্ঞাতার্থ হারিয়ে ফেলার কারণে জনগণ কর্তৃক বর্জিত হয়) পাশাপাশি আল্লাহু আকবার ধ্বনিও শোনা যেত। শুধু তাই নয়, সরকারী বহু প্রচারপত্রের শীর্ষেও মুদ্রিত থাকত আল্লাহু আকবার। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হস্তক্ষেপে ১৬ ডিসেম্বরের পর এ ধ্বনি আর প্রকাশ্যে উচ্চারিত হতে দেখা যায়নি। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের ললাটে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' তকমা এঁটে দেয়া হয়, যা এদেশের মানুষ কখনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি ও মেনে নেয়নি। সিপাহী-জনতার অটুট ঐক্য ও একাত্মতার মধ্য দিয়ে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের মানুষকে তার সঠিক পরিচয় ও ঠিকানার সন্ধান দেয়। এদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ এবং ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের সঠিক ও প্রকৃত পরিচয় এবং ঠিকানা। ৭ নভেম্বর প্রত্যুষে ঢাকার রাজপথে সিপাহী-জনতার যে ঢল নেমেছিল তা এদেশবাসীর নবজন্মের সমতুল্য। মানুষের যে অনুভূতি, স্পৃহা, চেতনা ও অভিমত এতদিন ((১৯৭২-৭৫) অবদমিত ছিল তা বিমুক্ত হয়ে এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি সুখের উল্লাসের জন্ম দেয়। ভয় নামক পিছুটানের অপশক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাজপথ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ৭ নভেম্বর সমগ্র জাতি যেন ঢাকার রাজপথে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করল। ভারত-সোভিয়েত অক্ষশক্তির সকল বন্ধন ও সূত্র ছিন্নভিন্ন করে আপন মহিমা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের পূর্ণতা লাভ করে বাংলাদেশ।

৭ নভেম্বর আমাদের 'না' বলতে শিখিয়েছে। ৭ নভেম্বর আমাদের রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। ৭ নভেম্বর আমাদের মাথা উঁচু করে হাঁটতে শিখিয়েছে। ৭ নভেম্বর আমাদের

www.nagorikpathagar.org

আত্মপরিচয় ও ঠিকানার সন্ধান দিয়েছে। ৭ নভেম্বর আমাদের জনজাগৃতিক জোয়ার সৃষ্টি করা শিখিয়েছে। ৭ নভেম্বর আমাদের ইতিহাস চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছে। ৭ নভেম্বর আমদের ঐতিহ্য ও গণমানুষের সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে শিখিয়েছে। ৭ নভেম্বরের ঘটনাপরম্পরা দেশনায়ক জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। তিনি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমৃত্যু তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যান।

সাহস বিস্তৃত বক্ষপটে পুষ্পের মত বুলেটকে বরণ করে নিয়ে বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করে বিজয় কিভাবে ছিনিয়ে আনতে হয় ৭ নভেম্বর সে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

জিয়াউর রহমানের শাসনকালেই আমরা এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের রক্ষাকবচ চিহ্নিত করতে সক্ষম হই। কালের আবর্তে প্রতিবছর আমরা যখন ৭ নভেম্বর পালন করি তখন যেন আমরা ঐ রক্ষাকবচ সম্পর্কে বিস্মৃত না হই। পাঁচটি বিশেষ উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এই রক্ষাকবচ। ইসলাম; দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী; জাতীয় জনগণতন্ত্র; গণসংস্কৃতি এবং ইতিহাস-চেতনা— এই পাঁচ উপাদান হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ। জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতার কামড়াকামড়ির বাইরে গরিষ্ঠের মুক্তি, পরিত্রাণ ও নির্ভর জনগণের যে গণতন্ত্র তার উদ্বোধন ও চর্চা অপরিহার্য— এই হচ্ছে জাতীয় জনগণতন্ত্র। অধিপতি শ্রেণী এবং বিত্তবানের পরাশ্রয়ী সংস্কৃতি নয়, বিপুল গরিষ্ঠ মানুষের অনুভূতি ও মূল্যবোধনির্ভর গণসংস্কৃতি হচ্ছে এদেশের সাচ্চা কৃষ্টিক বুনিয়াদ, শৌর্য-বীর্য ও গৌরবগাথার ঘাত-প্রতিঘাত ও পরম্পরা আমাদের যে ঐতিহ্য ও ইতিহাস-চেতনা নির্মাণ করেছে তাকে বিসর্জন দিয়ে বা অস্বীকার করে আমাদের জাতীয় বিকাশ অসম্ভব। ৭ নভেম্বর জাতির রক্ষাকবচ হিসেবে যে অত্যাবশ্যক পাঁচটি উপাদান আমাদের উপহার দিয়েছে তাকে সযত্নে লালন ও পরিচর্যা করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনে কোন একটি নির্দিষ্ট দিবস থাকে, যা সে জাতির জাতীয় অগ্রযাত্রায় শুকতারার ভূমিকা পালন করে। ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে তেমনি একটি দিবস—৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে শুকতারা। তাই যখনই দিবসটি ফিরে আসে, ইতিহাসে অবগাহন করে ফিরে দেখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ পথেই আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব।

সমর্পণবাদ ও ভারততোষণ মুক্তির অন্তরায়। এই হচ্ছে ৭ নভেম্বরের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

www.nagorikpathagar.org

আজকের বাংলাদেশ ও ৭ নভেম্বর-এর তাৎপর্য

ড. আফতাব আহমাদ*

আবার ফিরে এসেছে ৭ নভেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনে এ গৌরবদীপ্ত দিবসটি লাল হরফে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। ৭ নভেম্বর আমাদের প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের ভাষা। ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের রক্ষাকবচ। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত এ-অঞ্চলে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল, ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর এদেশের অকুতোভয় লড়াকু জনতা সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক বীর সিপাহীদের সঙ্গে এক বিরল ও অনন্য জঙ্গী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে তার সমুচিত জবাব দিয়েছিল। আজ আবার আরও গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে ফিরে এসেছে সেই ৭ নভেম্বর।

এই দিবসটির তাৎপর্য এক লহমায় বোঝা দুরূহ তো বটেই। এর প্রেক্ষাপটটি যদি আমরা অনুধাবন না করি তা হলে অন্ধের হস্তি দর্শনের মতই আমরা হরেক রকম অসংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকব।

একবার আসুন আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই কালপন্‌জি আমাদের অন্তরবেদী দৃষ্টির সামনে মেলে ধরি। আজকাল কথায় কথায় সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে তার সর্বশেষ স্তাবকের স্তোত্রপাঠের সময় '৭২ থেকে '৭৫-এর গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগের কথা শুনতে হয়। কেমন ছিল এই স্বর্ণযুগের প্রকৃত স্বরূপ ?

মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ করে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহায়তায় লুটেরা দুর্বৃত্ত শ্রেণী এদেশের মানুষের সঙ্গে চরম প্রহসন করে। মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের যে পুণ্য ব্রত নিয়ে আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তাকে অস্বীকার করে ক্রমেই ফুলে-ফেঁপে বেড়ে উঠেছিল আওয়ামী দুঃশাসনের নরক যন্ত্রণা।

২৫ বছরের শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির নামে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে ভারতের কাছে বন্ধক দিয়ে আওয়ামী লীগ রাজ নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার ন্যক্কারজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার স্বাধীনতাকে

টীকা : * বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সহ-সভাপতি এবং দেশের প্রধান বিরোধী দলীয় জাতীয় দৈনিক অধুনালুপ্ত গণকণ্ঠ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

হরণ করে গণতন্ত্রের নামে এক পৌত্তলিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং বিরুদ্ধ মতকে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায় আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী। '৭২ থেকে '৭৫ প্রায় ৪২ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা হত্যা করে। প্রায় ৮৬ হাজার বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীসমর্থকদের কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়। ভারতীয় পরিকল্পনা মোতাবেক এবং ভারতের মদদপুষ্ট জাতীয় রক্ষীবাহিনী ক্ষমতাসীনদের ঝটিকাবাহিনী হিসেবে সারা দেশে আতংক ছড়িয়ে দেয়। আওয়ামী লীগের দালাল সংগঠন মুজাফফরের ন্যাপ এবং মণি সিং-এর সিপিবিও আওয়ামী সন্ত্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। সিপিবির ওয়ালিউর রহমান লেবুকে ৭৩-এর জাতীয় নির্বাচনের অব্যবহিত পরই গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। একইভাবে মেরে ফেলা হয় ন্যাপ (মো)-এর কমলেশ চন্দ্র দাসকে, ছাত্র ইউনিয়নের লুৎফর রহমান মানিক ও শ্যামল ব্যানার্জিকে। (গণকণ্ঠ, ১১মার্চ ১৯৭৩) এককথায় আওয়ামী লুটেরা গোষ্ঠী সারা দেশে মুজিবী ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করে।

কেমন ছিল এই ফ্যাসিস্ট মাসনের স্বরূপ ? আওয়ামী ঘরানার প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০ -এর মতে ঃ "ফ্যাসিবাদী সরকার নিজেদের ক্ষমতার অচলায়তন নির্মাণের লক্ষ্যে দমনপীড়ন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই নব উত্থিত যুবশক্তি বিশেষ করে রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চন্ডনীতি বাংলাদেশকে সংঘাতময় করে তোলে। ক্ষমতাসীনদের বিভিন্ন বাহিনী বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে গঠিত আধাসামরিক রক্ষীবাহিনী অন্যদিকে লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মতো কয়েক নামের দলীয় বাহিনীর দমন-পীড়ন হত্যা এদেশে রাজনৈতিক হত্যার সূচনা করে। ... রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন আওয়ামী লীগ নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য ঐ হত্যার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। খোদ প্রশাসনের নাকের ডগায় পাবনা শহর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়ায় স্থাপিত ঘোষিত কসাইখানায় রাজনৈতিক বিরোধীদের ধরে এনে হত্যা করা হত। আর সে সকল হত্যাকান্ডের প্রকারও ছিল বিচিত্র ধরনের। বন্দীদের শিং মাছ ভরা টবে চুবিয়ে, গাছের ডালে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে কোপ দিয়ে মাথা কেটে নিয়ে আরো বিচিত্র উপায়ে হত্যা করা হত। কথিত আছে কুষ্টিয়ার ক্ষমতাসীন দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নিহত ব্যক্তির মাথা কেটে থালায় করে দেখানো হত। নিয়মিত এই দৃশ্য দেখে তার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। এমনকি জেলখানায় ঢুকে বিরোধীদের তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে এই সময়ে (অনিরুদ্ধ ইসলাম, "২৭ বছরের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঃ ঘাতক অনুসন্ধান ", মাহফুজ আনাম প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০, ৫ নভেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৯)।

www.nagorikpathagar.org

এ সকল অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মুক্তিযোদ্ধা স্টুয়ার্ড মুজিব হত্যা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নেভাল সিরাজ হত্যা, সিদ্দিক মাস্টার হত্যা, সাবেক গণপরিষদ সদস্য মোশাররফ হোসেন হত্যা, বিমানের নূর হোসেন হত্যা, গণকণ্ঠের শাহজাদপুরের সংবাদদাতা শহিদুজ্জামান হেলাল এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা বোরহান উদ্দীন রোকন হত্যা উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি সিরাজ শিকদারের হত্যা রাজনীতিতে এক চরম কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই হত্যার রাজনীতিকে রাষ্ট্রীয়করণ দেয়া হয় রক্ষীবাহিনীর হাতে যে-কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ ও আটক করে রাখার মতো ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে।

রাষ্ট্রীয়করণের নামে চলছিল কলকারখানার বেপরোয়া লুটপাট। চোরাকারবারী, কালোবাজারীসহ উৎপাদনবিমুখ সকল কর্মকাণ্ড অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। জনগণ প্রতারণার জন্য লোক দেখানো আওয়ামী ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করে ক্ষমতাসীস দলের সংসদ সদস্য সিরাজুল হক (বর্তমান মুজিব হত্যা মামলার সরকারি আইনজীবী) ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ জাতীয় সংসদে বলেন " 80 % of the smugglers that have so far been arrested are petty fellows... We are to run after big smugglers who were [running] to Dhaka [for their life] and for that matter to the chambers of the big leaders (*জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা ,১৬, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৯৩০ ; জনাব হক ইংরেজিতে সংসদে তার বক্তব্য প্রদান করেন, এখানে অবিকৃতভাবেই তাঁর ভাষ্যটি উদ্ধৃত করা হল)*। তাজউদ্দীন আহমেদ আরও চমৎকারভাবে বলেছেন, "পুলিশ যখন চোর, ডাকাত ও হাইজ্যাকারদের গ্রেফতার করে, তখনই মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে বা উচ্চ মহল থেকে তাদের মুক্তির জন্য টেলিফোন আসে"। (গণকণ্ঠ ঃ ১১ মার্চ, ১৯৭৪)। প্রশাসন, সমাজ ও জাতীয় অর্থনীতির যে পরিণতি আওয়ামীরা ডেকে এনেছিল তার জন্য আওয়ামী লীগ অর্থাৎ AL -কে বিদেশীরা Association of Looters বা লুটেরাদের সমিতি অর্থাৎ লুটপাট সমিতি নাতে অভিহিত করা শুরু করে। আর তাদের নিমর্ম নির্যাতন ও নিষ্পেষণের জন্য অনেকে AL -কে আল্লাহর লানত্ নামেও অভিহিত করা শুরু করে।

গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগে বাংলাদেশের দুর্নীতির চিত্রটিও বেশ বর্ণাঢ্য। ১৯৭৩-এর গোড়ার দিকে খোদ শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন যে, সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত শিল্প লাইসেন্সের মধ্যে ১২৭৭টি ভুয়া (পূর্বদেশ ঃ ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৩)। বাণিজ্যমন্ত্রী কামরুজ্জামান স্বীকার করছেন যে, ২৯০০০ আমদানিকারকদের মধ্যে ১৪০০০ই ভুয়া (হলিডে ঃ ৩ জুন ১৯৭৩)। আরো তথ্য আছে— ৫০% রেজিস্ট্রিকৃত হ্যান্ডলুম ভুয়া (পূর্ব দেশ ঃ ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৩)। কেবল '৭২-'৭৩ এই সময়ের মধ্যে ৬০০০ পরিত্যক্ত বাড়ি আওয়ামী কর্মীরা বেআইনী দখলে নেয় এবং ৭০০০ বাড়ির অবৈধ মালিকানা লাভ

www.nagorikpathagar.org

করে (গণকণ্ঠ ঃ ১ জুন, ১৯৭৩)। আদমজীতে ৮০০০ ভুয়া শ্রমিককে নিয়োগদান করা হয় যারা নিয়মিত বেতন পেত (বাংলাদেশ অবজারভার ঃ ২২ জুন, ১৯৭৩)। সূতা কেলেংকারিকে কেন্দ্র করে একটি সরকারি তদন্তে ৩ লাখ ভুয়া তাঁতী সনাক্ত হয়, কিন্তু দলীয় স্বার্থের খাতিরে তদন্ত রিপোর্ট ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয় (গণকণ্ঠ ঃ ১৪ মে, ১৯৭৪)। ১৯৭৩-এর গোড়ার দিকে কেবলমাত্র রাজধানীতে ১২ লাখ ভুয়া রেশন কার্ডের সন্ধান পাওয়া যায় (গণকণ্ঠ ঃ ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৩)। এই সবই আওয়ামী লুটেরাদের অনন্য কৃতিত্ব বটে।

মুজিবী দুঃশাসনে দেশের অর্থনীতির চরম বিপর্যয় ঘটে। চোরাকারবারী এবং চোরাচালানী দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে অর্থনীতির অধঃপতনে সক্রিয় ছিল। আওয়ামী মহিলা সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগমের পৈতৃক নিবাস থেকে অস্ত্রসহ চোরাই পথে আনিত বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী সেনাঅভিযানে উদ্ধার করা হয় (ইত্তেফাক ঃ ১২ মে, ১৯৭৪)। ফুলের মতো পবিত্র আওয়ামীদের চরিত্র। আওয়ামী কলামিস্ট আবেদ খান ঐ সময়ে ১৯৭৩-এ ইত্তেফাক-এ চোরাচালানের উপর "ওপেন সিক্রেট" নাম দিয়ে একটি সিরিজ রচনা করেন। সেই সিরিজটিতে আওয়ামী লুটপাটের বহু কাহিনী তুলে ধরা হয়। এমনকি তখনকার বিডিআর প্রধান বর্তমানে কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির সভাপতি তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার সি আর দত্ত যখন মুজিব প্রশাসনের সাফাই গেয়ে দাবি করেন যে, সীমান্তে চোরাচালান ডেড-স্টপ হয়ে আছে, তখনো আবেদ খান তা চ্যালেঞ্জ করেন (ইত্তেফাক ঃ ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৩ ; ওপেন সিক্রেট-৯)। সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এর এক হিসেবে দেখা গেছে গড়ে ১৫০০০ বেল পাট চোরাচালানীর মাধ্যমে ভারতে পাচার হতো। (গণকণ্ঠ ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)। ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত ভারতে পাচারকৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান এক গবেষণার হিসেবে দাঁড়ায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ টাইমস ঃ ২০ মার্চ, ১৯৭৬. W. B. Reddaway and M. M. Rahman, The Scalte of Smuggling Out of Bangladesh BIDS, Research Report No. 21. Dhaka : **1975)**।

কেমন ছিল গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগে বাংলা**দেশের স্বরূপ ? জু**লাই ১৯৭৫-এর মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদার মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ... স্বচ্ছল কৃষকরা কোন শ্রমদান না করেই আরো ধনী হচ্ছে এবং অধিকতর ভূমির মালিক বনে যাচ্ছে। অপরদিকে ক্ষুদ্র চাষীরা ধীরে ধীরে আরও ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভূমিহীন বেকারে পরিণত হচ্ছে। (Phani Bhushan Mazumdar cited in Socio-Economic Implications of Introducing HYV in Bangladesh BARD. Comilla : 1975, P. 9)।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত বাংলাদেশের যে হাল মুজিবী শাসন করেছিল তা চমৎকারভাবে ৭২-এর মোজাফফরের ন্যাপ উপলব্ধি করেছিল। মোজাফফর ন্যাপের কার্যকরী সমিতি ১৯৭২-এর শেষ দিকে যে অভিমত ব্যক্ত করে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ আওয়ামী লীগ দুর্নীতিকে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত করেছে। (গণকণ্ঠ ঃ ২০ নভেম্বর, ১৯৭২)। মুজিবের ক্ষমতালোভী চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭৪-এর এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী সরকারকে চরম দুর্নীতিবাজ সরকার অভিহিত করে ঘোষণা দেন যে, "আওয়ামী লীগ আজ আর জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করে না" এবং "আওয়ামী যুব লীগ সরকারের দুর্নীতির অংশীদার নয়" (বাংলার বাণী ঃ ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)। একই সঙ্গে শেখ মণি এক অভিনব দাবি উত্থাপন করে বলেন, "দেশ আইনের শাসন চায় না, চায় মুজিবের শাসন। "হায়রে গণতন্ত্র !"

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বমুখী লম্ফ, আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার চরম সংকোচন বিষয়ক পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে আমার এই প্রবন্ধকে আমি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি বাংলাদেশকে একটি অভিশপ্ত রাষ্ট্র (collapse state)-এর পর্যায়ে উপনীত করে। অব্যবস্থাপনা এবং বেপরোয়া লুণ্ঠন ও দুর্নীতির ফলে ১৯৭৪-এর মানব সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে দেড় লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। কি অসাধারণই না '৭২ থেকে '৭৫-এর গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগটি।

পাশাপাশি খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ এসব কিছু নিয়ে কি চমৎকার না ছিল স্বর্ণযুগের গণতন্ত্র এই বাংলাদেশ। তখনকার সামাজিক চালচিত্র অভিনবভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এদেশেরই অনন্য প্রতিভা মহত্তম কবি আল মাহমুদের সোনালী কাবিন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত "বোধের উৎস কই, কোন দিকে ?" কবিতাটিতে। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আমারই প্রতিষ্ঠিত বিরোধী দলীয় জাতীয় দৈনিক অধুনালুপ্ত গণকণ্ঠে ঃ

আচ্ছন্ন চিন্তার মধ্যে স্তব্ধতায় অকস্মাৎ শুনি
সেলাই কলের চলা। পরশী ঘরণী
বানায় শিশুর জামা।
হঠাৎ গুলির শব্দ। চিৎকার, ধর ধর ধর
কিন্তু আমি কাকে ধরব। স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায়
উনিশ শো তেয়াত্তর সাল।
বাগান মাড়িয়ে দিয়ে জীপ যায়,
আবার গুলির শব্দ,
মা... মা... মা... জানালা বন্ধ করো
টেলিফোন, টেলিফোন

www.nagorikpathagar.org

আবার গুলির শব্দ। বাঁচাও বাঁচাও
বানাও শালাকে ছিঁড়ে ফ্যালো —
ট্যাট... ট্যাট... ট্যাট

এই তো স্বর্ণযুগের গণতন্ত্রের মুখচ্ছবি প্রিয় সজ্জনমণ্ডলী। কি অপূর্ব '৭২ থেকে '৭৫ এর মুজিবী বাংলাদেশ। ত্রাস, সশস্ত্র হামলা, অপহরণ, ধর্ষণ, মাত্রাহীন স্বজন তোষণ ও দুর্নীতি, বেপরোয়া লুটতরাজ, 'ওলটপালট করে দে মা লুটেপুটে খাই' জপমন্ত্রের অহর্নিশ উচ্চারণ, গ্রেফতার, নির্যাতন, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ভয়ংকরী দাপট, রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডব, লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের ঠ্যাংগাড়ে বাহিনীসমূহের পৈশাচিকতা, ১৯৭৩-এর চর দখল ও ভোট ডাকাতির প্রথম প্রহসনমূলক নির্বাচন, কুখ্যাত দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে জরুরি অবস্থার নামে গণঅধিকার হরণের ও গণনিপীড়নের বিধানাবলী বিষয়ক কালো অধ্যায়ের সংযোজন, হত্যা-গুম-খুন-গুপ্তহত্যা, উন্মাত্ত পিটুনী, সংবাদপত্র দলন, সাংবাদিক দলন, বিরুদ্ধমতের কণ্ঠরোধকরণ, বিরোধী দলীয় কার্যালয়ে আগুন—এক কথায় মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য। এই তো '৭২ থেকে '৭৫-এর চেহারা প্রিয় সজ্জনমণ্ডলী। ঘরের বাইরে গেছে যে সন্তান, মা কি আদৌ জানতেন ফিরে আসবে সেই আদরের দুলাল তাঁরই বুকে ? মায়ের এই শংকা প্রকাশিত হয়েছে নির্মল সেনের এই আকুল আকুতিতে—স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই—কি মনমোহিনী রূপই না ছিল স্বর্ণযুগে মুজিবী বাংলাদেশের।'

ভারতপ্রীতি শেখ মুজিবকে এমনভাবেই পেয়ে বসেছিল যে, শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে গাটছড়া দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে ১৯৭৪-এর জুলাই মাসে সীমান্ত চিহ্নিত করণের নামে এক চুক্তিস্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দক্ষিণ বেরুবাড়ি দিয়ে দেয়া হয়। সংবিধানের কুখ্যাত তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় বেঈমানির এই চুক্তিটিকে আইনী লেবাস দেয়া হয়। কোনো গণভোট অনুষ্ঠান ছাড়াই বেরুবাড়ির বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতের গোলামে পরিণত করা হয়। কোনরকম চুক্তি ছাড়াই ফারাক্কার ফিডার ক্যানাল পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে দেয়ার নামে মুজিব গঙ্গার পানির নিয়ন্ত্রণ ভার ভারতের হাতে তুলে দেন। যার পরিণতিতে বাংলাদেশ গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয় এবং পরিবেশগত অভিশাপের শিকার হয়।

ক্ষমতার মৌতাত মুজিবকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার লিপ্সায় পেয়ে বসে। সেনাবাহিনীর একটি কন্টিনজেন্ট দিয়ে সংসদ ভবন ঘেরাও করে। (বাংলাদেশ অবজারভার ঃ ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৫)। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি পদদলিত করে মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এক ব্যক্তির আদেশে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

নাগরিকদের সকল মৌলিক-মানবিক ও নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়। নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের শেষ ভরসাস্থল বিচার বিভাগকে দাসানুদাসে পরিণত করে এক দানবীয় ব্যবস্থা এ জাতির বুকে চেপে বসে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা, বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রাখার অধিকার সবকিছুই বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়। বিরোধী দলের বিশিষ্ট নেতা তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান আওয়ামী সরকারকে বিশ্বাসঘাতক এবং মুজিবকে ফ্যাসিস্ট অভিহিত করে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন ঃ নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হলে বিপ্লব অনিবার্য (গণকণ্ঠ ঃ ৩০ আগস্ট, ১৯৭৪)।

১৯৭৫-এর আগস্টের পটপরিবর্তন তাই অনিবার্য ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে যে সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার সুযোগ স্বয়ং মুজিব প্রদান করেছিলেন, সেই সেনাবাহিনী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের বহুদলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী অংশের সক্রিয় সহযোগিতায় মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন আনয়ন করে। সমগ্র দেশবাসী এ পরিবর্তন সমর্থন ও অনুমোদন করে। কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। আমরা যারা মুজিবী দুঃশাসন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে কারান্তরালে ছিলাম আমরাও স্বস্তিবোধ করেছিলাম। বিশ্বে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়লে রক্তাক্ত পথেই আসে পরিবর্তন। এর জন্যে হায় আফসোস করে লাভ নেই। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আবুল ফজল ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে মুজিবের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন ঃ সঙ্কট মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। (গণকণ্ঠ ঃ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৪)। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে কিংবা বলশেভিক বিপ্লবের সময়ে কিংবা এই সেদিন রোমানিয়ায় গণতন্ত্রের জোয়ারে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তা ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। যত অমানবিকই হোক, রাজা লুই, রাণী মারি আঁতোয়ানেত, জার নিকোলাস ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সস্ত্রীক চচেসকোকে প্রাণ এবং রক্তাঞ্জলি দিয়েই স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র উচ্ছেদের মূল্য শোধ করতে হয়।

আজ মুজিব হত্যার বিচারের নামে রাজনৈতিক জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে ক্ষমতাসীন দল। কিন্তু সেদিন আওয়ামী লীগের অসংখ্য সদস্য ক্ষমতার এই পরিবর্তনকে সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করে খন্দকার মোশতাককে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। মুজিবের জীবিত সন্তানরা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায়—কি মানবাধিকার সংস্থা—কি বিচার বিষয়ক কোন সংস্থা কোথাও কোন ফরিয়াদ পর্যন্ত করেনি, আন্তর্জাতিক কোন মামলা রুজু করা তো দূরের কথা, উল্টো মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আবদুল মালেক উকিল লন্ডনে বাংলাদেশবাসীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'শোকর

www.nagorikpathagar.org

আলহামদুলিল্লাহ। দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পেল'। মৃত্যুর পূর্বে শেষ দিন পর্যন্ত হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-এর শীর্ষ নেতাদের একজন ছিলেন মালেক উকিল। মোশতাকের বিশেষ দূত হিসেবে মহিউদ্দীন মস্কোতে তদবির করে এসেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হাসিনার আওয়ামী লীগে ছিলেন। বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সিপাহসালার বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী যিনি মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনিও তাহলে মুজিবের ঘাতকদের একজন। অথচ বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী ১৯৭৮-এ আওয়ামী লীগের সমবায়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী ছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ কি করে তা অনুমোদন করেছিল? এ থেকেই আওয়ামী লীগের ভণ্ডামী ধরা পড়ে।

মোশতাকের ৮৩ দিনের দুর্বল প্রশাসন ভারতীয় চরদের ষড়যন্ত্র করার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ঠিক এই সুযোগটিকেই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের সম্মুখে তুলে ধরে ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘুরাবার অপপ্রয়াস চালায় ভারতীয় চরেরা। তারই অংশ হিসেবে ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থান। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ভারতমুখী অভ্যুত্থান হিসেবে সর্বমহলে যথার্থই চিত্রিত ও চিহ্নিত হয়। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ, বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় চরদের নাশকতামূলক তৎপরতা মুহূর্তের মধ্যে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দেশপ্রেমকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়—যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় পঞ্চমবাহিনী এই অভ্যুত্থানকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। অফিসার-বিদ্বেষ ছড়িয়ে সেনাঅফিসারদের হত্যার এক জঘন্য নীল নকশা জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা বাস্তবায়ন করা শুরু করে—যা মুহূর্তের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টগুলোতে সন্ত্রাস ও আতংক ছড়িয়ে দেয়। বহু অভিজ্ঞ নিবেদিত প্রাণ দক্ষ সেনাঅফিসার এই অরাজকতার শিকার হয়ে নিহত হন। আইন-শৃঙ্খলা এবং সেনা শৃঙ্খলা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় সেনাবাাহিনীকে পঙ্গু করে ভারতীয় বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানোই ছিল এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। সাধারণ সৈনিকদের দেশপ্রেম, স্বতঃস্ফূর্ততা ও অবদানকে খাটো করার জন্য জাসদের হঠকারী ও দুরভিসন্ধিপরায়ণ নেতৃত্ব এবং জাসদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা ভারতীয় অনুচরেরা সবকিছুই নিজেদের কৃতিত্ব বলে জাহির করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিপ্লবের গৌরব ছিনতাই করতে তারা ব্যর্থ হয়। সাধারণ সৈনিকদের সংহতি এত মজবুত ছিল যে ঘোলাজলে মাছ শিকারের কোনো সুযোগই সেখানে ছিল না। সকল সিপাহী-অফিসার-জনতার কাছে তখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রনায়কোচিতভাবে এবং সাহসের সঙ্গে এই অরাজক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। তিনি সেনাছাউনীসমূহে ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার সঙ্গে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে

www.nagorikpathagar.org

অনেকেই ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন—কিন্তু এতে কোন ফল হবে না।

৭ নভেম্বরের ঘটনা বিরল ও অনন্য। সিপাহীদের উদ্যোগে জাতির পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ ১৮৫৭ সালে ইতিহাস একবার প্রত্যক্ষ করেছিল। ফরাসি বিপ্লবে বাস্তিলের পতনের পর প্যারির লড়াকু মানুষ যেমন ফরাসিদের মানমর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল— ৭ নভেম্বরও শুধু এ-সব অর্জনই করেনি আমাদের জাতীয় চেতনায় একটি নতুন মাত্রাও দান করেছে। বিশিষ্ট জ্ঞানসাধক ড. কাজী মোতাহার হোসেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ 'আমরা স্বাধীন হয়েছি। তবে সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয়েছি নাকি রাশিয়া ভারতের অধীনে রয়েছি, সেটা ভেবে দেখা দরকার' (গণকণ্ঠ ঃ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)। ৭ নভেম্বরে অন্যান্য ঘটনা বাংলাদেশকে রুশ-ভারতের বলয় থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করে এবং সার্বভৌমত্বকে অর্থবহ করে তোলে। আজকের ক্ষমতাসীন চক্রের নেতা যেমন ১৫ আগস্ট দেখেননি তেমনি ৭ নভেম্বরও দেখেননি। তাই তিনি এ দেশের মানুষের অনুভূতি বুঝতে অক্ষম। তিনি বুঝতে অক্ষম ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বরের গভীরতা ও তাৎপর্য এবং কি পরম মমতায় মানুষের ভালবাসায় সিক্ত এ দুটি দিবস। এ দেশ কারো অনুগ্রহ লাভের জন্য কিংবা কারো করদরাজ্য হবার জন্য জন্ম নেয়নি। আমরা পিন্ডির জিনজির ছিন্ন করেছিলাম দিল্লীর গোলামীর জিনজিরকে হার হিসেবে গলায় ধারণ করার জন্য নয়। আমাদের রয়েছে অজেয়-অবিনাশী শক্তি। ৭ নভেম্বর তাই প্রমাণ করেছে। এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হন দেশনায়ক জিয়াউর রহমান।

কেমন মানুষ ছিলেন জিয়াউর রহমান ? আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশবাসীকে হতাশা থেকে মুক্ত করে জিয়াউর রহমান বীরত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দান করেন। তিনিই বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে, জান যাবে তবুও মান যেতে দেয়া হবে না। হানাদারদের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন প্রতিরোধ তিনি গড়ে তোলেন। আবার ৭ নভেম্বর চরম অরাজকতার দিনে সিপাহী-জনতা নির্বিশেষে সকলেই তাকিয়ে ছিলেন জিয়াউর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বের দিকে। তিনি সাফল্যের সঙ্গে সে দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। অমৃতের সন্তানের মতো সময়ের সাহসী কাজটি জিয়াউর রহমান যথাযথভাবেই করেছেন।

কেমন মানুষ ছিলেন জিয়াউর রহমান ? এককালের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং সরকারের নিযুক্ত ল কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন দেশনায়ক জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ "বাংলাদেশের অন্যতম মহান ঐতিহাসিক

www.nagorikpathagar.org

ব্যাক্তিত্ব মরহুম জিয়াউর রহমান—দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়কের নৃশংস হত্যা জাতির পক্ষে চিরকাল বেদনার স্মৃতি হয়ে থাকবে। তাঁর স্মৃতি আরও বেদনাদায়ক যখন বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করি তাঁর সামরিক শাসন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা। মহাপুরুষের মহত্ত্ব তাঁর কর্মজীবনে, যার প্রভাব উত্তরকালে সম্প্রসারিত হয়। মরহুম জিয়াউর রহমানের বহু স্মরণীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে দুটির উল্লেখ করতে চাই—সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ... জিয়াউর রহমান ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে থেকে তার হানিকর দিক স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি তাই গণতন্ত্রের পথ বেছে নিলেন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত নিঃস্বার্থ ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি রেখে গেছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের অপূর্ব নিদর্শন... তিনি করেন ক্ষমতার হস্তান্তর অর্থাৎ ব্যক্তির হাত হতে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতার উত্তরণ, সামরিক শাসক হতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। তাঁর এই পদক্ষেপ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রক্ষমতা জননির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। ... মরহুম জিয়াউর রহমান গণতান্ত্রিক অধিকার লংঘন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, কোন দেশের জনসাধারণ একবার যদি গণতান্ত্রিক মানবাধিকার ভোগ করার পর কোন কারণে সে অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, অবশ্যম্ভাবী কারণে অসন্তোষ দেখা দেবে। এই অসন্তোষ যত দিন যাবে, ক্রমে আন্দোলন ও পরিণামে গণবিক্ষোভের আকার নেবে। এই সত্যতা উপলব্ধি করে তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং গণতন্ত্রের উত্তরণে সার্বজনীনস্বীকৃত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ অবলম্বন করেন। ... আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, সামরিক শাসন হতে গণতন্ত্রে উত্তরণ তিনি স্বেচ্ছায় করেন। তার জন্য জনগণকে আজকের মতো কোন আন্দোলন করতে হয়নি। সেরূপ কোন আন্দোলন হতো না বলা যায় না, তবে তা হবার পূর্বেই তিনি গণতন্ত্রায়ণের পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও গণতান্ত্রিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে এজন্য তিনি চিরকাল শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকবেন।" (রুহুল আমিন সম্পাদিত, জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থে বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন, "জিয়াউর রহমান ও গণতন্ত্র", ঢাকা ঃ ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৯৭-১০১)।

আজকের বাংলাদেশের স্বরূপ কি ? ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই দিল্লী আওয়ামী ক্রীড়নকদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, বাংলাদেশের ভারতভুক্তির প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করা। এই লক্ষ্যে সাউথ ব্লকের কৌশল হচ্ছে বাংলাদেশের ভুটানীকরণ সাধন করা এবং পরবর্তীকালে একজন বাংলাদেশী কাজী লেন্দুপ দর্জিকে দিয়ে ভারতীয় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা। তাই আওয়ামী ক্রীড়নকরা ক্ষমতায়

www.nagorikpathagar.org

আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্র্যানজিটের নামে এশিয়ান হাইওয়ের পরিবর্তিত পথের নামে ভারতকে করিডোর প্রদানসহ উপ-আঞ্চলিক জোট, উন্নয়ন ত্রিভুজ- চতুর্ভুজ-এর নামে ভারতীয় রাষ্ট্রদেহে অঙ্গীভূত হওয়ার, বিদ্যুৎ আমদানির ও অভিন্ন গ্যাস-পাওয়া গ্রিডের নামে ভারত নির্ভর হওয়া এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমনের নামে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নস্যাতের নানা ধরনের কৌশলী প্রস্তাব উত্থাপিত হতে আমরা দেখছি। বস্তুত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বস্ত গবেষক বি. জি. ভার্গিজের 'এথনিসিটি এন্ড ইনসারজেন্সি ইন দি নর্থ ইস্ট' গ্রন্থটিতে বিশদভাবে এই পরিকল্পনাগুলো সন্নিবেশিত আছে। গ্রন্থটি রচনার কাজ শেষ হয় ১৯৯৪-এ, যন্ত্রস্থ হয় ১৯৯৫-এ এবং প্রকাশিত হয় ১৯৯৬-এর প্রথমদিকে। আর্থিক মুনাফার নামে ভারতীয় সরকার চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে চায়। অর্থাৎ বন্দরটির নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চায়। ছোট ছোট চুক্তির মাধ্যমে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির চাইতে আরও অধীনতামূলক ও সর্বনাশা চুক্তি এ পদলেহী সরকার সম্পাদন করে যাচ্ছে একের পর এক। চরম গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে নিজ দলকে পাশ কাটিয়ে সংসদকে তোয়াক্কা না করে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গাচুক্তির নামে এক অধীনতামূলক চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয় এবং পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিকে বিসর্জন দেয়া হয়। নব্য আপারটাইট নীতির ভিত্তিতে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত চুক্তিটির বলে দেশের এক-দশমাংশ কার্যত ভারতের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি গুজরালের নেতৃত্বে ভারতীয় চক্র চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সমন্বয়ে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠনের নামে মূলত বাংলাদেশকে খণ্ড-বিখণ্ডকরণের একটি প্রস্তাব সক্রিয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করে। এ দেশীয় দালালরা তারই ডুগডুগি বাজাচ্ছে এখন। সবকিছুরই লক্ষ্য এক—বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ভারত দেহে লীন করা।

কেমন বাংলাদেশে আজ আমরা বসবাস করছি? হামলা, মামলা, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে ক্ষমতাসীনদের মাস্তানদের দ্বারা ধর্ষণ জারি রাখা, বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের ঢালাও গ্রেফতার করা ও হুলিয়া জারি করা, বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করা আজ প্রাত্যহিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিজেরা হত্যা করে জুতার ফিতা গলায় দিয়ে থানার হাজতে তরুণ আত্মহত্যা করছে বলে প্রচার করে। পুলিশের এই অপদার্থ অংশটির মস্তিষ্ক উর্বরই বটে। সীমা চৌধুরীকে পুলিশ ধর্ষণ করে ক্ষান্ত হয়নি, পরে হত্যাও করেছে এবং হত্যার আলামতসমূহ ধ্বংসও করেছে। মাসুম শিশুকে হাজতে খোদ পুলিশ ধর্ষণ করছে। থানার হাজত থেকে বন্দিকে বের করে মন্ত্রীর পুত্র ধোলাই অভিযান চালাচ্ছে। এসি আকরামের মতো দানবরা রুবেলের মতো মেধাবী ছাত্রদের জীবন প্রদীপ নির্বাপণে ব্যস্ত। কারানির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হচ্ছে গণপ্রতিনিধিদের। সরকারপ্রধানের স্বামীর মতে এদেশ বাসের অযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

দাবি করা হয় দেশে আইনের শাসন রয়েছে। কেমন আইনের শাসন? বিচারকদের ধমকানো এখন একটি মামুলি ব্যাপার—যেমন ধমকাতো সরকারপ্রধানের জন্মদাতাও। দেশের কোনো নাগরিকের কোনো অধিকার নেই। মুজিবী দুঃশাসনে বিমানের নূর হোসেনকে যেভাবে হত্যা করা হয় ১৯৭৪-এ এবার তার চাইতেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বিমানের শরিফকে। একজনকে চোর, ছিনতাইকারী কিংবা হেরোইন আসক্ত বলে চিহ্নিত করতে পারলেই বিচারের প্রয়োজন হয় না, গণপিটুনির দ্বারা হত্যা করা এখন আইনসিদ্ধ। তা না হলে একজন নিরীহ আব্বাসের হত্যাকে কেন্দ্র করে সরকারপ্রধান কিভাবে দম্ভ করতে পারেন। সিরাজ শিকদারের হত্যাকারীদের অন্যতম আত্মস্বীকৃত সরকারপ্রধানও সেদিন জাতীয় সংসদে দম্ভের সঙ্গে এমনি পাপোচ্চারণ করেছিলেন "কোথায় সিরাজ শিকদার"?

একটি মামলার রায় কি হবে তা তো নির্বাহী বিভাগের জানার কথা নয়। কিন্তু তার পূর্বেই সরকারপ্রধান নির্দেশ জারি করেছেন—রাজপথ দখলে রাখ—কোথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা? রাজপথ দখলে রেখে বিচারককে রক্তচক্ষু দেখিয়ে এবং ভীতি প্রদর্শন করে মনসই রায় আদায় করাই কি এর উদ্দেশ্য নয়? অন্যদিকে সকলের আড়ালে হাইকোর্ট ডিভিশনে নির্বাহী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিচারকদের অপদস্থ করার উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে এবং বিচারব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করার সব আয়োজন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সম্পন্ন করেছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অর্থানুকূল্যে এদেশে বহু পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে। জনমতকে ভারতমুখী করে তোলাই যে এর উদ্দেশ্য তা বলাই বাহুল্য। পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে ভারত বাংলাদেশকে ব্ল্যাকমেইল করছে—যার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীন কোনো পররাষ্ট্রনীতি আর পরিদৃষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সোফা স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়নি কেবলমাত্র ভারতীয় রক্ষচক্ষুর কারণে। আজ বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশের সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। সার্ককে যদি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে রাখতে হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশকে ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে সার্ক-এ অন্তর্ভুক্ত করা খুবই জরুরি। কিন্তু দিল্লীর কৃপাপুষ্ট এ পরজীবী গোষ্ঠী দিল্লী তোষণের বাইরে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে যত্নবান নয়।

৭ নভেম্বর আত্মপ্রত্যয়ের দিন, নবজাগরণের দিন। ৭ নভেম্বর মানে মাথা নত না করা। আজ ৭ নভেম্বরের চেতনায় আমাদের পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় বেঈমানের মোকাবেলা করার নতুন অঙ্গীকার করতে হবে। অতীতাশ্রয়ী রাজনীতির দিন ফুরিয়ে গেছে। প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা আর খুচিয়ে খুচিয়ে পুরনো ঘাকে ক্ষতে পরিণত করলে শেষপর্যন্ত তা প্রাণসংহারী গ্যাংরীনের রূপ লাভ করে। দর্পী শাসকগোষ্ঠীর এ তথ্যটি স্মরণে রাখা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসে পেছন ফেরার কোনো পথ নেই

আমানুল্লাহ কবীর

বিতর্ক উঠেছে ৭ নভেম্বর নিয়ে। ষোলো বছর যে বিতর্ক ছিলনা, ষোলো বছর পর উঠেছে সে বিতর্ক। বিতর্ক উঠেছে না ঠিক, বিতর্ক ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো চারদিকে—গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, মসজিদে-মাদ্রাসায়, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, অফিস-আদালতে সর্বত্র। যা ছিল এতদিন প্রতিষ্ঠিত, চেষ্টা চলছে তাকে অপ্রতিষ্ঠিত করার। ফলে বিতর্ক কমছে না, বাড়ছে। নতুন বিতর্ক যেমন আসছে, তেমনি বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সত্যকেও। ঐকমত্যের ব্যানারে ঝংকার উঠেছে অনৈক্যের। ইতিহাসের গতিতে সরকার আসছে, গেছে কিন্তু ইতিহাসের কোন অধ্যায় তাতে মুছে যায়নি। সংযোজিত হয়েছে। মুছে ফেলার ধৃষ্টতাও কেউ দেখায়নি। কারণ, সে ধৃষ্টতা কেউ দেখালে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় শূন্যতা সৃষ্টি হয়। বাতাসে শূন্যতা সৃষ্টি হলে যেমন ঘূর্ণিঝড় হয় তেমনি ঘূর্ণিঝড় হয় জাতির জীবনেও। তছনছ করে দেয় সাজানো ঘর, ভিটে ছাড়া করে মানুষকে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়ই ঘটেছিল ৭ নভেম্বর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর। ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর। ঘটনার পরম্পরায় এসেছে একের পর আরেক। ১৫ আগস্টের জন্ম না-হলে ৩ নভেম্বর আসত না, ৩ নভেম্বর না আসলে ৭ নভেম্বরের জন্ম হতো না। ১৫ আগস্ট-উত্তর ধারার সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডে যে পরিবর্তন আসে তা সেনাবহিনীতে ঐক্যের পরিবর্তে প্রবলতর করে অনৈক্য। অনৈক্যের শাসন ভেঙ্গে পড়ে চেইন অব কমান্ড। চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন তৎকালীন ডিফেন্স এ্যাডভাইজার জেনারেল ওসমানী ও চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান—কিন্তু ক্ষমতা সব কেন্দ্রীভূত বঙ্গ ভবনে। সুতরাং ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা চালায় নানা ব্যক্তি নানা মহল। জাসদ উসকে দেয় অফিসারদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় গোটা সেনাবাহিনী। যুদ্ধ যুদ্ধ রব উঠে ক্যান্টনমেন্টগুলোতে—অফিসার্স ভার্সাস সাধারণ সোলজার্স। অভ্যুত্থান ঘটানোর মোক্ষম সময়—সেনাবাহিনীর মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সুযোগ গ্রহণ করেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে অফিসারদের একটা ছোট্ট গ্রুপ। সে অভ্যুত্থানে খন্দকার মোশতাক ও

www.nagorikpathagar.org

তাঁর দলবল ক্ষমতা থেকে উৎখাত হন বটে, ১৫ আগস্ট উত্তর রাজনৈতিক গতি ধারায় তা কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছিল, ক্যাপ্টেন তাজের ভাষায় অন্তত তাই মনে হয়—১৫ আগস্ট পূর্বস্রোতধারা পাল তোলার। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে মিছিল বের হয় খালেদ মোশাররফের মাতা ও ভ্রাত্রের নেতৃত্বে। এ ভুলেরই মাশুল খালেদ মোশাররফ দিয়েছিলেন প্রাণ দিয়ে। ১৫ আগস্টের ঘটনাবলী যত নৃশংসই হোক, তা যে দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সূচিত করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় কি? এ সত্যকে উপলব্ধি করতে চাননি ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা। অথচ রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল জনগোষ্ঠীর ব্যাপকতর অংশে।

দ্বিতীয়, সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নামে তারা আটক করে রাখলেন স্বয়ং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াকে। সুতরাং বিভ্রান্তি কমলো না বাড়লো। শৃঙ্খলার পরিবর্তে ব্যারাক থেকে ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়ল ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা। ব্যারাকের বাইরে জনগণের মাঝেও। দীর্ঘ তিনদিন কোন সরকার নেই দেশে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্রশাসন—অনিশ্চয়তা ছাড়া জাতিকে আর কিছুই দিতে পারেন নি ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা। উদ্বিগ্ন মানুষ দেখল ১৫ আগস্ট-পূর্ব অবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য উল্টো স্রোতে নৌকা ঠেলছেন কিছু সেনা অফিসার ও তাদের রাজনৈতিক দোসররা। সুতরাং মানুষের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিল তৃতীয় পরিবর্তনের প্রত্যাশা। ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও খালেদ মোশাররফের আবির্ভাব তাই নন্দিত হয়নি নিন্দিতই হয়েছে। সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই নায়ক হিসাবে নয়, উচ্চাভিলাষী খলনায়ক হিসাবেই চিত্রিত হয়ে আছেন মানুষের কাছে।

৩ নভেম্বরের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটেই জন্ম হয়েছিল ৭ নভেম্বরের। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। 'সিপাহী-জনতা ভাই ভাই' শ্লোগান দিয়ে হাতে হাত ধরে নামল রাস্তায়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান জাতির দুই চরম সঙ্কটকালে ঘটল সিপাহী-জনতার মহামিলন। ১৯৭১ সালে এ মহামিলন ঘটেছিল দেশকে স্বাধীন করার জন্য, আর ১৯৭৫ সালে তার পুনরাবৃত্তি ঘটল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করার জন্য। ১৫ আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাকে অভিনন্দিত করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বিজয়ী সিপাহী-জনতার উল্লাসের প্রতিফলন ঘটে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরেও। জাতির এই দুই চরম সংকটকালেই আবির্ভাব ঘটে জিয়াউর রহমানের। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর উধাও হয়ে যান আওয়ামী লীগ নেতারা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বর হামলার মুখে দিশাহারা হয়ে পড়ে নিরস্ত্র মানুষ। রাতারাতি মৃতপুরীতে রূপান্তরিত হয় সারা বাংলাদেশ। কুকুর-বিড়ালের মৃতদেহের মতো অসহায় মানুষের রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকে রাস্তাঘাটে। একজন সৈনিকের কণ্ঠ সেদিন দিকনির্দেশনা দেয় গোটা জাতিকে। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুপস্থিতিতে

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্বের যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পুরণ করেন মেজর জিয়া। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহবান জানান দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতি। দ্বিতীয় বার জিয়ার আবির্ভাব ঘটে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর যখন সদ্য স্বাধীন জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন। ঘটনার উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে আবার আবির্ভূত হন জেনারেল জিয়া। আটকাবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করে আনে সিপাহী-জনতা। তাঁর গ্রহণযোগ্যতাই ঐক্যের প্রতীক রূপে তার ভাবমূর্তি বিনির্মাণ করে। স্বাধীনতার পরেও বিজয়ের একমাত্র দাবিদার হিসাবে আওয়ামী লীগ এককভাবেই ক্ষমতায় থেকে যায়। একটা বিপ্লবী সরকার হিসাবে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের প্রবাসী সরকারেও অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করেনি, স্বাধীনতা উত্তরকালেও না। সুতরাং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দৃশ্যপট থেকে মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের অনেকেই চলে যান দৃশ্যের অন্তরালে। তাদের সাথে দৃশ্যের অন্তরালে চলে যান জিয়াও। কিন্তু মানুষের মন থেকে তিনি নির্বাসিত হননি। স্বাধীনতা ঘোষণার সেই নির্ভীক কণ্ঠ নীরবে অনুরণিত হয়েছে মানুষের হৃদয়ে। কাজেই জিয়া সহজেই গ্রহণযোগ্যতা পান সিপাহী-জনতার কাছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও টিকে যান ঐক্যের প্রতীক হিসাবে। বিভক্ত সেনাবাহিনীর সকলের আস্থা যেমন অর্জন করেন, তেমনি আস্থা অর্জন করেন সাধারণ মানুষেরাও। ফলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় সেনাবাহিনীতে, ভেঙ্গে পড়া প্রশাসন দাঁড়ায় মাজা সোজা করে। নতুন গতি সঞ্চারিত হয় দেশের কর্মকাণ্ডে।

পূর্বেই বলেছি, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের ধারাবাহিকতায়ই জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের ফলে ১৫ আগস্টপূর্ব রাজনৈতিক ধারার অবসান ঘটলেও অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদ ১৫ আগস্ট-উত্তর সুস্পষ্ট কোন রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিতে পারেননি। শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল শাসনের ইতি হলেও বস্তুতপক্ষে ক্ষমতায় থাকে আওয়ামী লীগই। সুতরাং মানুষের মনের সাময়িক স্বস্তি আসলেও পূর্ণ আস্থা ফিরে আসেনি। সমাজের ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা ছিল, তবে সাময়িক স্বস্তির কারণে তার বর্হিপ্রকাশ ঘটে প্রায় তিন মাসের মাথায়—৩ নভেম্বর। যা হোক, ১৫ আগষ্ট সূচিত ধারা পরিণতি লাভ করে ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা ও দুঃশাসনের কারণে শেখ মুজিব সরকারের অবসানই কেবল মানুষের কাম্য ছিল না, মানুষ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল আওয়ামী রাজনীতির বিকল্প ধারার জন্যও। জিয়াউর রহমানের সাফল্য এখানেই। সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়েও তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং মানুষকে উপহার দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের বিকল্প রাজনীতি। তাঁর বিকল্প রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি ছিল একদিকে ভারত-সোভিয়েত প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসার, আরেক দিকে দেশ গড়ার। জিয়া শেখ মুজিবের মতো বললেন না, তিন বছর আপনাদের কিছু দেবার পারবনা। উল্টা তিনি মানুষকে শোনালেন আশার বাণী, স্বপ্ন দেখালেন সুন্দর ভবিষ্যতের। নতুন দিকদর্শন দিলেন আশাহত জাতিকে। আওয়ামী লীগে বাঙালী

www.nagorikpathagar.org

জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি তিনি নতুন দিক-নিদের্শনা দিয়ে প্রবর্তন করলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। স্বকীয় সত্তার উদ্বোধন হলো নতুন করে, নতুন করে আত্মপরিচয় পেল ধর্ম-বর্ণ-জাতি (race) নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষ। ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তিগুলো এসে নতুন আত্মপরিচয়ে মিলিত হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নতুন স্রোতধারায়। ইতিহাসের গতিধারায় ঘটে গেল অভাবনীয় ঘটনা—জিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন শেখ মুজিবের। তাঁদের কেউ আজ বেঁচে নেই, দু'জনেরই ঘটেছে অস্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু আজও তাঁরা আমাদের রাজনীতিতে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ। আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির মূল সংঘাত এখানেই। গণতন্ত্রের কথা বললেও আওয়ামী লীগ আসলে বিশ্বাস করে এক নেতা এক দেশ—১৫ আগস্ট-পূর্ব সেই একই রাজনীতিতে। কিন্তু বড় নির্মম সত্য যে, ইতিহাসে সামনে এগিয়ে যাবার পথ খোলা আছে, পিছনে ফিরে যাওয়ার পথ খোলা নেই। আওয়ামী লীগ চাইলেই কি পারবে ১৫ আগস্ট-পূর্ব রাজনীতিতে ফিরে যেতে? জিয়াকে মুছে ফেলতে হলে আগে মুছে ফেলতে হবে তার রাজনীতিকে। আওয়ামী লীগ কি পারবে বিএনপিকে মুছে ফেলতে? কিন্তু আওয়ামী লীগের চেষ্টা আছে। যে কারণে যে ৭ নভেম্বর জন্ম দিয়েছে আজকের জিয়াকে, সেই ৭ নভেম্বরকে আখ্যায়িত করতে চায় ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসাবে। এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ গঠন করেছে ঐকমত্যের সরকার, দিল্লীর সাথে জোরদার করেছে দোস্তি। ঐকমত্যের সরকারের দ্বিতীয় প্রধান শরিক দল জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি। জেনারেল এরশাদ কে? ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিলের ধারাবাহিক লেখার পরও কি জেনারেল এরশাদ কে, তা বলার অপেক্ষা রাখে? ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর কেন তিনি দিল্লী (দেরাদুনে ট্রেনিং এ ছিলেন তখন) থেকে ছুটে এলেন বঙ্গভবনে—সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার অগোচরে? তারপরও জেনারেল এরশাদ ঐকমত্যের সরকারের পার্টনার! জাসদের ভূমিকা কি ছিল, শেখ মুজিব সরকারের সময়? খুব পুরনো ঘটনা নয়—আওয়ামী লীগ নেতাদেরও মনে আছে, দেশের মানুষেরও মনে আছে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা—ঐকমত্য সরকারের পার্টনার করা যায় তাদের নির্দ্বিধায়। কারণ তাঁরা বা তাঁদের দল কেউই আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তাই সহযোগী শক্তি হিসাবে তাদের দলে ভিড়ালে ক্ষতি নেই, লাভ আছে। লাভ-লোকসানের হিসাব করেই রণকৌশল ঠিক করেছে আওয়ামী লীগ—সে রণকৌশলে শত্রু একমাত্র জিয়া ও তাঁর রাজনীতি। 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' হিসাবে ৭ নভেম্বর পালনে এ কারণেই আওয়ামী লীগ সরকারের অনীহা—অনীহা না কেবল বিরোধিতাও। অথচ এই বিরোধিতা ছিল আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল না। ৭ নভেম্বরকে বিতর্কিত করে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত করতে চায় জিয়াকেও। জিয়ার রাজনীতিকেও। কারণ তাহলেই কেবল প্রতিষ্ঠিত করা যাবে শেখ মুজিবের অপ্রতিদ্বন্দী ভাবমূর্তি — এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ।

www.nagorikpathagar.org

৭ নবেম্বরের পটভূমি, তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা

ড. সাঈদ-উর রহমান

[এক]

ঘটনা তিনটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, তবে সেগুলোর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন একটি সূত্র রয়েছে অদৃশ্য অবস্থায়। অদৃশ্য সেই সূত্রটির অনুসন্ধান করাই এই লেখার উদ্দেশ্য। ঘটনা তিনটি হচ্ছে ঃ

১। ১২ জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বিকেলে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হয়। নির্বাচনটি ছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অভিনয়—এতে লীগের বিজয়ী হওয়া পূর্বনির্ধারিত ছিল। দেশের ভেতরের ও বাইরের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মহল দলটিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। জালভোট, ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস, মিডিয়া ক্যু প্রভৃতির মাধ্যমে তারা সফলতা লাভ করেছে।

কাকতালীয় যে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বিকেলবেলায় বাংলাদেশে আরেকটি যুদ্ধের অভিনয় হয়েছিল। পলাশীর সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ও ভারতে ইংরেজ অধিকারের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

২। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই পার্শ্ববর্তী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থানকে পরিপূরক করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ট্রানজিট প্রদান, গ্যাস রফতানী, বিদ্যুৎ আনা প্রভৃতি বিষয়সহ প্রকাশ্য ও গোপন অনেক ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছে বলে জানা গেছে।

৩। গত বিশ বছর ধরে ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব দিবসকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করার সরকারী প্রথাকে এরা বাতিল করার চেষ্টা করেছে। প্রবল জনমতের চাপে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও ৭ নভেম্বরের চেতনার প্রতি সরকার তার বিরাগ গোপন রাখেনি।

এই ঘটনাত্রয়ের ঐক্যসূত্র আমরা খুঁজতে চাই।

www.nagorikpathagar.org

[দুই]

মুক্তিযুদ্ধে ছিল দুটি পক্ষ—বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। প্রশিক্ষিত সৈন্য সংখ্যায়, আধুনিক রসদসম্ভারে ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পাকিস্তানীরা ছিল এগিয়ে; যুদ্ধ করার মানসিক প্রস্তুতিও ছিল অনেকদিন থেকে। তার সঙ্গে তুলনা করার মত বলতে গেলে কিছুই ছিল না বাংলাদেশের। কিন্তু অনেক কিছু অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান হেরেছিল লজ্জাজনকভাবে। শেষপর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হলেও সেটা ছিল বোঁটা থেকে খসে পড়ার প্রাক্ মুহূর্তে পাকা ফলকে টোকা দেবার জন্য। যুদ্ধে জয় হয়েছিল বাংলাদেশেরই। এর প্রধান কারণ ছিল দুটি ঃ যুদ্ধরত বাঙালীদের অতুলনীয় দেশপ্রেম; এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব বাঙালীর যুদ্ধে শামিল হওয়া। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীর ভাষায়;

> আমার, আমার অধিনায়ক ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সব সময় মনে হতো যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমাদের সঙ্গে শ্বাস নিচ্ছে। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ খণ্ড —১০, পৃষ্ঠা -৮১০)।

যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সহমর্মিতা ও একাত্মতা সম্পর্কে আরেকজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সাক্ষ্য নেয়া যেতে পারে। সাক্ষ্য দিয়েছেন সত্যেন সেন ঃ

> এপ্রিলের প্রথম ভাগেই নোয়াখালীর ফেনী শহরে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন এই বাহিনীর সংগঠক ও নায়ক। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই পি আর বাহিনীর জওয়ানরা, পুলিশ, আনসার, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ এরা সবাই এই বাহিনীতে শামিল হয়েছিল। হাতিয়ার বলতে এদের ছিল কিছু রাইফেল আর বন্দুক। তাছাড়া বর্শা, বল্লম, লাঠিসোটা ইত্যাদিও ছিল। (পূর্বোক্ত দলিলপত্র ঃ খণ্ড— ৯, পৃষ্ঠা ঃ ২১২)।

সেসব আদিম অস্ত্র সম্বল করেই তাঁরা নেমেছিলেন কামান, মর্টার, মেশিনগান ও যুদ্ধবিমানের বিরুদ্ধে। একদিনের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার দৃশ্য ছিল এরূপ ঃ

> সেই ধ্বংসলীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেজর জিয়া নির্ভীক কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন, মুক্তিবাহিনীর জওয়ান ভাইরা, আমরা মরবার জন্য তৈরি হয়েই এই দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি, তবে আর আমাদের ভয় কুছ পরওয়া নেই, আমরা ঐ বিমান দুটোকে পাল্টা আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে ছাড়ব। এই রাইফেল দিয়েই আমরা ওদের এমন শিক্ষা দেব, যা ওরা কোনদিন ভুলতে পারবে না। .... ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা এইভাবে শত শত মার্কিন জঙ্গী বিমান ফেলে দিয়েছে, আমরাই বা কেন পারবোনা? এক মুহূর্ত দেরী নয়, জওয়ান ভাইরা ছুটে চল সবাই। শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়, মেজর জিয়া সবার আগে নিজেই রাইফেল নিয়ে এগিয়ে চললেন।...... গুলিবিদ্ধ বিমানটা উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে পূর্বদিকে ছুটল। জয় মুক্তিবাহিনীর জয়, জয় স্বাধীন বাংলার জয়। বিজয় গর্বে উদ্দীপ্ত হাজার হাজার জনতার জয়ধ্বনিতে ফেনী শহর মুখরিত হয়ে উঠল (দলিলপত্র ঃ খণ্ড— ৯, পৃষ্ঠা—২১৩-১৪)।

www.nagorikpathagar.org

সেই পরিবেশে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বিজয় ছিল অবধারিত ও সময়ের ব্যাপার। মাত্র নয় মাসের মাথায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে।

কোন কোন পূর্ণিমার চাঁদকে রাহু গিলে ফেলতে আমরা দেখি। বাংলাদেশের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র যোদ্ধাদের ইস্পাতকঠিন ঐক্যে একটি বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করা হয়েছিল অতি সযতনে। ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা Research and Analysis Wing (সংক্ষেপে RAW)-এর প্রধান রামনাথ কাও-এর পরিকল্পনায় ও গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ সুজিত সিং ওবানের পরিচালনায় ও প্রশিক্ষণে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর বাইরে গড়ে তোলা হয়েছিল মুজিব বাহিনী নামক একটি বিশেষ বাহিনী। বাহিনীর নেতা ছিলেন চারজন—শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ। বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ সরকারকে মানতোনা, কর্নেল ওসমানীকে গ্রাহ্য করত না; স্বাধীনতা যুদ্ধকে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করায়ও এদের আপত্তি ছিল।

> তাজউদ্দিন আগস্টের মাঝামাঝি দিল্লীতে এই অবস্থার সত্বর প্রতিবিধানের দাবী তোলেন কিন্তু হাকসার ও কাও দুজনই নিরব থাকেন।....... কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী কর্নেল ওসমানী মুজিব বাহিনীকে শীঘ্রই তার কমান্ডের অধীনে আনা না হলে পদত্যাগ করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে জানিয়ে দেন। (মঈদুল হাসান, মূলধারা, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৮০)।

কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হয়নি। সেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়ই হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানী অনুপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় চক্রান্ত আবার সফল হল।

যুদ্ধশেষে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ঠাঁই পায়। মুজিব বাহিনীকে ভেঙ্গে দেয়া হয়, কিন্তু জেনারেল ওবানকে নিয়োগ করা হয় শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে। তিনি মুজিব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করে ভারতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। রক্ষীবাহিনী হয় সরকারের সুয়োরানী, আর সেনাবাহিনী দুয়োরানী। সুয়োরানী খাট-পালঙ্কে বসে থাকে, আর দুয়োরানী ঘরদোর ঝাঁট দেয় ও বকাঝকা খায়।

আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। চল্লিশের ওপর যাঁদের বয়স, তাঁরা সে অভিজ্ঞতা আজীবন বহন করবেন; ফলত, সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটি গর্বিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি ক্রমেক্রমে বিপর্যস্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী উপহাস ও করুণার পাত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ কিংবা ১৯৭৫ সালে চরম ফ্যাসীবাদী বাকশাল গঠন ব্যাধি ছিল না, ছিল কঠিন ব্যাধির বাইরের লক্ষণ মাত্র। চোরাচালান-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি-দলীয়করণ;

www.nagorikpathagar.org

রক্ষীবাহিনীর নিষ্ঠুরতম হত্যা-সন্ত্রাস-নিপীড়ন প্রভৃতির সমবায়িক যোগফলে সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের প্রশংসাধন্য যুদ্ধবিজয়ী জাতি পরিণত হয় উদ্যমহীন, স্বপ্নহীন, নির্জীব, সন্ত্রস্ত, ভাষাহীন একটি মানবগোষ্ঠীতে। নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের ২১ নভেম্বর ১৯৭৪ তারিখ সংখ্যায় পিটার আর কান লিখেছিলেন ঃ

> চেষ্টা করলে আর সব দেশ সম্পর্কেই অস্পষ্টভাবে সান্ত্বনাদায়ক কিছু বলার কথা চিন্তা করা যায়, কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে তা সম্ভব নয়। এদেশের ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়, দুঃখকষ্ট, বহুমুখী আর্থিক দৈন্য, সম্পদ ও জমির অভাব, জনসংখ্যার বিরামহীন বৃদ্ধি, সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার রাজনীতি ও নৈরাশ্যজনক মানসিকতা সব কিছু মিলে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচাইতে হতাশ জাতিতে পরিণত করেছে। (মুনীরউদ্দিন আহমদের 'বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর' গ্রন্থের ৫১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

ব্যর্থতার প্রধান দুটি কারণ ছিল দেশবাসীর রূপান্তরিত মানসজগতকে অনুধাবন করতে শেখ মুজিবের অপারগতা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা। ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারী পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে শেখ মুজিব যে-জাতির মুখোমুখী হয়েছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। নয় মাসের অভিজ্ঞতা বাঙালী মানসে যুগান্তের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল; ইতিহাসের কয়েকটি বড়-বড় সিঁড়ি তারা লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু শেখ সাহেব রয়ে গিয়েছিলেন আগের অবস্থায়। সেই ব্যবধান দুরতিক্রম্য ছিল। দ্বিতীয়ত, জাতীয় ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছিল বহির্দেশীয় পরামর্শে, এবং ব্যক্তিশাসন, পারিবারিক শাসন, বড় জোর উপদলীয় শাসন কায়েম করে। যুদ্ধকালীন ঐক্যকে প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে যুদ্ধোত্তর সমস্যার মোকাবেলা করার সর্বজনীন দাবি গুরুত্ব পায়নি। বিভেদ করে শাসন করার নীতিই কার্যকর ছিল। রুশ-ভারতের অনুগত রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে দেশপ্রেমিক জোট গঠন, বাকিদের ঢালাওভাবে স্বাধীনতা-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা; মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন রেখা টানা প্রভৃতি জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। অবস্থার এমনই অবনতি হয়েছিল যে, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সাড়ে ছয় কোটি মানুষ একপক্ষে, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাকি এক কোটি অন্যপক্ষে চলে গেল। আড়ালে-আড়ালে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে হাজী; দ্বিতীয় পক্ষ প্রথমদের রাজাকার বলে উপহাস করত। এই পরিস্থিতিতে পনের আগস্টের মত ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক বা আকস্মিক ছিল না।

[তিন]

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর। প্রথম দিনের ঘটনা অবশ্যই রক্তাক্ত ও হৃদয় বিদারক ছিল, কিন্তু সেদিন দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ শান্তির ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল নতুন যুগ ও নতুন রাজনীতি প্রতিষ্ঠার। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন

www.nagorikpathagar.org

নবপর্যায়ে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ২৭ আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়কদের অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

> এই কাজের জন্য তাঁরা গোটা জাতিরই অভিনন্দন লাভের যোগ্য। গোটা জাতি যে সময় দিগ-বিদিগ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শুধু নীচের দিকে তলাইয়া যাইতেছিল, সেই সময় তাঁরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়া এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। ব্যক্তিপর্যায়ের কাহারও জন্য দুঃখ শোক বা সহানুভূতি প্রকাশের চাইতেও জাতীয় স্বার্থের দিকটা বড় করিয়া দেখার যে আবশ্যকতা সেই বিবেচনায় এই নতুন রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইতে হইবে।

পনের তারিখের ঘটনা সংঘটিত করেছিলেন সেনাবাহিনীর অল্প কয়েকজন সদস্য, কিন্তু ঘটনার পর নীরব থেকে সম্মতি জানিয়েছিলেন কোটি-কোটি মানুষ। সেদিন থেকে বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা শুরু হয়েছে বলে কেউ-কেউ বলতে শুরু করেছিলেন। এই মনোভাবে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণে ভারতের বিরক্তিকর খবরদারীর বন্ধন আলগা হয়ে বাঙালীদের আনন্দ ও সম্মানবোধ যে বেড়েছিল তাতে বিতর্কের কিছু নেই। আওয়ামী লীগ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শুধু ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি, বহির্জগতেও বাংলাদেশকে ভারত-রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের অন্তর্গত বলে পরিচালিত করেছিল। মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল আবু তাহেরও স্বীকার করেছেন যে—

> ষোলই ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। এতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের অসাবধানী, অযোগ্য ও দেউলিয়া আচরণের জন্যই প্রবাসী সরকার সর্বত্র অকেজো হয়ে পড়েছিল। (লারেন্স লিফশুলৎস-এর 'অসমাপ্ত বিপ্লব' গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

শেখ মুজিবের ওপর মানুষের অপরিসীম আস্থা নষ্ট হয়ে যায় যখন তিনি চুক্তির মাধ্যমেই সেই অধীনতামূলক মিত্রতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠামোগত রূপ দেন। সেজন্য, তাঁর পতনের পর যথার্থ স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হবে বলে আশাবাদ জাগ্রত হয়েছিল।

তিন মাসের মাথায় আসে নভেম্বর মাসের ঘটনারাজি। তিন তারিখে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান করে জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করেন। সে-ঘটনায় ভারতে খুশির বন্যা বয়ে যায়—জাতীয় সংবাদপত্র ও সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার প্রচারিত খবর থেকে সে-ধারণা হয়। পরদিন 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি দিবস' পালন করার জন্য রুশ-ভারতপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে খালেদের মা ও ভাইয়ের নেতৃত্বে মিছিল বের করে। ঘটনাটি ছিল আগুনে ঘি ঢালার মত। বাংলাদেশের ওপর ভারতের খবরদারীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশঙ্কা সারা দেশে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় বিভিন্ন সেনানিবাসে। তখনই ঘটে ৭ তারিখের অবিস্মরণীয় বিস্ফোরণ। খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সমর্থকেরা সেনানিবাসে প্রাণ হারান, জিয়াউর রহমান মুক্ত হন; ভোর বেলা দলে দলে সৈনিকেরা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে জনতার উত্তাল সমুদ্রে মিশে যায়। দৈনিক বাংলা পত্রিকা রিপোর্টের অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ ঃ

www.nagorikpathagar.org

মিছিল মিছিল আর মিছিল—বিপ্লবের, বিজয়ের উল্লাসের মিছিল। শ্লোগান আর শ্লোগান। কণ্ঠের আর বুলেটের মিলিত শ্লোগান। করতালি আর করতালিতে প্রাণের দুন্দুভি। আকাশে উৎক্ষিপ্ত লাখো হাত একের পর এক প্রত্যয়ের স্বর্ণ ঈগল। পথে পথে সিপাহী আর জনতা আলিঙ্গন করছে, হাত নেড়ে জানাচ্ছে অভিনন্দন—কাঁধে কাঁধ হাতে হাত এক কণ্ঠে এক আওয়াজ সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, স্বাধীনতা রাখবোই রাখবো, হাতের সঙ্গে হাত মিলাও, এক কাতারে শামিল হও।

এইভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো সিপাহী-জনতার ঐক্যসংহতি। সেই ঐক্য ১৯৭১ সালে ছিল, এবং সেকারণেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় ত্বরান্বিত ও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯৭২-৭৫ সময়ে ঐক্যকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল নতুন ঐক্য ও সংহতি। ষোল ডিসেম্বরের ঢাকা ও সাত নভেম্বরের ঢাকার চেহারা প্রায় একই ছিল। প্রথম দিন বিজয়ের আনন্দ, দ্বিতীয় দিন সফলভাবে প্রতিরোধ করার উল্লাস।

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ করা শুধু নয়, সমাজকাঠামো বদল করার একটি অন্তঃসলিলা উপাদান সম্পর্কেও অবগত হওয়া গেছে সেদিন। ৭ নভেম্বরের সাফল্যের পর বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সম্পর্ক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৭৬ সাল থেকে একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশকে মরুভূমি বানানোর চক্রান্ত, বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, পঁচাত্তরের পরাজিত শক্তির যেসব সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানো সে-প্রক্রিয়ার একেকটি স্তর। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯৭৬ সালেই সীমান্তে হামলা হয়েছিল ১৩১৬ বার। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৮/১২/৭৯) আবরার চৌধুরী ১৯৭৭ সালের ৮ এপ্রিল সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে বিরোধ সে বিরোধ শুধু সীমান্তের বিরোধ কিংবা দুটি প্রতিবেশী দেশের সাধারণ সমস্যা সম্পর্কিত বিরোধ নয়। এই বিরোধের মূল কারণ রাজনৈতিক। এই উপমহাদেশের যে কয়টি দেশই স্বাধীন-সার্বভৌম নীতির ভিত্তিতে তাদের নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করবে তাদের সাথে ভারতের এই বিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

লেখক আবরার চৌধুরী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক।

আসলে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনাপূর্বক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের সংশ্লিষ্টতার নতুন তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দুটি পৃথক উদ্দেশ্যে ঃ বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল চব্বিশ বছরের শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করা; ভারতের আগ্রহ ছিল বড় শত্রু পাকিস্তানকে কাটছাঁট করে এই অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত

www.nagorikpathagar.org

হওয়া। পূর্বোক্ত জেনারেল ওবান তার Phantoms of Chittagong বইয়ে লিখেছেন ঃ

We had for the first time in a thousand years of our history won a victory of such magnitude that it changed balance of Power not only in Asia but in the World and set into motion process of peace which we had not right even to dream of.

প্রবন্ধের শুরুতে তিনটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এবারে সেগুলোর অবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া যেতে পারে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের পর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের লক্ষ্য ভিন্ন হয়ে যায়। বাংলাদেশ চায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত ও নিশ্চিত করে, ক্ষুধা দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অশিক্ষা নিরসনপূর্বক একটি সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে। সে লক্ষ্যেই চব্বিশ বছর যাবৎ এদেশের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছে, এবং যুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে।

এখানেই অস্বস্তি দিল্লীর। লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হলে দিল্লীর ক্ষতি দু'দিকে ঃ প্রথমত, আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশ ভারতের খবরদারী মানবেন , দ্বিতীয়ত, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা প্রবলতর হয়ে উঠবে। রাজ্যগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অসীম ও অনাবিষ্কৃত। কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ শিথিল ধরনের। ধর্মবিশ্বাসের ও নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় ভারতের অপরাপর অংশের সঙ্গে পার্থক্য অনেক। বাইরের শক্তি তাদের অসন্তোষে ইন্ধন যোগাতে পারে। আগামী শতাব্দীতে এই অঞ্চল ঘিরে আন্তর্জাতিক তৎপরতা জেঁকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেজন্য ভারতের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দুর্বল, পঙ্গু ও তার ওপর নির্ভরশীল করে রাখা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীতে ইতিমধ্যে সে বাঁধ দিয়েছে; বাংলাদেশের পানি ঘোলা করার ইচ্ছায়ও সে বাদ দেয়নি। বাংলাদেশকে অক্টোপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা তার আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় রাজনীতির জন্য অনেক জরুরী। মুজিব বাহিনীর আদর্শের সরকার ক্ষমতায় থাকলে তার অনেক সুবিধা। ৫৪টি নদী, ২টি সমুদ্র বন্দর ও প্রধান-প্রধান সড়ক যদি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, বিদ্যুতের চাবিকাঠিও যদি হস্তগত করতে পারে, যদি পারে বাংলাদেশের বাজার ভারতীয় পণ্যে সয়লাব করে দিতে এবং ভারতের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে, তাহলে যে মতলব নিয়ে '৭১-এর যুদ্ধে শামিল হয়েছিল, তা হাসিল হবে।

আজকের দিনে তাই অধিক জরুরী হয়ে পড়েছে ৭ নভেম্বরের চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। ৭ নভেম্বর জাগ্রত করেছে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে। প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার সাধ্য নেই কোন চক্রান্তের-দেশিবিদেশী কোন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবুদ্ধির ক্ষমতা নেই এদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে আঘাত করে দুর্বল করার। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাণীতে মূর্ত হয়েছে ঐদিনের মর্মবাণী—'শির দেগা নাহি দেগা আমামা।'

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের লক্ষ্য

অনিরুদ্ধ

আজকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস সারাদেশে পালিত হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি নতুন মোড় সূচিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের বেগবান ধারাটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন বিন্যাসের সূচনা করে। প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিই আমাদের নাগরিক জীবনের যে আধুনিক ধারা তাকে জিইয়ে রেখেছে, অথচ কোনরূপ নাগরিক সুখসুবিধা গ্রাম সমাজের জীবনযাত্রাকে নতুনতর আস্বাদ এনে দেয়নি। ৭ নভেম্বরে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়ার মধ্যে মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করা এবং দেশের অর্থনীতিতে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা, উৎপাদন ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাদের চেতনার স্তরের সাথে সম্পর্কিত রেখে বিকাশে মনোযোগী হওয়া।

আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস তৃতীয় বর্ষে পড়েছে। এ দু'বছরে উপরোক্ত চিন্তাধারা ও কাজের ভিত্তিতে কতখানি দেশের অর্থনীতি প্রভাবিত হয়েছে তার একটা বিজ্ঞানসম্মত জরিপ প্রয়োজন।

একথা নির্মম হলেও সত্য, এদিকটায় নজর খুব বেশি পড়েনি। প্রথমতঃ দেখা যাক সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন, তার রূপায়ন কতটা কোন্ ক্ষেত্রে কিভাবে কার্যকর করা চলছে।

এদিক থেকে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রশ্নটি সর্বাগ্রে আসে। একটি বড় পরিকল্পনায় অর্থযোগান, বিশেষভাবে শিল্পায়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার যোগান সহজসাধ্য নয়। সেখানে সামগ্রিক পরিকল্পনার কাঠামোতে স্থানীয় ভিত্তিতে বেশি সংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে উদ্যোগ সৃষ্টি এবং তাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাই স্বেচ্ছাশ্রমের প্রধান দিক। দ্বিতীয়তঃ কুটির শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে গ্রামের ভিতরে নিয়ে যাওয়া এতে বেকার সমস্যার যেমন কিছুটা সমাধান সম্ভব, তেমনি গ্রামের মেয়েদের মধ্যেই সামাজিক সাশ্রয় হবে। অবশ্যই এসব সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে সংকট বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেলের রাজনীতি নামে প্রচলিত এ হাতিয়ার ব্যবহার নির্ভর করেছে জেনেভা সম্মেনের সাফল্যের ওপর।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনীতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উপরোক্ত প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মত মজবুত ভিত আমাদের নেই, এ কথাটা স্বীকার করে অগ্রসর হওয়া ভাল। কাজেই বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর স্থানীয় সাফল্য নির্ভর করছে জনসাধারণের মধ্যে স্বরির্ভর হওয়ার প্রণোদনাকে সাফল্যের সাথে জাগ্রত করা এবং কাজে লাগনো। সৎ ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গ্রাম পর্যায়ে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে এবং এর অনুৎপাদিত দিকগুলো যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ স্কুল সংলগ্ন জমির জঙ্গল কাটা বা কচুরিপানা পরিস্কার করা অপেক্ষা উৎপাদনমুখী দিকের প্রতি যেমন খালকাটা, জলসেচ ব্যবস্থা এবং অনুরূপ কাজকে বেশি করে উৎসাহিত করা। কোনমতে লোকের মুখে অন্ন যোগানোর জন্য কাজের ব্যবস্থা হল টেস্ট রিলিফের সাথে তুলনীয়। এতে সাময়িকভাবে দুর্বিপাকগ্রস্থ লোকজন উপকৃত হয়, তার স্থায়ী ফল তেমন কিছু নয়। কারণ এটা কোন সামগ্রিক পরিকল্পনায় কোন অঙ্গ নয় আপৎকালীন ব্যবস্থার মোকাবিলা করার লক্ষ্যে চালিত।

দেখা গেছে, গত দু'বছরে এদিকে স্বনির্ভর আন্দোলন আদর্শ গ্রাম সৃষ্টির প্রণোদনা বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের মূলে কাজ করেছে ব্রহ্মপুত্র নদ পুনর্খননসহ উলশী প্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রমে জনগণকে প্রণোদিত করার ব্যবস্থাটি। শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্য, আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব তৎপরতা এবং মাইনে করা লোক দিয়ে ঘড়িধরা নিষ্ঠায় দেশ গড়া চলে না। সরকার স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে এই ধারণা বদলে দিয়ে তার স্থানে আত্মনির্ভরশীল, প্রত্যয়ী একটি জাতির মানসিক কাঠামোটা মজবুত করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের মত দরিদ্র দেশের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করছে যে, জাতীয় সংহতি অর্জন কাজের মধ্য দিয়ে যত সহজে অর্জিত হতে পারে, প্রচারণা আর বাকসর্বস্ব সমাবেশ ততখানি কার্যকরী নয়। অবশ্য প্রচারণা, সভা-সমাবেশ করে লোকজনকে উজ্জিবিত .করার প্রয়োজন রয়েছে নিঃসন্দেহে ; কিন্তু ওখানেই যদি যাত্রাপথ শেষ হয় তবে তার পরিণতিতে হতাশা ও নিজের অবিশ্বাসের ধারাটা প্রবল হয়।

আজ উলশী ধরনের প্রকল্প গড়ার কথা চারদিকে শোনা যাচ্ছে। উলশীর একটি দৃষ্টান্ত কয়েক ডজন সমাবেশ অপেক্ষা অনেক বেশি লোককে নিঃসন্দেহ হতে সাহায্য করেছে স্বনির্ভরের পথ কী।

গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠ সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে উলশী ধরনের প্রকল্প, আদর্শ গ্রাম ও কুটির শিল্পের ভিত্তি আরো ব্যাপক করা চলে।

একটি জাতির সর্বনিম্ন চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে এভাবে সংগঠিত করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

৭ নভেম্বর–১৭

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে এরই পাশাপাশি শিল্প বিকাশের ধারাকে আরো বেশি সক্রিয় করার প্রয়োজন রয়েছে। শিল্পোন্নত দেশ তাদের নিজের স্বার্থ ছাড়া আমাদের এই শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে খুব বড় একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে না। এ কথাটা মনে রেখে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটা অংশ আমাদের শিল্পের উপেক্ষিত দিক অর্থাৎ যন্ত্র শিল্প গড়ার দিকটি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন শুধুমাত্র কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আমরা বিশ্বের বাজারে আমাদের বাণিজ্যিক লেনদেন বিপুল ঘাটতি কাটিয়ে সামনে এগুতে পারবো না

অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ছাড়া এবং সবল অর্থনীতি গড়ে তুলতে না পারলে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ করা যায় না। পরমুখাপেক্ষী দুর্বল জাতি প্রতিমুহূর্তেই প্রবলের অর্থনৈতিক চাপ ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের শিকার হয়, তাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন এই শ্লোগান দিয়ে কিংবা দেশ-প্রেমকে একমাত্র কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একান্ত সম্পদ বিবেচনা করে সমগ্র জাতিকে সর্বদা সন্ত্রাস্ত রেখে ঐক্যের ধারাকে প্রবল করা যায় না। নিরন্তর উত্তেজনা ও স্নায়ুপীড়িত মানুষ দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনের অমনোযোগী হয়ে গড়ে। ঢাকঢোল পিটিয়ে সব লোকজন জড়ো করে মাঠে-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখার নজির অনেকে রেখেছে, আর পরবর্তী সময়ে তার প্রতিক্রিয়া একটা দেশকে কিভাবে সংকটের আবর্তে ঠেলে দেয় ইতিহাসের সে নজির রয়েছে। আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ধীর-স্থির ঠাণ্ডামাথায় নিরন্তর নিজের শক্তি বৃদ্ধি উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের স্থিতিশীলতাকে কেউ বিঘ্নিত করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সবল অর্থনীতির বিত্তিই জাতির আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ় করে।

আমাদের ইতিমধ্যেই দুটো উল্লেখযোগ্য সাফাল্য অর্জন করেছে। এর প্রথমটি কৃষি ক্ষেত্র। এবারের অকাল বন্যা ও নানা দুর্যোগের মধ্যেও এবার ফসল ভাল হয়েছে। এরই সাথে সীমান্তের অশান্তি আজ শূন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে। ধৈর্য, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা এক্ষেত্রে সুফল এনেছে।

দ্বিতীয় সাফল্য সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ফারাক্কার চুক্তি। এখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্মানজনক পর্যায়ে, সমমর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে নানারূপ উস্কানির মুখে দৃঢ়তা, আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থান গ্রহণ দীর্ঘ ২৫ বছরের একটি জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মীমাংসা বর্তমান সরকারের আমলেই সাফাল্যের মুখ দেখেছে।

এই আত্মপ্রত্যয়ের বিজয় আর আত্মসন্তুষ্টিকে যেন এক না করে ফেলি। এসব সাফল্য দিয়ে গত দু'বছরকে যেমন বিচার করবো, যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে, সেখানে

www.nagorikpathagar.org

দৃঢ়তার অভাব রয়েছে তারও একটা সুষ্ঠু পর্যালোচনা দরকার। পরিকল্পনাবিদরা আসবেন অর্থনীতি ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামো বিন্যাসে। বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের সচেতন অংশ বালখিল্য স্বার্থান্ধ চাটুকারদের দূরে রেখে নির্ভীকভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরবেন সমস্যা সামাজিক অবস্থার বিচার বিবেচনা। যে আত্মবঞ্চনা একদিন সমাজ জীবনে ঘুণ ধরিয়েছিল, যে রক্ষণশীলতা সামাজিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে আমাদের জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে পদে পদে শত্রুর প্ররোচনা বলে আখ্যায়িত করেছিল, তাদের কুম্ভীরাশ্রু যেন আজ জনগণকে বিভ্রান্ত না করে।

গত দু'বছরে যেসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে সংহত করেই আমরা সংহতি দিবসের সার্থকতাকে উপলব্ধি করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এই সংহতিকে দৃঢ় করতে পারি।

হীনমন্যতা বোধই আশেপাশে বন্ধনের প্রাচীর তুলে বিকাশের পথ রুদ্ধ করছে। একটি আত্মপ্রত্যার্থ জাতি বিকাশের সমষ্টি সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়ে নিজে সমৃদ্ধ হয় এবং অপরকে সমৃদ্ধির পথ দেখিয়ে ইতিহাসে খুব নেতৃত্বের ভূমিকায় জাতীয় গৌরবকে সমাসীন করে। তাই জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে সর্বক্ষেত্রে আত্মবিকাশ হোক আমাদের লক্ষ্য।

সংবাদ ঃ ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭

www.nagorikpathagar.org

৭ নবেম্বর ও উৎপাদনমুখী রাজনীতি ধারা

অনিরুদ্ধ

রাজনৈতিক দলগুলোর মেনিফেস্টোতে সাধারণতঃ তত্ত্বগতভাবে কতকগুলো মৌলিক ধ্যান-ধারণা স্থান পায়, কিন্তু তাদের কর্মসূচীতে জাতীয় অর্থনীতির কোন সুস্পষ্ট স্থান থাকে না। রেশনে সস্তা দরে চাল অথবা ভোগ্যপণ্য সংস্থার দোকানে ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা চালু করার মধ্যেই যখন সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়ে, সেখানে রাজনীতি ক্ষেত্রে উৎপাদনমুখী রাজনীতির ধারা প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি মৌলিক পদক্ষেপ। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতির জন্য দেশবাসীর মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আপন শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার যে শপথ সেদিন জাতি গ্রহণ করছিল, তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনীতি কিরূপ পরিগ্রহ করবে সেদিন তা স্পষ্ট ছিল না অনেকের কাছেই। পরবর্তী সময়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, এই চেতনাকে ধরে রাখার জন্য এবং তাকে সংহত করার জন্য তৎকালীন উপ-সামরিক প্রধান প্রশাসক বর্তমানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার জন্য গ্রামভিত্তিক প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলার ভিত্তি তিনি রচনা করেন স্বেচ্ছাশ্রমে আপামর সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। স্বনির্ভর আন্দোলনের মূল কথাই ছিল গ্রামকে ইউনিট হিসেবে ধরে ভিত থেকে অর্থনীতিকে দাঁড় করানো।

গত দু'বছরে এই প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনের পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর সুফলকে ধরে রাখার জন্য প্রধানতঃ দুটো শ্লোগানকে সামনে আনেন। প্রথমটি হল উৎপাদনমুখী রাজনীতি এবং দ্বিতীয়টি হল শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করা এবং সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ উন্নয়ন কার্যক্রম।

কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে এ যাবৎ কোন রাজনৈতিক দল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ করতে এগিয়ে আসেনি। রাষ্ট্রপতি জিয়াই তার দলের কর্মসূচীতে এটা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে স্বীয় ভাগ্য গড়ার কাজে তার মুক্তি নিয়োগ এবং তাকে সমবেতভাবে প্রয়োগের ধারাটাকে সমবায়ের চেতনার উদ্বোধন করে সামনে আনেন।

www.nagorikpathagar.org

দেশের অর্থনীতির কৃষিপ্রধান চরিত্র এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নতিশীল শিল্পসমৃদ্ধ দেশের মতো পুঁজি আমাদের নেই এই বাস্তবতা অনুধাবন করে তিনি প্রথমেই খাদ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস এবং স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ সাধ্য কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

স্বেচ্ছাশ্রম আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ জনসাধারণের সুপ্ত চেতনাকে এবং কর্মস্পৃহাকে যৌথ ভিত্তিতে জাগ্রত করা। যে দেশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ৭৫ লাখ যুবক বেকার সেখানে স্বেচ্ছাশ্রম অপেক্ষা কর্মসংস্থানের ধারাটি প্রবল করাই হল প্রধান ও প্রাথমিক কাজ। কিন্তু শ্রমের প্রতি ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের অনাগ্রহ ও ভুয়া মর্যাদাবোধ প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সেখানে গ্রামমুখী মানসিকতা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বেচ্ছাশ্রমকে আন্দোলনের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে এই ঔপনিবেশিক চিন্তার জড়তাকে প্রবল আঘাত করেন। বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে হলে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূলধন সৃষ্টি ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। শিল্পের প্রাথমিক কাঁচামালের ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমানে যেমন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি অনাহৃত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন এবং তাকে আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্যোগ বর্তমানে সরকার নিয়েছেন। বস্তুতঃ উৎপাদনমুখী রাজনীতির যে দর্শন রাষ্ট্রপতি জিয়া উপস্থাপন করেছেন, শিল্পক্ষেত্রে গৃহীত এসব কর্মসূচী তার একটা অঙ্গ।

রাজনৈতিক মতাদর্শ-বিক্ষত একটি সমাজ এবং পথের সন্ধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তাত্ত্বিক মতপার্থক্য এবং তার পক্ষে-বিপক্ষে জনসাধারণকে সমাবেশ-করার নেতিবাচক ধারায় অভ্যস্ত দেশবাসীর কাছে প্রয়োজন ছিল কাজের বাস্তব নির্দেশ।

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার কাজটি দুরূহ সন্দেহ নেই। এর ওপর বৈদেশিক সাহায্যের নামে প্রকৃতপক্ষে শিল্পোন্নত দেশের স্বার্থ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই সত্যটি উপলব্ধি যথেষ্ট নয়। ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্য কমিয়ে এনে এবং দেশীয় সম্পদের উপর উন্নয়নের নির্ভরশীলতা ব্যাপক করার বস্তুনিষ্ঠ ধারা গ্রহণ করেই আমরা বৈদেশিক সাহার্য্যের উপরোক্ত ধারাকে সংকুচিত করে দেশের উন্নতির পথ নির্বাধ করার লক্ষ্যে চালিত করতে পারি। এজন্য অবহেলিত উৎপাদনশীল এলাকাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হাঁস-মুরগী খামারের উন্নতি এবং মৎস্য চাষের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। খাল-বিল, নদী-নালায় যে মাছ পাওয়া যায় আজ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে ত্রিশ বছর আগে আমাদের জনসংখ্যা যা ছিল এখন তা দেড়গুণ বেড়েছে। অথচ আমাদের মৎস্য সম্পদ প্রাকৃতিক নিয়মেই যোগানের ক্ষেত্রে একই স্থানে রয়েছে। এর পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বৃদ্ধি সম্পর্কে এযাবৎ সমগ্র দেশ-ভিত্তিক কোনরূপ কর্মসূচী ছিল না। প্রয়োজনের স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু উদ্যমের কোনরূপ

www.nagorikpathagar.org

আয়োজন ছিল না। বর্তমান সরকার মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। দেশের হাজার হাজার মজা এবং অবহেলিত পুকুর সংস্কার করে মাছের চাষ করলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রফতানী করার মতো উদ্বৃত্ত সৃষ্টি কোন আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়।

কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে তথা মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কিংবা কোন কর্মকাণ্ড যাতে একটিমাত্র লোকের উৎসাহ বা এলাকার উদ্যমের মধ্যে সীমিত না থাকে, তা একটা পদ্ধতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সচেতন দৃষ্টি রেখেছেন। সমবায় সম্পর্কে তার গৃহীত পদক্ষেপ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই উদ্যোগসমূহকে সমবায়ের মধ্যে রূপ দিলে একদিকে যেমন একটি পদ্ধতি গড়ে ওঠে, তেমনি রাজনৈতিক দল হিসেবে যারাই সরকার গঠন করুন তারা অর্থনীতির একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের কর্মসূচীকে জনকল্যাণে নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা পাবেন। দেশকে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক একটা ভিত্তি নির্দিষ্টভাবে ধরে অগ্রসর না হলে স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং তা গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। কারণ দেশে স্থিতিশীলতার মূলে তাকে সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস। নতুবা দেশের মধ্যে অশান্তি দানা বেঁধে উঠে এবং জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয় ভিত্তিটা দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাত্ত্বিক ক্ষেত্র ছাড়া বাস্তবে কোনরূপ অর্থনৈতিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল একথা জোর দিয়ে বলা চলে না। একটি নবীন রাষ্ট্রকে তার অর্থনীতিকে সংহত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ অবশ্যই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়ক হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রক্তের বিনিময়ে অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সর্বাংশে অগ্রসর হতে পারেনি। প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ দিয়ে একটি কৃষিপ্রধান এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যেমন মার্কিন দেশের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পোন্নত হতে পারে না, তেমনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পথে অগ্রসর হওয়ার কোন বস্তুগত ভিত্তি ছাড়া আইন পাস যথেষ্ট নয়। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকসহ যতগুলো কারণ অহরহ রাজনীতিবিদগণ প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহার করেন, তার মধ্যে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য পাঠাতে বিলম্ব করার চক্রান্ত অন্যতম। একথা স্বীকার করে নেয়া ভাল যে, বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত অর্থনীতি যদি কোন দেশবিশেষ কিংবা মহল বিশেষের না-পছন্দ হয় এবং সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয় তবে সেখানে দোষারোপ করে লাভ নেই। প্রকৃত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তবমুখী অর্থনীতির ভিত রচনাই ছিল সেদিন প্রাথমিক কাজ। তা না করার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ধারায় প্রভাব ফেলেছিল। বর্তমান সরকার অর্থনীতির একটা ভিত রচনার জন্য সচেষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

এই প্রচেষ্টায় দেশের জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং দেশীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চাকাটা যখন পুরো ঘুরে আসবে, তখন সরকার বদলের ধারাটা জাতীয় সংহতির ভিত দুর্বল করবেনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য প্রবল হয়ে উঠবে না, বরং গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি পরবর্তী সরকারের সামনে সমস্যা সমাধানের পথ সুগমের সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে অর্থনৈতিক ধারার উপর জোর দিচ্ছেন এবং উৎপাদনমুখী রাজনীতির ধারায় যেখানে গ্রামের সর্বাংশে বিকাশের জোর দিচ্ছেন তার সাফল্য নির্ভর করেছে জনগণের মিলিত বাহুর শক্তিকে যৌথশ্রমে রূপান্তরিত করার কাজের সাফল্যের ওপর। সমবায়কে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন কর্মসূচীর ধারায় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলে একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এটা কোন একটি দলের মাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে না দেখে জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে ব্যাপক জনগণের উৎপাদনশীল তৎপরতায় পরিণত করার ধারাটার ওপর জোর দিতে হবে। জাতীয় সংহতির কথাটা এই চেতনার নিরিখেই বিচার্য। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লব। সেই সংহতির ভিত্তিটার সূচনা করেছিল।

(দৈনিক সংবাদ ঃ ৭ নভেম্বর, ১৯৭৮)

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ঃ দেশপ্রেম–চেতনাদীপ্ত মহাদিবস

রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে এক দেশপ্রেমিক মহান নেতার নাম। একজন আলোকিত মানুষ। তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করলে বেরিয়ে আসে সফল এক প্রতিকৃতি। তিনি জীবন বাজি রেখে এদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলন। তাঁর ব্যক্তিগত সততা সকলের উর্ধ্বে। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি বারবার সংকটাপন্ন দেশ ও জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একাত্তরের উত্তাল মার্চে গোটা জাতি যখন দিশেহারা, শেখ মুজিব তখন একদিকে রেসকোর্স ময়দানে গালভরা ভাষণে দেশবাসীকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব পাওয়ার জন্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন পাক-সেনা শাসকদের সঙ্গে। এরই মধ্যে আমাদের নিধনের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ২৫ মার্চের কালো রাতে গোটা জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক-হায়েনারা। আকস্মিক এ ঘটনায় শেখ মুজিব হলেন স্বেচ্ছায় বন্দী। তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা পাততারি গুটিয়ে কলকাতায় আশ্রয়ে নিলেন। শেখ মুজিব ও তাঁর পাক-অজগরের লেজে খোঁচা দিয়ে ফুঁসে ওঠা অজগরের মুখের গ্রাস হিসেবে দেশবাসীকে ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। এমনি এক সংকট মুহুর্তে বিপদাপন্ন জাতিকে স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস যোগালেন তৎকালীন মেজর জিয়া। মেজর জিয়ার উপর এই গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত ছিল না। একজন সেনা অফিসার হিসেবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে এই রিভল্ট ঘোষণা সত্যিই তার জন্যে বিপজ্জনক ছিল। পান থেকে চুন খসলেই কোর্ট মার্শালে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শহীদ জিয়া সেদিন দেশ ও জাতির রক্ষার্থে অত্যাচারী, খুনী, স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র রিভল্ট ঘোষণা করেছিলেন। এই ভাবেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমাদের দু শ' বছরের পরাধীনতার শেকল ভাঙার মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

কবি বলেছেন,

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জাতীয় জীবনের দু'টি ঘটনায় কবির এই নিরেট সত্যটি ভুল প্রমাণিত করেছেন শহীদ জিয়া। একবার স্বাধীনতার ঘোষণায় অন্যবারে ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ও সংহতিতে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনাকে বলা চলে আরেক শেকল ভাঙার দিন। বলা চলে পুনঃস্বাধীনতার প্রাপ্তি দিবস। '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাতের নেপথ্য নায়ক ছিলেন মুজিব সরকারেরই কেবিনেট মিনিস্টার খোন্দকার মোশতাক আহমাদ। খোন্দকার মোশতাক সরকারের কেবিনেট ছিলো মুজিবেরই কেবিনেট। স্বাভাবতই মুজিব হত্যার বেনিফিশারি ছিল মুজিবেরই দলের লোক তথা মন্ত্রীনেতারা। হালুয়া রুটি থেকে বঞ্চিত আ'লীগেরই আরেকটি গ্রুপ একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সেনা অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগের মিছিলের নেতৃত্বে দেখা যায় তার ভাই ও মা'কে।। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় খালেদের অভ্যুত্থানের সমর্থনে লেখালেখি হতে থাকে। দেশবাসী বুঝতে পারেন খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় আসা মানে আওয়ামী বাকশালী তথা তাঁবেদার সরকারের পুনরুত্থান হওয়া। দেশবাসী বুঝতে পারেন রক্ত, আব্রু আর প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। এহেন সংকটকালে দেশ ও জাতিকে রক্ষায় এগিয়ে আসার নেতা কই। কোথায় ত্রাণকর্তা?

৭ নভেম্বর আমাদের বিপন্ন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষার্থে দিশেহারা আম-জনতার পাশে জীবন বাজি রেখে আবারো এসে দাঁড়ালেন বাংলাদেশের মহান নেতা তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। হতাশ, চিন্তা ও শংকাযুক্ত দিশেহারা জনতা আর বারংবার সেনা অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানে বিশৃংখল সিপাহীরা বিনা বাক্যে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিলেন জেনারেল জিয়ার নেতৃত্ব। শহীদ জিয়ার ব্যক্তিগত সততা, দেশপ্রেমি ও সৎসাহসের কারণেই এদেশের সিপাহী-জনতা তাঁকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে ছিলেন। সিপাহী-জনতার সেদিনকার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না তার প্রমাণ শহীদ জিয়ার নীতি আদর্শে গড়া জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আজকের নিরঙ্কুশ বিজয় ও ক্ষমতা লাভ। মহান নেতা শহীদ জিয়া আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন দেশ গড়ার এক দীক্ষা, দিয়ে গেছেন জাতীয়তাবাদের চেতনা। দেশপ্রেমের মহান শিক্ষা। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার যোগ্য উত্তরসুরি দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শহীদ জিয়ার নীতি-আদর্শ ও লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাবো ইনশাল্লাহ্। এই হোক আজ আমাদের সবার দৃপ্ত শপথ।

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস

কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বীর প্রতীক

৭ নভেম্বরকে বর্তমান সরকার অগ্রাহ্য করে সরকারী ছুটি বাতিল করে দিয়ে পূর্বের মত ইতিহাস বিকৃত করে আগামী প্রজন্মের ওপর একটি মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর যারাই ঢাকায় ছিল এবং দেখা ও বোঝার মত বয়স হয়েছিল তারা ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের কথা ভুলতে পারবে না। যে জোয়ারে কিছু সময়ের জন্য হলেও আধিপত্যবাদী শক্তি তার দেশের ভেতরে ষড়যন্ত্রকারীরা অথবা এজেন্টরা অকেজো হয়ে পড়েছিল, ভেসে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে তারা আবার শিকড় গেড়েছে। ৭ নভেম্বরের চেতনা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধীদের এবং আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে এক অনবদ্য হাতিয়ার। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহনকারী বর্তমান সরকার তাই ৭ নভেম্বরকে বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। আজকে আমার প্রশ্ন, যারা সেদিন ঢাকায় ছিলেন সেদিনকার ঢাকায় উপস্থিত সাংবাদিক, পুলিশ, বিডিআর, মিলিটারীসহ আম জনতার প্রতি আপনারা সেদিন কি করেছেন এবং কি দেখেছেন? বিনা নেতৃত্বে, বিনা ঘোষণায় সেদিন লাখ লাখ জনতা-সিপাহী ঢাকার রাজপথে একসাথে একটি আওয়াজ আকাশে-বাতাসে মুখরিত করে তুলেছিল। এই সংহতি, সিপাহী-জনতার ঐক্যবদ্ধ বজ্রকণ্ঠের শপথ ধ্বনি 'স্বাধীনতার শত্রুরা হুঁশিয়ার' 'রুশ-ভারতের দালালরা হুঁশিয়ার'। আজকে আমরা হয়ত নিজস্ব স্বার্থের কারণে দৃশ্যটি দেখেও দেখছি না। সাধারণ মানুষ ও সাধারণ সিপাহীরা অর্থনৈতিক সংগ্রামে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে বারবার স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে হতাশ। কিন্তু সেদিনকার দৃশ্য তাদের কাছে স্পষ্ট। যদিও বর্তমান সরকারের নেতৃবৃন্দের মিথ্যাচারে বিস্মিত-লজ্জিত তারা। ৭ নভেম্বরের দৃশ্য তাদের মনে পড়লেও সিপাহী-জনতা এখন আর 'স্বাধীনতার শত্রুরা হুঁশিয়ার', 'আধিপত্যবাদীরা হুঁশিয়ার' আওয়াজ উঠাতে পারছে না, এক অদৃশ্য শৃংখলে বাধা পাচ্ছে। যেসব সাংবাদিক সেদিন ঢাকায় ছিলেন তারা ৭ নভেম্বরের দৃশ্য দেখেছেন। আজ যখন ৭ নভেম্বরের প্রশ্নে তাদের নীরবতা দেখি তখন দুঃখ হয়। ৭ নভেম্বর কি, কেন এবং তার ব্যাপকতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের চেয়ে কম ছিল কি? সেদিন ৭ মার্চের ভাষণ যেমন পাকিস্তানপন্থীদের ভাল লাগেনি, তেমনি আধিপত্যবাদী

www.nagorikpathagar.org

শক্তির বর্তমান অনুচরদের ৭ নভেম্বরের সংহতি প্রকাশের আওয়াজ ভাল লাগার কথা নয়। ৭ নভেম্বর কোন মিলিটারী মারার অথবা সিভিলিয়ান মারার সম্পর্কীয় ঘটনা নয়। ৭ নভেম্বর অনেক উর্ধ্বের সংহতি প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত। কিছু হলেই বলে অমুক মরেছে, তমুক মরেছে, '৭১ সালেও স্বাধীনতা বিরোধীরা যুদ্ধের সময় মারা গেছে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে না থাকলে তারা মারা যেত না। যেমন—একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না করলে শেখ মুজিব ঐভাবে মৃত্যুবরণ করতেন না।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ক্যু হওয়ার পর ভারতপন্থী আওয়ামী লীগরা যখন বিজয় মিছিল বের করে তখনই তারা চিহ্নিত হয়ে যায় ভারতীয় আধিপত্যবাদের পক্ষ আধিপত্য হিসেবে। ভারতীয় আধিপত্যবাদের দোসর হিসেবে চিহ্নিত না হলে এবং বাকশালের উত্থানের ভয় না পেলে খালেদ মোশাররফ মরতেন না। কোন কোন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে বলে যারা কথায় কথায় আবেগ ঝরাতে ব্যস্ত তাদের কাছে প্রশ্ন—ঐসব নেতারা বলে তাদের কাছে আমার ঐ সময়কার কর্মকাণ্ডগুলো তথা দুঃশাসন কায়েম করার কর্মটি কি দেশের মানুষের চাহিদা ছিল, না যুক্তিসঙ্গত ছিল? মানুষের কর্মের জন্য আদালতেও ফাঁসি হয়, সে ফাঁসিকে হত্যা বলে না, বলে দণ্ড। কর্মের ফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে, যদি না আল্লাহ মাফ করেন। আজ যারা কিছু মর্মান্তিক মৃত্যুর বাহানা দিয়ে বাকশালের স্বাভাবিক পতনকে স্বীকার করে না, তারা অবশ্যই গণতন্ত্রের শত্রু। আজ যারা ৭ নভেম্বরের সংঘটিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য সিপাহী-জনতার ঐক্যকে কলংকিত করতে চায় তারা আসলে আধিপত্যবাদীদের দালাল। তারা কিন্তু ৭ নভেম্বর, ৮ নভেম্বর, ৯ নভেম্বর, ১০ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে গর্তে ঢুকে গিয়েছিল সিপাহী-জনতার ভয়ে। আজ তারা সুযোগ পেয়েছে। মূলত সিপাহী-জনতার অনৈক্যের ফাঁক গলে ওরা বের হয়ে এসেছে, ৮ নভেম্বরের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পেলে তখনই ওরা বলত।

২১ বছর পরিশ্রম করে সিপাহী-জনতার বিভেদ সৃষ্টি করে বলার যৌক্তিকতা আছে কিনা, সেদিন যারা ঢাকাতে ৭ নভেম্বর দেখেছে, শুনেছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদের ধ্বনি, তারা বৃদ্ধ হয়েছে, ক্লান্ত হয়েছে ; কিন্তু ভ্রান্ত বোধহয় এখনও হয়নি। বর্তমান দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাধা দিয়ে বেশী মনে করলে জনগণ আবার সিপাহীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। সে হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীরা ভেসে গিয়েছিল, নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। কারণ এটা ছিল Unlistment of People's Power অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল সেদিন। ষড়যন্ত্র, দালালী, মীরজাফরী, মোনাফেকী ইত্যাদি জনসাধারণ করে না, করে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। জনশক্তি বিস্ফোরণ যখন ঘটে ঐ

www.nagorikpathagar.org

বিস্ফোরণে এই ধরনের ব্যক্তিরা উড়ে যায়, ভেসে যায়। ৭ নভেম্বরের পরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পতনের ইতিহাস। সেদিন ৭ নভেম্বরের ঘটনার পর সিপাহী-জনতার আহ্বানে আবার বেরিয়ে এলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের কিংবদন্তীর নায়ক ও স্বাধীনতার ঘোষক সফল প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান। ৭ নভেম্বর এমন একটি দিন, যা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যতদিন চিরঞ্জীব থাকবে ততদিন আমাদের সার্বভৌমত্ব সংহত থাকবে। এজন্য কোন ব্যক্তি বা দলের আশায় বসে না থেকে প্রতিনিয়তই দালালদেব চিহ্নিত করতে হবে। তাদের অকেজো করতে হবে। তাহলেই জীবিত থাকবে বাংলাদেশ, আবাদ হবে বাংলাদেশ, মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত থাকবে "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'।

আসলে সাধারণভাবে ৭ নভেম্বরে জনতার এবং সিপাহীদের এতবড় বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত সংহতি হল কেন? অনেকে অনেক কথা বলবে, অনেকে বলবে শ্রেণী সংগ্রামের কথা, অনেকে বলবে কিছুটা ধর্মীয় চেতনার কথা, অনেকে বলবে সেই আমলের নির্যাতনের কথা, সন্ত্রাসের কথা, অনেকে বলবে গণতন্ত্রের কথা। ৭ নভেম্বরের সবচেয়ে সহজ-সরল সুর ছিল গণতন্ত্র হত্যাকারী শেখ মুজিবের সরকার ও তার অনুচরদের তথা ভারতীয় দালাল সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন প্রতিহত করা।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বাকশালের তথা ভারতীয় দালাল সরকারের পতন হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ উৎফুল্ল হয়। ইত্তেফাকসহ সেদিনের পত্রিকার হেডলাইনগুলো দেখলে তা বুঝা যাবে। ৩ নভেম্বরের ঘটনাকে, ক্যু-কে সিপাহী-জনতা মনে করল এটা পুরো ভারতপন্থী একনায়কত্বের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা দখল। যেটা সাধারণ সিপাহী-জনতা গ্রহণ করেনি। তারা ৩ নভেম্বরের ভারতীয় দালালদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে রুখে দাঁড়ায়। সিপাহী-জনতার প্রতিবাদ প্রতিরোধে ভেসে যায় ৩ নভেম্বরের ষড়যন্ত্রের সকল আয়োজন। এগিয়ে আসে ৭ নভেম্বরের সোনালী দিন। ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সিপাহী-জনতা একাকার হয়ে স্লোগান তোলে—'স্বাধীনতা এনেছি, স্বাধীনতা রাখব'।

আজকের প্রেক্ষাপটে ৭ নভেম্বরকে তাঁবেদার দালাল এবং ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রহণ করবে না—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জনগণের **সেই স্বতঃস্ফূর্ত** বিপ্লবগাঁথা, এদেশের মানুষের বিপ্লব, জনগণ হৃদয়ে ধরে রাখবে। আসুন আমরাও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এবং জাতীয় জীবনের সকল স্তরে ৭ নভেম্বরের বাণী ও কর্ম ধারণ করে রাখি।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ও পরবর্তী অধ্যায় ঃ জিয়া ও তাহেরের ভূমিকা

আমিনুর রহমান সরকার

৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা যেমন পথহারা নাবিককে পথের দিশা দেয়, ৭ নভেম্বরও আমাদের জাতীয় জীবনকে পথের দিশা দিয়েছে, দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এর চেতনা যুগে যুগে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে আধিপত্যবাদী-আগ্রাসনবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত করতে এবং জাতিগত সুকৃতি নির্মাণ করতে।

৭ নভেম্বরের ঘটনা আচমকা, এমনি এমনি ঘটেনি। এর একটি পটভূমি ছিল, কিছু প্রস্তুতি ছিল, রাজনৈতিক আদর্শ ছিল এবং এর সঙ্গে গণসম্পৃক্তিও ছিল। এ কারণেই এটি সাধারণ সেনা অভ্যুত্থান নয়, বরং মহান এক বিপ্লব। এই বিপ্লবের কুশীলব ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ও তাঁর অনুসারীরা এবং অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল তাহের ও তার অনুসারীরা। ঘটনার সন্ধিক্ষণে জিয়াউর রহমান গৃহবন্দী ছিলেন। গৃহবন্দী অবস্থাতেই তিনি টেলিফোনযোগে বন্ধু তাহেরকে উদ্দীপ্ত করেন এবং বিপ্লব সফল করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এরপরই ১৯৭৫-এর ৬ নভেম্বর রাত ১১টায় বিপ্লব শুরু হয়ে যায় এবং রাত ১টার দিকে এটি সম্পন্ন হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সফল সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। সেনাবাহিনীর তরুণ কিছু অফিসার এই অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন। স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হওয়ায় দেশে সুস্থিরতা ফিরে আসে। কিন্তু সেনা-অফিসারদের মধ্যে দেখা দেয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর উচ্চাভিলাষ। ৩ নভেম্বর উচ্চাভিলাষী খালেদ মোশাররফ চক্রান্ত করে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সেনাপ্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। এক শ্রেণীর সামরিক অফিসারের দ্বন্দ্ব, বেষারেষি এবং তার ফলে ক্যান্টনমেন্টে যে বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছিল, সাধারণ সিপাহীরা তা প্রথম থেকেই ভাল চোখে দেখেনি। তাদের অনেকেই ভেতরে ভেতরে সংগঠিত হচ্ছিল। ৩ নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর ওপর তার কমান্ড প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। প্রায় তিনদিন বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্ট

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। সরকারবিহীন অবস্থায় থাকায় দেশের ভেতর দেশের প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে ঢাকার রাজপথে খালেদ মোশাররফের সমর্থনে বাকশালের মিছিল এবং আকাশবাণীতে অভ্যুত্থানের পক্ষে সংবাদ প্রচার, ৩ নভেম্বরের ঘটনাকে আধিপত্যবাদী নীলনকশারূপে প্রতিপন্ন করে। এরই ফলে ক্ষুব্ধ সিপাহী দল, প্রাক্তন সেনা ও মুক্তিযোদ্ধা এবং কিছু বেসামরিক ব্যক্তি ৬ নভেম্বর রাত ১১ টায় বিপ্লব শুরু করে। রাত ১টার দিকে বিপ্লবী সিপাহীরা জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ দশা থেকে মুক্ত করে আনে। ৭ নভেম্বর প্রত্যুষে রাজপথে সেনাবাহিনী ও জঙ্গী জনতার যে মিছিল সংঘটিত হয়, তাতে শ্লোগান ছিল ঃ

(১) নারায়ে তকবীর—আল্লাহু আকবর,

(২) খন্দকার মোশতাক, খন্দকার মোশতাক—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ,

(৩) জিয়াউর রহমান, জিয়াউর রহমান—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ

(৪) জিয়া, জলিল, তাহের—তোমায় লাল সালাম লাল সালাম।

সেনাবাহিনীর কিছু নিরীহ সিপাহী এই বিপ্লবকে খন্দকার মোশতাকের অনুকূলে বলে ভ্রম করছিল। কারণ দু'দিন আগেই খালেদ মোশাররফ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে মোশতাককে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। যাহোক, শেষোক্ত শ্লোগানটি উচ্চারিত হয় জাসদকর্মী তথা তাহের অনুসারীদের মধ্যে। লক্ষণীয় যে, তাদের শ্লোগানে জিয়াকেই অগ্রভাগে রাখা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, সে সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি ছিল অন্য অফিসারদের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে। তিনি বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও তিনিই ছিলেন বিপ্লবের প্রাণ-পুরুষ। আর এই বিপ্লবের নকশাকার ছিলেন জিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহের। তবে বিপ্লবের পর পরই এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে জিয়াউর রহমান আর কর্নেল তাহেরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। চীনা ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কর্নেল তাহের চেয়েছিলেন বাম নেতাদের সমন্বয় একটি বিপ্লবী কাউন্সিল এবং একটি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ। আর জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন বিভেদ নয় জাতিগত ঐক্য এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই রশি টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানই জয়ী হন। তিনি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সিপাহীদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন এবং সেনাবাহিনীতে ও দেশে দ্রুত শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন।

এই ঘটনাকে আজ তাহের অনুসারীদের বা জাসদ নেতাদের কেউ কেউ বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রচার করছেন। কিন্তু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেদিনের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একি সর্বৈব মিথ্যা ; কেবল তাই নয়, একেবারেই বিপরীত

www.nagorikpathagar.org

অভিযোগ। ৭ নভেম্বর অন্তরীণ দশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকে বিপ্লবের অংশীদারদের সাথে তিনি পরিপূর্ণভাবে আন্তরিক ছিলেন। রাত দেড়টায় ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল তাহেরের (অব.) সাথে বৈঠকেই তিনি তাহেরের পরামর্শ অনুযায়ী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বেশ কিছু দাবী মেনে নেন এবং তাৎক্ষণিক আদেশে ঔপনিবেশিক যুগের বাটম্যান প্রথা তুলে দেন। কর্নেল তাহের তাঁকে শহীদ মিনারে ভাষণ দেবার আহবান জানালে তিনি বিনয়ের সাথে তা এই যুক্তিতে প্রত্যাখান করেন ... তুমি সেনাবাহিনীতে নেই, কিন্তু আমি সেনাবাহিনীতে আছি। শহীদ মিনারে তুমি ভাষণ দিতে পারো, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সামরিক পোশাকে আমি সেখানে ভাষণ দিলে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটবে। (৭ নভেম্বর ঃ ঘটনা ও কার্যক্রম ড. আনোয়ার হোসেন, বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ ১০ নভেম্বর সংখ্যা ১৯৯৭)।

খুবই সত্য কথা। এরমধ্যে কোনো কপটতা বা লুকোচুরি নেই। বিপ্লবের যিনি প্রাণ-পুরুষ, যাকে কেন্দ্র করে, যার ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে, যার অনুসারীদের রাস্তায় নামিয়ে বিপ্লব-সম্পন্ন করা হলো এবং যার ওপর বিপ্লবী লক্ষ্যের ভূত-ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভরশীল তাঁর যুক্তি পরামর্শ আমলে নেয়া উচিত ছিল। ওই সময় কর্নেল তাহের এবং জাসদ নেতারা যদি জিয়াউর রহমানের সাথে একমত হতেন, তাহলে ইতিহাস সম্ভবত একটু ভিন্ন রকম হতো। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন জারির প্রয়োজন পড়তো না। মোশতাকের অনুসারী ডানপন্থী, জিয়ার অনুসারী মধ্যপন্থী, কর্নেল তাহেরের রাজনৈতিক সংগঠন জাসদ গণবাহিনী এবং বিপ্লবের সমর্থক অন্যান্য অংশের সমর্থনে একটি জাতীয় সরকার গঠন সম্ভবপর হয়ে উঠতো। আধিপত্যবাদী শ্যেনদৃষ্টির বিপরীতে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহতকরণ এবং অবাধ গণতন্ত্র চালূ করা সেই জাতীয় সরকারের লক্ষ্য হতে পারতো। এ প্রসঙ্গে জর্জ দিমিত্রভের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলতেন, 'সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দেলনের সাংগঠনিক রূপ হবে, যুক্তফ্রন্ট—সমাজের সকল সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ ফ্যাসিবাদ বিরোধী অংশের যুক্তফ্রন্ট।' ৭ নভেম্বরে আধিপত্যবাদের কালো হাত ভেঙে দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যবাদকে নিঃশেষ করা এবং অবাধ গণতন্ত্র চালু করার প্রশ্নটি তখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জাসদ নেতারা তা উপলব্ধিতে নেননি। বিপ্লবীপনা তাদের এতটাই পেয়ে বসেছিল যে, মুক্তিপ্রাপ্ত জিয়াউর রহমান যখনই কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা মতো তার শেল্টারে গিয়ে হাজির হলেন না, বরং ক্যান্টনমেন্টে তাঁর অনুসারী সৈনিকদের মাঝে উপস্থিত হলেন, তখনই তারা ধরে নিলেন, বিপ্লবের নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে গেছে, আমরা হেরে গেছি।' এভাবে বিপ্লবের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার এবং ওই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ শক্তির সাথে জাসদ নেতৃত্ব নিজেরাই দূরত্ব রচনা করে চলছিলেন। একদিকে

www.nagorikpathagar.org

ক্যান্টনমেন্টে সাধারণ সৈনিকদের 'কেওস', তারা জিয়াউর রহমান ছাড়া কোনো সামরিক অফিসারকেই বাঁচিয়ে রাখতে রাজী নন : আরেকদিকে বিপ্লবের অংশীদার শক্তিগুলোর মধ্যকার অনৈক্য ও বৈরিতা পরিস্থিতি এমন বিশৃংখল করে তুলেছিল যে, এক সাথে সকলকে সন্তুষ্ট করা বা বিশেষ কোনো পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়া কোনোটাই সম্ভব ছিল না জিয়াউর রহমানের পক্ষে। সামরিক শাসন জারি ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোনো পথই আর খোলা ছিল না। এখানে লক্ষণীয় যে, সামরিক শাসন জারি করলেও বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের অবদানের কথা তিনি স্মরণ করতে ভোলেননি। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর বিকেলে তিনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় দেশবাসী

আসসালামু আলায়কুম,

বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের নিরাপত্তাবিধানে অংশগ্রহণকারী সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ভাইদের এবং মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সৈনিকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সশস্ত্র বাহিনীর ভাইদের স্ব-স্ব কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তনের জন্যও আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে সর্বান্তকরণে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য এবং আল্লাহ তা'লার ওপর অবিচল আস্থা স্থাপনের জন্য আমি দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

এই ভাষণে জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ, বিডিআর, আনসার বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সৈনিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কর্নেল তাহের নিজে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সৈনিক। তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী এবং সৈনিক সংস্থাও প্রধানত এ ধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে, জিয়াউর রহমান বিপ্লব মুহূর্ত থেকেই তার বক্তব্য ও মতামত প্রদানে স্পষ্ট ও অকপট, বেতার ভাষণেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বচ্ছসামরিক আইন প্রশাসক অর্থাৎ ওই সময়ের মূল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম আবিলতা, কুটিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ওই মুহূর্তে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী অন্যদের কথা উল্লেখ না করে সমস্ত কৃতিত্ব নিজের বলে জাহির করার সুযোগ ছিল তার। কিন্তু তিনি তা করেননি।

পক্ষান্তরে তাহের অনুসারী ও জাসদ নেতারা কি করেছিলেন? তারা খুব দ্রুত জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুরো ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র চার পাঁচদিনের মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। যারা মাত্র কয়েকদিন আগে জিয়াকে জিন্দাবাদ দিয়েছেন, তারাই তখন

www.nagorikpathagar.org

'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়ে জিয়ার বিরুদ্ধে আরেকটি অভ্যুত্থানের কথা ভাবছেন। তাহের অনুসারীরা এই সব ভাবলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সিপাহীরা জিয়াকে মোটেই বিশ্বাসঘাতক মনে করেননি, বরং জিয়াই তাদের প্রিয় নেতা, জনগণও তখন জিয়ার সমর্থক। তবু তাহেরের নেতৃত্বে জাসদ ও গণবাহিনী আরেকটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে। কয়েকবার গোপন সভায় অভ্যুত্থানের তারিখ ঠিক হয় ও পাল্টানো হয়। এদিকে জিয়াও ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেন। তিনি দ্রুত তার অবস্থানকে সংহত করেই প্রতিপক্ষের ওপর অতর্কিত আঘাত হানলেন। ২৩ নভেম্বর জাসদ নেতারা গ্রেফতার হলেন। ২৪ নভেম্বর সৈনিক সংস্থার যে গোপন সভা হবার কথা ছিল, সেখান থেকে কর্নেল তাহের গ্রেফতার হলেন। সৈনিক সংস্থার সদস্যরাও গ্রেফতার হলেন। (মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম ঃ হায়দার আকবর খান রনো, পৃষ্ঠা—১৮৯)।

আজ তাহের অনুসারীদের অনেকেই প্রচার করছেন, জিয়াউর রহমান তাঁর 'মুক্তিদাতাকে ফাঁসি' দিয়েছেন, 'বিচারের প্রহসন' করেছেন ইত্যাদি। এইসব অভিযোগ সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। কর্নেল তাহের, তার সহযাত্রী এবং অনুসারীরা ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য গ্রেফতার হননি। তার স্বীকৃতি ও সম্মান জিয়াউর রহমান যথাস্থানে যথোপযুক্তভাবেই তাঁদেরকে দিয়েছেন। মূল সত্য হচ্ছে এই যে, জাসদ-নেতারা গ্রেফতার হয়েছিলেন ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি ক্যু, হত্যা-প্রচেস্টা তথা প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দায়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব হত্যা মামলার এক সাক্ষী মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন তার জবানবন্দীতে কর্নেল তাহের সম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন, 'সিপাহী বিপ্লবের অভিযোগে নয়, ১২৪ দণ্ডবিধির অধীনে তার ফাঁসি হয়েছিল।

সত্যি বলতে কি, এই ফাঁসিও জিঁয়াউর রহমান চাননি। শুনলে অনেকেই চমকে উঠবেন, ফাঁসি রদ করার জন্য তিনি বেগম লুৎফা তাহেরকে প্রেসিডেন্ট সমীপে মার্সি পিটিশন দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাহের পরিবার এই অনুরোধ রক্ষা করেননি। হয়তো তার একটি প্রধান কারণ, জাসদ নেতারা তাহের পরিবারকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, সামরিক সরকার কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেবার সাহসই পাবে না। তারা এমন কথাও শুনিয়েছিলেন যে, সরকার যদি তাহেরকে সত্যি সত্যি ফাঁসিতে ঝুলাতে চায় তার আগেই দেশজুড়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে। ওদিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সেলে অন্তরীণ কর্নেল তাহেরের কাছেও তখন 'আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' জিগির বাগাড়ম্বর, উদ্ভট চিন্তা ও বাণী কম পাঠানো হয়নি। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবী কর্নেল তাহেরের এটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এবং জীবনের সবচেয়ে করুণতম ট্রাজেডি যে তার শক্তি-সাহস-কুশলতা, মহৎ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা স্রেফ মিথ্যার ফানুসের ওপর ভর করে নিঃশেষ হয়ে গেল।

জিয়াউর রহমান যে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেটা '৭৬ সালে তাহেরের পারিবারিক সূত্রেই কেউ কেউ জেনে গিয়েছিলেন। আজ

www.nagorikpathagar.org

তাহের বেঁচে নেই। জিয়াও লোকচক্ষুর আড়ালে, কাজেই এই ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ দুরূহ ব্যাপার। ভরসা কেবল তাহের পরিবার। তারা সাহস করলেই ইতিহাসের এই সত্যটি উন্মোচিত হয়ে যায়। (৭ নভেম্বর ; বিপ্লব বনাম ভ্রান্তিবিলাস/চক্ষুষ্মান, দিনকাল ঃ ১০ ডিসেম্বর, '৯৭)।

আজ ইতিহাসের দিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকালে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় জিয়াউর রহমান ছিলেন এই ভূ-খণ্ডের পরম আশীর্বাদ। যখনই জাতির জীবনে সমূহ সংকট, চরম দুর্যোগ, তখনই জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ত্রাণকর্তার মতো। একাত্তরের সেই টালমাটাল দিনে গোটা জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য পাগলপারা সেই মুহূর্তে পাকিস্তান আর জিন্দাখানায় স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করলেন সেই সময়ের প্রধান নেতা শেখ মুজিবর রহমন। জাতি সেই মুহূর্তে হালভাঙ্গা তরীর মতো দিশেহারা, সংক্ষুব্ধ স্রোতাবর্তে ঘুর্ণায়মান কিন্তু না সেই অসহায়ত্বের বেদনা বেশিক্ষণ বইতে হয়নি। ২৫ মার্চ কালোরাত্রিতে শেখ মুজিবর রহমান যখনি থেমে গেলেন, তার পর মুহূর্তেই অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রত্যুষে জাতির হাল ধরলেন জিয়াউর রহমান।

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিলেন, সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করলেন, মহাদুর্যোগ থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রক্ষা করলেন। আবার ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আধিপত্যবাদী হিংস্র থাবা যখন আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নসাৎ করতে উদ্যত, অন্তরীণ থেকেও জিয়াউর রহমান টেলিফোনযোগে বিপ্লবী বন্ধু তাহেরকে উদ্দীপ্ত করলেন। বিপ্লব সফল হলো। জাতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পর কর্নেল তাহের যেই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী, হঠকারী, নৈরাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়লেন, জিয়াউর রহমান সংযত হয়ে সুস্থির চিত্তে সমূহ অঘটন থেকে জাতিকে রক্ষা করলেন।

জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক বলয় থেকে ক্ষমতা মঞ্চে আসেননি। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক তিনি ছিলেন না। অথচ তিনি যে রাজনীতি, যে অর্থনীতি, শাসন প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন, সমগ্র জাতি তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করলো, এও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। আরো বিস্ময়কর, যে বিপ্লবীরা বছরের পর বছর, দশকের পর দশক সমাজতন্ত্রের জন্য গোপনে, প্রকাশ্যে লড়াই করলেন, রক্ত দিলেন, রক্ত নিলেন, তাদের অনেকেই জিয়াউর রহমানের রাজনীতিতে শামিল হলেন। এমনকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 'পুরুষ'রাও জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবের অর্ধযুগ পরে হাজার হাজার কর্মী সংগঠকের আত্মদানের কথা ভুলে গিয়ে সমাজতন্ত্রের', লাইন বিলোপ করলেন। মেতে উঠলেন তারা 'অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র', আরো গণতন্ত্র ইত্যাদি শ্লোগান নিয়ে, যেগুলো শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতি নয় শ্রেণী সমন্বয়ের রাজনীতি। বহুদলীয় গণতন্ত্র আর শ্রেণী সমন্বয়মূলক রাজনীতির সাথে যার খুব একটা প্রভেদ নেই। প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিক না হয়েও জিয়াউর রহমান কিভাবে ওই সময়ে যুগোপযোগী, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

যারা মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে আসেন তারা যে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার গুণেই ভালমন্দ, সঠিক বেঠিক-এর পার্থক্য নিরূপণ করে অগ্রসর হন, এ হচ্ছে তারই সার্থক দৃষ্টান্ত। স্মর্তব্য যে, জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবকালে গোটা বিশ্ব জুড়েই চলছিল

www.nagorikpathagar.org

সমাজতন্ত্রের সংকটকাল। ১৯৭৬ ও '৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কস-লেনিনের ভলিউমের চেয়ে বাইবেল বিক্রি হয়েছিল বেশি। অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট দর্শনের বিপরীতে সোভিয়েত জনগণের মানসরাজ্যে চলছিল তুমুল এক তোলপাড়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাও থিতিয়ে এসে সোভিয়েত সমাজকে সংকট কবলিত করে তুলছিল। ওই সময় চীনের নতুন নেতা দেং জিয়াং বেং আত্মমুখী কম্যুনিস্ট অর্থনীতি এবং 'একলা চলো' বিদেশনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে 'ওপেন পলিসি' হাজির করেছেন। ইউরোপ-আমেরিকায় প্রযুক্তি বিপ্লব গোটা বিশ্বকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি এসে দাঁড় করিয়েছে। তখন মার্কস-লেনিন-মাওয়ের দেখা ধ্রুপদী পুঁজিবাদ নেই, ওই ধারার শ্রম-শোষণ বা শ্রেণী বৈষম্যও নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তবতা আর থাকে কি করে?

এদিকে এশীয় ভূ-মণ্ডল এমনিতেই ধর্মীয় চেতনা তথা অধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান। এখানে নাস্তিক্যবাদের ঠাঁই নেই। তার ওপর বাংলাদেশ নামক জনপদের সামাজিক জীবন গোড়া থেকেই পরস্পর সহযোগিতামূলক। এখানকার বিত্তশালীরা প্রায় সবাই 'মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া', ঠিকাদার এবং কমিশন ব্যবসায়ী; মার্কস-লেনিনের সংজ্ঞায়িত শিল্পপতি বুর্জোয়া এখানে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, আদমজী-তেজগাঁওয়ের মিল-কারখানার একজন সাধারণ শ্রমিকেরও হয় দেশের বাড়িতে কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, নয়তো শহরে ক্ষুদ্রাকারে হলেও কিছু ব্যবসাপাতি আছে। অর্থাৎ মার্কস-লেনিন যাকে প্রোলেটারিয়েট বা সর্বহারা বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, সেই ধারার সর্বহারাও এখানে নেই। শ্রেণী-বিভাজন, শ্রেণী বিদ্বেষ যেখানে নেই, সেখানে শ্রেণী সংগ্রাম হবে কিরূপে? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই বা হবে কিভাবে।

এসব বাস্তবতা যাচাই না করে এদেশের বামপন্থীরা অন্ধভাবে মস্কো আর চীনের তত্ত্ব কচকচিয়ে বেহুদা রক্তক্ষয় করেছেন, হাজার হাজার মেধাবী তরুণের মাথা খেয়েছেন। বেশুমার মানুষ মেরেছেন, অনর্থক সময় খরচ করে নিজেদের জীবন বরবাদ করেছেন। এরা সব রাশি রাশি মাথা, বস্তা বস্তা কাগজ নষ্ট করেছেন পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব শনাক্ত করার জন্য। অথচ এদেশে পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্ব কোনোদিনই প্রধান ছিল না। প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাথে স্বাধীন জনগোষ্ঠীর, যেটি জিয়াউর রহমান প্রথম শনাক্ত করেন এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে তা গণমুখী ধাঁচে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন।

বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিস্থিতির যে সংকট সন্ধিক্ষণে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ও উত্থান এবং যেভাবে তিনি জাতিকে রক্ষা করে রাজনীতি-অর্থনীতি, উন্নয়ন-উৎপাদন, শিক্ষা ও প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী অভ্রান্ত দিক-নির্দেশনা দিলেন, তাতে তিনি যুগন্ধর পুরুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ৭ নভেম্বরের মহিমা কোনদিন ম্লান হবে না। জিয়াউর রহমানও যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন এই দেশের মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়।

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব ও সংহতি দিবস ঃ একটি মূল্যায়ন

ড. তারেক শামসুর রহমান

৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর দুটো দিক আছে—একটি সামরিক, অপরটি রাজনৈতিক। সামরিক ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ঘটেছিল, সেটি হচ্ছে—সেনাবাহিনীর সিপাহীরা সামরিক কমান্ডকে উপেক্ষা করে বিদ্রোহ করল। তারা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তায় বেরিয়ে এসে জনতার কাতারে মিশে গিয়ে রচনা করল এক ভিন্ন ইতিহাস। সামরিক পরিভাষায় এটা একটা অভ্যুত্থান। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। অবশ্য এই ঘটনার একটা প্রেক্ষাপট আছে। সেনাবাহিনীর নন-কমিশন্ড অফিসারেরা তাদের কিছু দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু যে জিনিসটি তাদের সেদিন 'বিদ্রোহ সংঘটিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে—বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন।

সেনাবাহিনী নানা কারণে ক্ষমতা দখল করে। সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। যেমন বলা যেতে পারে, প্রিএমটিভ মটিভ, পেনেট্রেশন মডেল, এসকালেশন মডেল ইত্যাদি। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেনাবাহিনীর অফিসাররাই সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন। এ ক্ষেত্রে নন- কমিশন্ড অফিসাররা যে অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন না, তা নয়। ১৯৬৪ সালে তানজানিয়ায় নন-কমিশন্ড অফিসাররা বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারের অনুরোধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সেই বিদ্রোহ নস্যাৎ করে দেয়। ১৯৬৯ সালে সিয়েরালিয়নেও নন কমিশন্ড অফিসাররা বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৯৮০ সালে লাইবেরিয়া ও সুরিনামেও নন-কমিশন্ড অফিসাররা বিদ্রোহ করেছিলেন। তবে পার্থক্যটা হচ্ছে, সিয়েরালিওনে এরা বিদ্রোহ করলেও ক্ষমতায় গিয়ে বসেছিলেন সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসাররা। আর সুরিনামে এরা রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিয়েছিল সিভিল প্রশাসনের হাতে। লাইবেরিয়াতে মাস্টার সার্জেন্ট দিও ক্ষমতা দখল করে নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সে দেশের। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন জেনারেলরা তার অধীনে কাজ করেছিলেন এবং তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এরকমটি হয়েছিল আফ্রিকার বুর্কিনা ফাসোতেও। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে সুবেদার মেজর টমাস সানকারা ১৯৮৩ সালের আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতা দখল করে সে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। নাইজেরিয়ার ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা আছে তবে নন-কমিশন্ড অফিসাররা সেখানে অভ্যুত্থান সংঘটিত করলেও তারা ক্ষমতায় যাননি।

অফিসাররা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর যারা ক্ষমতা পরিচালনা করছিলেন, বাংলাদেশে এ নন-কমিশন্ড অফিসাররা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। কিন্তু তারা ক্ষমতা দখল করলেন না। এরা অন্তরীণ অবস্থা থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করলেন। এর আগে সেনাবাহিনীর একটা অংশ জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী করেছিল। কেন করেছিল এটা বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটল বাংলাদেশে। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব অপসারিত হলেন রক্তক্ষয়ি একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর একটি অংশ একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসারণ করল। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, যিনি বাকশালের নির্বাহী কমিটির ৪নং সদস্য ছিলেন।

সেনাবাহিনীর যে অংশ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিল, তারা আর ব্যারাকে ফিরে গেলেন না। অভ্যুত্থানকারীরা খোন্দকার মোশতাকের সঙ্গে বঙ্গভবনে অবস্থান করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর অপর একটা অংশ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করল। ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল মূলত তাদের নিয়ন্ত্রণে। তারা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী করলেন। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর বাকশালপন্থীরা ঢাকায় মিছিল বের করল। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি আবার সরগরম হয়ে উঠল। লন্ডনের ফিন্যান্সিয়াল টাইমস ওই সময় খবর দিল যে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতা বেড়ে গেছে। পত্রিকাটি আরও খবর দিল, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান মোকাবেলায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যা পরে আর কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭২ সালে ঢাকায় মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী যে ২৫ বছরের মৈত্রী(?) তথা সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তাতে ৯ নং ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় ভারতীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল। সুতরাং এটা একটা ভুল ধারণা যে, জেনারেল জিয়া সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায়

www.nagorikpathagar.org

এসেছিলেন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, একটি সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান জেনারেল জিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ও (১৭৮৯-১৮১৫) এরকমটি ঘটেছিল। রাজা ষোড়শ লুইয়ের স্বৈরাচারী ক্ষমতা, রুটির জন্য কৃষকদের বিক্ষোভ, জনঅসন্তোষ ইত্যাদি কারণে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল ও ১৯৮৯ সালে ১৪ জুলাই উত্তেজিত জনতা আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করেছিল। সেদিন জনতার সঙ্গে সাধারণ সৈনিকরা যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের রুশ শ্রমিকরা ধর্মঘট তথা বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। মার্চের ধর্মঘটের রেশ ধরেই ৭ নভেম্বর (১৯১৭) বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাড শহরের রেলস্টেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করেছিল। সৈনিকরাও সেদিন ছিল বলশেভিকদের পাশে। ইতিহাসে তাই দেখা যায়, কোন গণঅভ্যুত্থানের বা বিপ্লবে জনতা সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে-মিশে অভ্যুত্থানকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশের এরকমটি হয়েছিল এবং ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীই জেনারেল জিয়াকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অবিসংবাদিত পুরুষে পরিণত করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর

এ্যান্থনী মাসকারেনহাস

৩, ৪ ও ৫ নভেম্বর, ১৯৭৫ সালের বাংলাদেশ ছিল সরকারবিহীন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদ তখন নামে মাত্র এই পদে ছিলেন। নভেম্বরের ৬ তারিখে বিচারপতি এ, এস, এম সায়েম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছুই মোশতাকের নামে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে মোশতাক সেই তিনদিন বঙ্গভবনে বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন।

এই সময়ে অভ্যুত্থানের দুই নেতাই দ্বিধাগ্রস্ত এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপযুক্ত হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিলেন। তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় কোন বাধাই অতিক্রম করতে পারছিলেন না। বাস্তব অবস্থা যখন উল্টো, সে সময়ে তাঁরা ক্ষমতার বদল চাচ্ছিলেন। আসলে, অভ্যুত্থানের প্রথমেই খালেদের উচিত ছিল জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা। এটাই একমাত্র তাঁর জীবন বাঁচাতে পারতো।

যদিও খালেদ মোশাররফ এবং সাফায়ত জামিল তখন সরকার নিয়ন্ত্রণ করছিলেন কিন্তু ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতাই তাঁরা প্রকাশ করছিলেন বার বার। খালেদ তখন ইচ্ছে করলে শুধু সামরিক বাহিনীর প্রধানই নয়, প্রেসিডেন্ট এমনকি দুটো পদই এক সঙ্গে গ্রহণ করতে পারতেন। নেতৃত্ব গ্রহণে ব্যর্থতাই তাঁর পতন ডেকে আনে। তিনদিন পর্যন্ত জনগণ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, কে ক্ষমতায় আসে, মোশতাক না কি অভ্যুত্থানের নেতারা? যে রাজনৈতিক শূন্যতা তখন তৈরী হয়েছিল তা তাঁর শত্রুরাই পূরণ করেছিল দৃঢ়ভাবে।

এক সময় খালেদ নতুন প্রেসিডেন্টের মাধ্যমগুলোতে তার অভ্যুত্থানের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তখন পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে। ইতিমধ্যে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হল। এবং এটাই তাঁর ধ্বংস ডেকে এনেছিল। খালেদের অভ্যুত্থান ছাড়াও ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে কমপক্ষে বিশটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল। এর সবগুলোই ছিল অপরিকল্পিত এবং অদূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

নভেম্বরের এক তারিখে যখন খালেদ, সাফায়াত জামিল ও তাঁদের সঙ্গীরা ঢাকা স্টেডিয়ামের কাছে চাইনীজ রেস্তোরাঁয় গোপন সভায় মিলিত হয়েছিলেন, তখনই অন্য

www.nagorikpathagar.org

একটি দলের প্রচেষ্টায় অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলছিল। মোশতাক সরকারকে উৎখাতের জন্যে একটি অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে—এমন গুজব তখন ঢাকার বাতাসকে উত্তপ্ত করে রেখেছিল।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এবং সর্বহারা পার্টি সৈন্যদের তখন বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছিল। যাতে তারা বর্তমান ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কোন কোন গুজবে চীফ অব স্টাফ জেনারেল জিয়াউর রহমানের নামও শোনা যাচ্ছিল যে, তিনিও এরকম একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। সে রকম পাকিস্তান ভাবাপন্ন দলগুলো 'নতুন পাকিস্তান' গড়ার লক্ষ্যে মোশতাকের চেয়েও অধিক আস্থাভাজন লোক খুঁজছিল। ঢাকায় এই শব্দটা এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, সবাই তখন ভাবছিল যে, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। চাইনীজ রেস্তোরাঁর পরিকল্পনাটি ছিল সে সময়ের জন্য খুবই অনুপযুক্ত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে সরকার নিয়ন্ত্রণ করা মেজর ও তাদের ট্যাঙ্ক উৎখাত করা। শান্তিপূর্ণভাবে অথবা জোরপূর্বক—যেভাবেই হোক।

দ্বিতীয়ত ঃ একই সঙ্গে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা এবং তাঁকে জোরপূর্বক অবসর দিয়ে দেয়া। একটি ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল। প্রেসিডেন্ট মোশতাককে কি করা হবে? রাজনৈতিক কারণে খালেদ মোশতাককে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন, রশীদ ও ফারুকের মতো তাঁকে ব্যবহার করতে। কিন্তু কর্নেল সাফায়াত জামিল মোশতাককে একদম সহ্য করতে পারতেন না। তিনি খালেদকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে প্রধান বিচারপতিকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। কিছুক্ষণ আলোচনার পর এই দায়িত্ব খালেদকে দেয়া হয়। শেষপর্যন্ত ৩ নভেম্বর খালেদ মোশতাককে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকতে বলেন। কিন্তু পরদিন যখন জেলহত্যার ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন এটা বজায় রাখা সম্ভব হল না খালেদের পক্ষে। পুরো ব্যাপারটিই খালেদের পরিকল্পনাকে ভন্ডুল করে দেয়।

এখানে একটি ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার যে, এসব পরিকল্পনার আগে অথবা পরিকল্পনার সময় তাজউদ্দিন বা জেলে বন্দী চার নেতার অন্য কেউ জড়িত ছিলেন না। খালেদের গ্রুপের একজন সদস্য যিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনি জানিয়েছেন যে, যদি এই অভিযোগ করা হয় যে, খালেদ তাজউদ্দিন অথবা অন্য কোন নেতাকে সরকার প্রধান করতে চেয়েছিলেন তাহলে মেজররা আত্মসমর্পণ করার পরপরই জেল থেকে তাঁদের মুক্ত করে আনাটাই স্বাভাবিক ছিল না কি? যদি আমরা তা না করে থাকি, তাহলে সহজেই প্রমাণিত হয়, পরিকল্পনায় আমরা তাঁদের গুরুত্বই দিইনি। ৪ তারিখে জেল-হত্যার খবর জানার মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা এই চার নেতার ব্যাপারটা ভুলেই ছিলাম। যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু খালেদ মোশাররফকে এই যুক্তিটি খুব সাহায্য করেনি। মোটের ওপর, তিনি পুনরায়, মুজিববাদী সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন, মনে করে সকলেই তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু

www.nagorikpathagar.org

করেছিল। জাসদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাম্যবাদ' নামক পত্রিকায় খালেদের চার দিনের অভ্যুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছিল ঃ 'খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর সঙ্গীরা ক্ষমতায় এসেই দেশের ওপর সোভিয়েত-ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে জড়িয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগ ও তার লেজতুল্য মনি-মোজাফফর চক্রটি প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ে শেখ মুজিবের ইমেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে।' এটা ঘটনা ছিল না যে, খালেদ কি করেছিলেন। বরং তিনি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সে সময়ে, সেটাই তাঁর পতনকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। সেই সুযোগে তাঁর প্রতিপক্ষরা তাঁর পেছনে 'ভারতীয়' ছাপ বসিয়ে দিয়েছিল। ফলে জনমত তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। মোশতাক ও শেখ মুজিব হত্যাকারীদের উৎখাতে ভারত, খুশি হয়েছিল। ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষ করে, রেডিও ও সংবাদপত্রসমূহ খালেদের অভ্যুত্থানকে ভালভাবেই প্রচার করেছিল। এটাই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। বাংলাদেশীরা তাদেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, খালেদের জন্যে এই সন্দেহই তাঁর বিরুদ্ধে যেতে জনগণকে উৎসাহিত করেছিল।

মোশতাক এবং মেজরদের উৎখাতের খবর শুনে উৎফুল্ল আওয়ামী লীগার, ছাত্র এবং মস্কোপন্থী মুজিব সমর্থিত দলগুলো রাস্তায় নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার, তাঁরা 'মুজিব দিবস' পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শহীদ মিনারসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল বের হয় এবং এগুলো ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরদিন তাজউদ্দিনসহ চার নেতার হত্যার প্রতিবাদে অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয়। চার নেতার তিনজনকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। ৭ নভেম্বর, শুক্রবার মুজিব স্মরণে শোকসভার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর সবকিছুই জনগণকে এই ধারণা দেয় যে, মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যেই এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। তখন জনগণ মুজিব শাসনামলের দুঃস্বপ্ন সবেমাত্র কাটিয়ে উঠছিল এবং ফারাক্কা বাঁধের জন্যে তাদের মধ্যে ভারত বিরোধী চেতনাও চরমে পৌঁছেছিল। এসবের পরেও, যখন তাঁরা আবিষ্কার করল আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিচ্ছে তখন তারা ধারণা করে নেয় যে তাঁর অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত ও আওয়ামী লীগ জড়িত। জাসদ ও মুসলিম লীগের সদস্যরা সমস্ত শহর এবং ক্যান্টনমেন্ট হাজার হাজার লিফলেট ও পোস্টারে ছেয়ে ফেলে। তারা প্রচার করে যে, এই ক্যুর পেছনে ভারত জড়িত। এতে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরে এক সাক্ষাৎকারে শাফায়াত জামিল আমাকে বলেন যে, 'পরের দিন বুধবারের পত্রিকা দেখে খালেদ খুব মুষড়ে পড়ে টেলিফোন তুলে সঙ্গে সঙ্গে মাকে জিজ্ঞেস করে, এটা তোমরা কি করছো? তোমরা মিছিলে গেছো আর কাগজে তোমাদের ছবি ছাপা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। এটা করে তোমরা আমার দিন শেষ করে দিয়েছো। আমি আর নাও বাঁচতে পারি। 'জামিলের মতে, খালেদ বুঝে গিয়েছিল যে, এসব আমাদের বিরুদ্ধে যাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এদের কেউই এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অভ্যুত্থানের নেতারা আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে উৎসাহিত না নিরুৎসাহিত কোনটাই করেননি। প্রথম তিনদিন যেখানে তাঁদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল, সেখানে সেই সময়েই তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকেন। চতুর্থ দিন, নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম তাঁদের পক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সায়েম পরিষ্কারভাবে বলেন যে, 'তার নতুন সরকার নিরপেক্ষ, নির্দলীয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাঁর সরকারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো।' তিনি বলেন যে, 'শেখ মুজিব হত্যায় সেনাবাহিনী জড়িত ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।'

প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ছিলেন নিবেদিত এবং আন্তরিক। সরকার প্রধান হিসেবে তিনি খালেদের অভ্যুত্থানকে মহৎ করে তোলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে তাঁর ভাষণের খবর প্রকাশিত হওয়ার আগেই সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে যায় এবং খালেদ নিহত হন।

স্বল্পস্থায়ী ক্যু'র সময়ে খালেদের একটিমাত্র লাভ হয়েছিল, আর তা হচ্ছে, তাঁর সামরিক পদোন্নতি। ঢাকায় অবস্থিত সামরিক ইউনিটগুলো নিয়ন্ত্রণ করলেও তিনি কখনো নিরাপদ বোধ করেননি। ৫ নভেম্বরে মিলিটারী ফরমেশন কমান্ডারদের এক সম্মেলন ডেকেছিলেন খালেদ। কিন্তু তিনি অথবা শাফায়াত জামিল কেউই ঢাকার অন্যান্য অফিসার বা সৈন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টাটুকুও করেননি, তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। এটা ছিল তাঁদের মধ্যে একটা মারাত্মক ভুল। প্রকৃতপক্ষে, দশম ইস্ট বেঙ্গলের যে দু'জন অফিসারের প্রতি খালেদ আস্থাশীল ছিলেন তারাই সিপাহী বিপ্লবের সময় তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩ থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে খালেদ মোশাররফ 'বৈদেশিক সম্পর্ক' সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো কাজই করতে পারেননি। এই সময়ের মধ্যে বিদেশের সঙ্গে দু'টি মাত্র চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল কাঁচা মাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য এক কোটি পাউন্ডের চুক্তি বৃটেনের সঙ্গে এবং তুরস্কের সঙ্গে ৪৯টি মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার কোচের জন্যে ৩০৯ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি। এর দুটোই ঢাকার সিনিয়ার কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হয়েছিল। অভ্যুত্থানের নেতাদের এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। এটাও উল্লেখ্য যে, 'ভারতীয় দালাল' বলে যে অভিযোগ খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে আনীত হয়েছিল সেটা সায়েমের ক্ষেত্রেও হওয়া বিচিত্র ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ করেনি।

www.nagorikpathagar.org

৬ নভেম্বর মধ্যরাতের কিছু পরেই সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। দু'দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে অস্থির চিত্তে বেঙ্গল ল্যান্সার এবং ২ ফিল্ড আর্টিলারীর সৈন্যরা লক্ষ্য করেছিলেন জিয়াউর রহমান ও মোশতাকের পদত্যাগ। ব্যাঙ্কক ত্যাগের আগে ফারুক ও রশীদ তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু জিয়া মোশতাক এবং 'পাপা টাইগার' হিসেবে পরিচিত জেনারেল ওসমানীর অবর্তমানে সেই আশ্বাসের কোন মূল্যই থাকলো না। তাঁদের রক্ষার জন্যে কেউ থাকলো না। সৈন্যরা এখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলের করুণার পাত্রে পরিণত হল। জামিল অনেক জায়গায় প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, তিনি মুজিব হত্যার প্রতিশোধ নেবেন। সৈন্যরা ভাবলো, ১০তম ও ১৫তম ইস্ট বেঙ্গলকে নিশ্চয়ই তাদের উৎখাতের জন্যে আনা হচ্ছে।

৫ ও ৬ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টসহ সারা শহরে ছড়ানো হলো হাজার হাজার প্রচারপত্র। এই কাজগুলো করলো ডানপন্থী মুসলিম লীগ এবং বামপন্থী জাসদ। এ সময়ে রাজনৈতিক দল জাসদ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু এরা কাজ করছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং বিপ্লবী গণবাহিনীর আবরণে। একটি ব্যাপারে ডান ও বাম উভয় রাজনৈতিক দলই একমত ছিল। আর তা হচ্ছে, খালেদ একজন বিশ্বাসঘাতক, ভারতের দালাল এবং সে ঘৃণিত বাকশাল ও মুজিববাদ ফিরিয়ে আনতে চাইছে।

জাসদ এক ধাপ আরো এগিয়ে গেল। তারা বলল, সিনিয়ার অফিসাররা নিজেদের স্বার্থে জওয়ানদের ব্যবহার করছে। সাধারণ মানুষ ও জওয়ানদের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই। গণজাগরণের ডাক দিয়ে জাসদ ১২টি দাবী পেশ করে। এগুলোর মধ্যে ছিল, ব্যাটম্যান প্রথা বাতিল করতে হবে, অফিসারদের ব্যক্তিগত কাজে সৈন্যদের ব্যবহার করা চলবে না, পোশাক ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে জওয়ান ও অফিসারদের ব্যবধান দূর করতে হবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। জাসদের দাবীসমূহ সেই সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে সৈনিকদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হল।

জাসদের এই দাবীনামা এবং গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়ার পেছনে যে ব্যক্তিটি কাজ করছিলেন তিনি প্রাক্তন আর্মি অফিসার লেঃ কর্নেল (অবসর প্রাপ্ত) আবু তাহের। তিনিই প্রথম জওয়ানদের মধ্যে 'ওরা এবং আমরা' এই ধারণার সৃষ্টি করান এবং অফিসারদের বিরুদ্ধে জওয়ানদের মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেন।

মধ্যরাতের কিছু পরেই অর্থাৎ ৭ নভেম্বরের ভোরের দিকে জওয়ানরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারা অস্ত্রাগার থেকে স্টেনগান-রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্র লুট করল এবং তারা 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই' এবং 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, সুবেদারদের ওপরে অফিসার নাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে দ্রুত ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়ল। জাসদের শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বানে জওয়ানরা এই প্রথম অফিসার নিধনে বেরিয়ে পড়ল।

সিপাহী বিপ্লবের প্রথম ধাক্কা লাগল দশজন তরুণ আর্মী অফিসারের ওপর। এরা ছিল ২ ফিল্ড আর্টিলারী ব্যারাকের কাছে একটি অফিসার্স মেসে। অফিসারদের একজন 'ব্যাটম্যান' এই সময়ে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'জীবন নিয়ে পালান। সিপাহীরা আপনাদের খুন করতে আসছে।' অফিসারেরা বিন্দুমাত্র দেরী না করে সাদা পোশাকে মেসের পেছন দিকের দেয়াল টপকে চলে এলেন সম্মিলিত হাসপাতালের পেছনের ধান ক্ষেতে। তারপর গ্রামের লোকজনের সহযোগিতায় তারা মিরপুর রোডের মধ্য দিয়ে শহরের নিরাপদ স্থানে চলে যান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বেগম জিয়ার ছোট ভাই সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সৈয়দ ইসকান্দার।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল হেড কোয়ার্টার থেকে টেলিফোনে বঙ্গভবনে খালেদ মোশাররফকে সিপাহী বিপ্লবের খবর জানানো হয়। সম্ভবত তিনিও এরকম একটি বিপদ আন্দাজ করেছিলেন। কারণ, তিনি আগেই তাঁর স্ত্রী ও পরিবারকে শহরের গোপন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খালেদ সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি দ্রুত বঙ্গভবন ত্যাগ করবেন। কিন্তু শাফায়াত জামিল বঙ্গভবনেই থেকে যেতে চাইলেন। ৭২ পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল হুদা এবং চট্টগ্রামস্থ ৮ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল হায়দারকে নিয়ে খালেদ একটি বেসামরিক গাড়ীতে বঙ্গভবন ত্যাগ করলেন।

বাংলাদেশের জনমত অনুযায়ী জনগণ খালেদ মোশাররফের প্রতি খুব নির্দয় ছিল। অনেকে মনে করত, তিনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। দেশকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, খালেদ আসলে বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার। যিনি রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার কারণে তাঁর কাজ সম্পাদন করতে পারেননি। এমনকি ফারুক এবং রশীদও তাঁদের লেখা 'দি রোড অব ফ্রিডম' নামক গ্রন্থে খালেদকে 'সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন, 'আসলে খালেদ ষড়যন্ত্রকারীদের সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন মাত্র।'

সারা ঢাকা শহরে এই 'সিপাহী বিপ্লব' দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। রাত একটার মধ্যেই সিপাইরা পুরো ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিল। এদের কেউ কেউ ক্রমাগত ফাঁকা গুলী ছুঁড়তে লাগল। অন্যেরা উত্তেজিত অবস্থায় শ্লোগান দিতে দিতে অফিসারদের খুঁজতে লাগল। বেঙ্গল ল্যান্সারের হাবিলদার সারওয়ারের নেতৃত্বে একদল জওয়ান গেলেন জেনারেল জিয়ার বাসভবনে।

চারদিন বন্দী থাকার পর মুক্তি পেলেন জেনারেল জিয়া। নৈশ পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই জিয়াকে উল্লসিত জওয়ানরা কাঁধে করে নিয়ে গেল ২ ফিল্ড আর্টিলারীর হেড

www.nagorikpathagar.org

কোয়ার্টারে। ঘটনার আকস্মিকতায় তখন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন জিয়া। নাম না জানা অনেক জওয়ানদের সঙ্গে আলিঙ্গন, করমর্দন করলেন তিনি। তাঁদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে জিয়া প্রথমেই ফোন করলেন জেনারেল খলিলকে। তাঁকে বললেন, 'আমি মুক্ত। আমি ভাল আছি। আমার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি দয়া করে এটা মার্কিন, বৃটিশ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের জানিয়ে দিন।'

জিয়া তাঁর মুক্তিদাতাদের কয়েকজন অফিসারকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা হচ্ছেন, জেনারেল মীর শওকত আলী, জেনারেল আবদুর রহমান এবং কর্নেল আমিনুল হক। সৈন্যরা যখন তাঁদের নিয়ে এল তখন তিনি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি তাঁদের সহযোগিতা চাইলেন। 'আমি আর রক্তপাত চাই না', জিয়া তাঁদের বললেন। এর কিছুক্ষণ পর জিয়া বঙ্গভবনে শাফায়াত জামিলকে ফোন করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, সব কিছু ভুলে গিয়ে সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ কর।

পরে এক সাক্ষাৎকারে জামিল আমাকে বলেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করি। আমি তাঁকে জানিয়ে দিই যে, 'আমি আপনার জন্যে কিছুই করছি না।' জামিল বলেন, 'আসলে আমরা সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি। এটাই আমাদের জন্যে মারাত্মক ভুল ছিল।'

এর কিছুক্ষণ পরেই প্রায় শ'দেড়েক জওয়ান এবং বেসামরিক লোক ক্যু' নেতাদের খুঁজতে বিনা বাঁধায় বঙ্গভবনে ঢুকে পড়ল। পালাতে গিয়ে শাফায়াত জামিলের একটি পা ভেঙে গেল। এরপর তিনি তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু দুর্ঘটনাই পরে তাঁকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে দেয়।

রাত দেড়টার দিকে জওয়ানরা রেডিও স্টেশন দখল করে নিলো। তারা রাতের কর্মীদের জানালো যে, জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। বিস্মিত রেডিও'র কর্মকর্তারা প্রথমে বুঝে উঠতে পারলেন না তাঁরা কি করবেন। যখন তাঁরা টের পেলেন যে, জওয়ানরা তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে না এবং খালেদ মোশাররফ পরাজয় বরণ করেছেন, তখন তাঁরা সকলেই উল্লসিত সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সৈন্য এবং সাধারণ মানুষ ভর্তি কিছু ল্যান্সার ট্যাঙ্ক শহরের মাঝখানে এসে পৌঁছল, ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলীর শব্দ শুনে প্রথমে লোকজন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রেডিও'তে ক্রমাগত 'সিপাহী বিপ্লবের' ঘোষণা এবং জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখলের খবর শুনে হাজার হাজার লোক স্রোতের মত রাস্তায় নেমে এল। তিনদিন ধরে তাঁরা বিশ্বাস করছিল যে, ভারত খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে তাদের কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করছে। এখন সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে। সর্বত্র জওয়ান এবং সাধারণ মানুষ খুশিতে একে

www.nagorikpathagar.org

অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করল রাস্তায় নামল। সারা রাত তাঁরা শ্লোগান দিল, "আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ।' অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মতো এদেশের মানুষ আবার জেগে উঠেছে। এটা ছিল একটি স্মরণীয় রাত।

রেডিও বাংলাদেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন যে, তিনি সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সেনাবাহিনীর অনুরোধে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, সাধ্য অনুযায়ী তিনি তার কর্তব্য পালন করবেন। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ এবং কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে সকলকে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন।

জিয়ার সংক্ষিপ্ত, আবেগপূর্ণ এবং সময়োচিত ভাষণ সারাদেশে জাতীয়তাবাদের জোয়ার বইয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এর আগেও একবার তিনি জনমনে আশার সঞ্চার করেছিলেন। আজও তাই হল। রেডিও'তে যারা তাঁর সিপাহী বিপ্লবের ঘোষণা শুনেছিলেন তারা কেউই সেই অভিজ্ঞতার কথা কখনো ভুলতে পারেন না। আমার এক পুরনো বন্ধু আমাকে পরে বলেছেন, 'আমি তখন শুয়েছিলাম। যখন রেডিও'র ঘোষক বলল, এখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান—তখন যেন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে আশার আলো জ্বলে উঠল। তাঁর ভাষণ ছিল খুব সাধারণ, আন্তরিক এবং বিশ্বস্ত। আমি ভাবি আমি আজ অবশ্যই কাজে যাব। আমি নিজেকে সেই দিনের জন্যে প্রস্তুত করলাম। আল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রার্থনা শুনেছিল।'

বাংলাদেশ আবার নতুন করে জন্ম নিল। আবার জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার হল।

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক এ্যান্থনী মাসকারেনহাস বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি পরিচিত নাম। তাঁর লেখা Bangladesh a legacy of Blood ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হবার পর যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই বইয়ের দশম পরিচ্ছেদের শিরোনাম : A night to remember এ অধ্যায়ে লেখক '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। লেখাটির ঈষৎ সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ ছাপা হয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক নিপুণে, '৮৭ সালের নভেম্বরে। আমরা ঐ লেখাটি হুবহু পত্রস্থ করলাম।]

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবোধ

সানাউল্লাহ নূরী

চক্রান্তকারীদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধই জাতীয় নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। জাতির সংহতি যত বেশি সুদৃঢ় হবে, জাতির সঙ্গবদ্ধ শক্তি যত বেশি প্রবল হবে, তত বেশি সুনিশ্চিত হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কঠিন স্বাধীনতা রক্ষা করা। আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলি ছলে বলে কৌশলে ছোট ছোট দেশের স্বাধীনতা গ্রাসের অপচেষ্টা চালায়। তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার কিংবা নিজেদের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেবার অর্থ লেজুড়বৃত্তি বা তাবেদারী। স্বাধীনতার প্রশ্নে এদেশের মানুষ যে কোনরকম আপোষ করতে প্রস্তুত নয়, স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম তা বার বার স্পষ্ট করে তুলেছে। ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে জোরদার হয়ে উঠেছে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম। কিন্তু তাতেও সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। অতন্দ্র প্রহরাই স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান শর্ত। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে, জাতীয় সংহতির মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়াল।

আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে একটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সক্রিয়। এদেশের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ গরীব। তারা গায়ের রক্ত পানি করে ফসল ফলায় এবং কলকারখানায় চাকা ঘুরিয়ে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন মূলত তাদেরই মেহনতের ফসল। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত। তাদের ক্ষুধার অন্ন, পরনের কাপড়, ব্যাধির চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নেই আশানুরূপ। স্বাধীন দেশে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে তাই প্রত্যাশিত, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অগ্রগতি। অর্থনৈতিক মুক্তি ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য আমাদের উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে।

সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনই আমাদের অভীস্ট লক্ষ্য। এর জন্য যত বেশি সম্ভব ফসল ফলাতে হবে, বাড়াতে হবে কল-কারখানায় উৎপাদন। আমাদের সম্পদ ও জনশক্তি

www.nagorikpathagar.org

যথা—যথভাবে সদ্ব্যবহার করা গেলে বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। জনগণের অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি অত্যাবশ্যক। প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীতে দেশোন্নয়ন বিশেষ করে গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের ব্রতী হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। জনগণই যে তাদের ভাগ্য নির্মাতা এই সচেতনতা তাদের মাধ্যেও জেগেছে আজ। তারা বুঝেছে মানুষের দুটি হাত তার বড় সম্বল, এই দুই হাত দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে। দেশবাসীর এই আত্মোপলব্ধি ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের সংঘবদ্ধ শ্রমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে সার্থক করে তুলতে হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপরই অনেকখানি নির্ভরশীল।

আজ ৭ নভেম্বর—আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এই দিনে জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য যেমন জাতিকে শপথ নিতে হবে, তেমনি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত কর্মদ্যোগের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার শপথই নিতে হবে আমাদের আজ ৭ নভেম্বর।

জাতি এবং রাষ্ট্র কথাটা এখন সমার্থবোধক। জাতির পূর্ণ এবং সংহত অস্তিত্ব ছাড়া একালে রাষ্ট্রের কথা চিন্তাও করা যায় না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি কেমন করে হলো সে নিয়ে নানান তত্ত্ব আছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পন্ডিতদের ধারণায় বেশ কিছু গরমিলও আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণ তথা জাতির মৌলিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রশ্নে কোনো মতভেদ নেই। এই একটি বিষয়ে ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক উভয় গোত্রের তত্ত্ববিদরই অভিন্ন মতের অনুসারী।

অভিন্ন এই চিন্তার সার কথা হলো ঃ একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমাজের সার্বভৌম ক্ষমতা আর অধিকারের প্রতীক রাষ্ট্র। সে সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতায় ও কল্যাণ আকাজ্ক্ষায় প্রতিফলিত। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, একটি সংহত রাষ্ট্রের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজ। সে জনসমাজের ভেতরে ঐক্য থাকতে হবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আশা-আকাজ্ক্ষার সমন্বয় থাকলেই ঐক্য গড়ে ওঠে একটি সমাজের সব মানুষের মধ্যে। যৌথ স্বার্থ এবং কল্যাণে তখুনি তারা সংঘবদ্ধ হয়। হয় সমমনোভাবাপন্ন। এই যে ঐক্য এবং সমতার চেতনা তার মধ্যেই দেখতে পাই ঐক্যবদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

জনসমাজের স্বরূপ। একটি ভৌগোলিক বলয়ের ঐক্যবদ্ধ জনসমাজই হলো আধুনিক অর্থে জাতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাতি হিসাবে একটি জনসমাজের আত্ম প্রতিষ্ঠাই হলো একটি রাষ্ট্র গঠনের পুর্বশর্ত। জাতি তার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেই গঠিত হয় রাষ্ট্র। জাতির এই যে এককেন্দ্রমুখী চেতনা এর নামই জাতীয়তাবোধ। রাষ্ট্রের কথা ভাবতে গেলে তাই জাতি এবং জাতীয়তারোধকে খাটো করে দেখা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আমাদের সামনে যখন রাষ্ট্রের মানচিত্র স্পষ্ট রেখায় প্রতিফলিত থাকে তখন প্রথমে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই বিশাল এক জনসমাজকে। এরাই তো রাষ্ট্রের নিয়ামক। এদের মিলিত রক্তধারাই তো রাষ্ট্রের সমস্ত স্বাস্থ্য এবং শক্তির উৎস। এই মিলিত রক্তধারার মধ্যে আছে বহুকাল এবং বহু যুগের রক্তের সংমিশ্রণ। আছে ভৌগোলিক প্রতিবেশ ইতিহাস আর সংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। এই সবকিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে একাত্মতার একটি বোধ। এই বোধই হলো সমজাতীয়তার বোধ বা চেতনা। এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়, জাতীয়তাবোধ এবং রাষ্ট্রীয় ভাবনার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য এবং মূলত দুইয়েরই উৎস এক। অভিন্ন একটি চেতনা থেকে উৎসারিত এই দুই ভাবনা। সার্বভৌম রাষ্ট্র-হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি প্রতিফলিত হবে উজ্জ্বল রেখায়। এবং আমরা লক্ষ্য করবো সুপ্রাচীনকাল থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, জনগণের পেশীতে ক্রমাগত নতুন রক্তের সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক বিবর্তন আর প্রাকৃতিক প্রভাব কি আশ্চর্য অবলীলায় আমাদের এই ভূখণ্ডের জনগণকে দিয়ে এসেছে স্বতন্ত্র একটি জাতিসত্তার স্বরূপ। 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি' তথা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বলে যে কথাটি আছে আমরা বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে তার সাক্ষাৎ পাই খ্রীস্টপূর্ব যুগগুলোতে। এমনকি উপমহাদেশে বৈদিক আর্যদের আগমনের আগেও সংহত সমাজ গড়ে উঠতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, করতোয়া, মেঘনা এবং সুরমা উপত্যকায়। নদী তীরবর্তী এই জনপদগুলোতে বাস করতো বাংলাদেশের আদি কৃষিজীবী মানুষ। খাদ্য ছাড়াও তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সবরকম পণ্য উৎপাদন করতো। যৌথ উৎপাদন পদ্ধতি চালু ছিল সমাজে। এক জনপদের সঙ্গে আরেক জনপদের অর্থনৈতিক লেনদেন চলতো পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। "মন্ডল' এবং 'প্রধান' শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিলেন সমাজ-নেতা। জনসাধারণের সম্মতিতে এরা নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতেন। এই পদ্ধতি আধুনিককালের গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থার অনেকটা কাছাকাছি।

প্রাচীন জনপদগুলোর নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ছিল। মাটির উঁচু বাধ বা জঙ্গল দিয়ে এগুলোকে সুরক্ষিত করা হতো। এসব জঙ্গলের কিছু কিছু ক্ষয়িত নিদর্শন আজও দেশের নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। আকবরের সভাসদ ঐতিহাসিক আবুল ফজলের বক্তব্য এ

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশে মাটির উঁচু বাঁধ তথা 'আইল' নির্মাণ প্রথার কথা বলেছেন। তার মতে, 'বংগ' শব্দের শেষে আল কথাটা যুক্ত হয়ে 'বংগাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এ মত ঐতিহাসিক বস্তুনির্ভর নাও হতে পারে। কিন্তু ভূমি ও জনপদের রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে বাংলাদেশের মানুষ যে মাটির উঁচু বাঁধ বা প্রাচীর নির্মাণ করে এসেছে সুদূর অতীতকাল থেকে তার প্রমাণ মেলে এই তথ্যে। জঙ্গল ছাড়াও ছিল স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জনপদের চারপাশের নদী-বিল-হাওর এবং কোথাও গভীর খাল বহিরাক্রমণ প্রতিরোধে প্রাকৃতিক প্রাচীর হিসাবে কাজ করতো। বাংলাদেশের আদি জনপদগুলোর অবস্থানের দিকে চোখ রাখলে কথাটার সত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রাকৃতিক নিরাপত্তার সুবিধাকে মূখ্য বিবেচনার মধ্যে রেখেই আদি জনসমাজ তাদের বসত গড়ে তুলেছিল জলাশয়বেষ্টিত স্থানগুলোতে। ঐতিহাসিক সুবর্ণ গ্রাম জনপদের চারদিকে আজো আমরা ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা এবং মেঘনার বৃত্তাকার বেষ্টনীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। বাঁশের বল্লম, তীর, ধনুক, আর পাথরের কুঠার ছিল জনপদবাসীদের অস্ত্র। চাষের কাজে তারা ব্যবহার করতো পাথরের তৈরি লাঙ্গল। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড কুমিল্লার লালমাই প'হাড় এলাকা এবং আরো কয়েকটি স্থানের ভূগর্ভে পাওয়া পাথরের হাতিয়ার প্রমাণ করে প্রস্তর যুগেই বাংলাদেশে ছিল ভূমিকেন্দ্রিক জনপদ।

এসব জনপদের গঠন অবস্থান প্রতিরক্ষা এবং যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। হুবহু মিল না থাকলেও বেশ কিছু মিল আছে উভয়ের ভেতর। এথেন্স, স্পার্টা, থিবস প্রভৃতি নগর-জনপদ ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। নাগরিক সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতো। নগর শাসন পরিচালনা করতেন নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। বাংলাদেশের আদি জনপদগুলো ছিল সম্পূর্ণ কৃষি উৎপাদন নির্ভর। কিন্তু তা হলেও তাদের মধ্যে ছিল সংহত সামাজিক ঐক্য। সমাজ-প্রশাসনে ছিল লোকায়ত পঞ্চায়েত ধরনের জনপ্রতিনিধি; পরিষদের ওপর ন্যস্ত ছিল শাসনভার। বহিরাক্রমণের সময় তারা একযোগে মোকাবিলা করতো হানাদারদের। নিজেদের জনপদে তারা অনেকটা স্বনির্ভর থাকলেও প্রতিবেশী সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ছিল না। বলতে গেলে এদেশের সমতল ভূমিতে জনবসতি গড়ে ওঠার সূচনাতেই বিভিন্ন জনপদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থানের ফলে ক্রমে প্রতিবেশী সমাজের জনগণ নিজেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও গড়ে তুলতে থাকে। মনে রাখা দরকার, গোড়াতে বিভিন্ন উপজাতীয় গোত্র কিংবা বর্ণগত রক্তধারার জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত হয়েছিল একেকটি জনপদ বা সমাজ। পৃথিবীর যে কোনো দেশে সমাজ পত্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হবে। বাংলাদেশের সমাজ গঠনের আদিপর্বেও সক্রিয় ছিল এই নৃতাত্ত্বিক প্রবণতা।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সমাজ গঠনের এই মানসিকতায় সূচিত হতে থাকে বৈপ্লবিক এক রূপান্তর। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আয়তনও প্রসারিত হতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের আবেষ্টন থেকে বিশাল বাহু মেলে দিয়ে জনসমাজ বৃহত্তর সমাজকে আলিঙ্গন করতে শুরু করে। বিভিন্ন রক্ত ধারার মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে রক্তগত আত্মীয়তার বন্ধন। ক্রমাগতভাব বিনিময়ের ফলে বিভিন্ন উপভাষা একটি সাধারণ ভাষার রূপ নিতে থাকে। ফলে সংহত হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বন্ধনের সুবিশাল সেতু। প্রাকৃত ভাষা তথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষা থেকে ভাব বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার অভ্যুদয় এ বন্ধনের মূল উপজিব্য।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণটিতেই আমরা বাংলাদেশের প্রাচীন সামাজিক কাঠামোর প্রসারিত অবয়বে সমজাতীয়তাবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করি। বহু আগেই গোত্র প্রভাবিত সমাজ তার নির্দিষ্ট গন্ডী অতিক্রম করে গঙ্গার পূর্ব তীরের আদি ভৌগোলিক সীমা রেখা থেকে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব উপকূল পর্যন্ত বৃহত্তর সমাজের অনিবার্য প্রভাবে আপ্লুত হয়। সব জাতীয়তার চেতনাও স্বাভাবিক কারণেই এই ভৌগোলিক বলয়কে বেষ্টন করেই আবর্তিত হতে থাকে। আমাদের জাতি বা জাতিসত্তার অবস্থান খুঁজতে হলে ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক পরিবেষ্টনের এই বাস্তব কেন্দ্র বিন্দুটিতে দৃষ্টি স্থির রাখতে হবে। তা না হলে আমাদের জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের স্বরূপটিকে কিছুতেই চিহ্নিত করা যাবে না।

বাংলাদেশের নদ-নদী পাহাড়-অরণ্য, উপকুল এবং বদ্বীপ অঞ্চলের গঠন শৈলীতেও স্পষ্ট আমাদের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। পৃথিবীর সব দেশেই জাতি এবং দেশ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে ভূপ্রকৃতি-এর চেয়ে বড় বাস্তব খুব কমই আছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কথাটা কতখানি সত্য। ভূতাত্ত্বিক মহাকালের একটি প্রেক্ষাপটে হিমালয়ের তুষার কন্দরে জন্ম গঙ্গার। প্রাচীন এই নদী নেপালের চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে স্পর্শ করেছে এই ভূখণ্ডের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত। সেখান থেকে বাক নিয়ে বাংলাদেশের গোটা উর্বর সমতল ঘেষে সর্পিল রেখায় গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে।

এই সমতলীয় প্রবাহ রেখাই তার পূর্ব তীরবর্তী আব্বাহিকার প্রাকৃতিক সীমান্ত। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা গঙ্গার বয়স দেড় কোটি বছরের কম হবে না। বলা যায় সেই আদি ভূতাত্ত্বিক মহাযুগেই প্রাকৃতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়েছিল আমাদের এ ভূখন্ডের রূপ রেখা। এবং প্রাচীন নদী গঙ্গা ক্রমাগত দেড় কোটি বছর ধরে একই সঙ্গে যার প্রাণপ্রবাহ অলে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সীমারেখার উপাদান পরিবেশ যুগিয়ে এসেছে।

আমরা জানি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমাগত নতুন রক্তধারার সংমিশ্রণ এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব মূল্যবান উপাদান যোগায় জাতি গঠনে। কিন্তু এসব কিছুর ওপর আছে সব থেকে শক্তিমান আর ক্রিয়াশীল আরেকটি উপাদান। এই উপাদানটি হলো ভূমিজ প্রভাব। সাধারণভাবে একে ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাব বলা

www.nagorikpathagar.org

যায়। মানুষ অন্য সব প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু কখনো মাটি এবং মাটি সংলগ্ন প্রকৃতির প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে পারে না। একথা সত্য মানুষ নিজ রক্তে বংশগত উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু এ প্রভাব মাটির প্রভাবের সান্নিধ্যে এসে ক্রমে ক্ষীয়মান হয়ে পড়তে থাকে। এবং এক সময় লীন হয়ে যায়। তার ভেতরে আগের মানুষটিকে কিংবা তার বংশজাত উত্তরাধিকারীদের তখন ঠিক আগের চেহারায় চেনা যায় না। স্থান, এবং পরিবেশের সুদীর্ঘকালের প্রভাব তাদের একেবারে বদলে দেয়। তাদের খাদ্য রুচিতে, মেজাজে স্বভাবে এবং মানসিকতায় আসে বড় রকমের পরিবর্তন। এমন কি আগের দৈহিক গঠনও যায় বদলে। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসাবে স্বতন্ত্র এক স্বরূপ নিয়ে এসে দাঁড়ায় তারা ইতিহাসের রূপান্তরিত দর্পণের সামনে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভিন্ন ভিন্ন রক্তধারার যেসব জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসে বসত গড়ে তুলেছিল তাদের কি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সেই আদি পুরাতন চেহারায়? কত মানবধারা এসেছে এই ভূখন্ডে। নৃতত্ত্বের ভাষায় কত নাম তাদের। অষ্ট্রলয়েড, দ্রবিড়ীয়, আলপাইন, দিনারিক, ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অস্ট্রোলিয়া চার মহাদেশেরই হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে তারা বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলে। আর বহু হাজার বছর ধরে তারা আছে এখানে। কিন্তু এখন কি চেনা যায় কে দ্রবিড়ীয়, কে আলপাইন, কে ককেশীয় অথবা কে অষ্ট্রিক বা প্রটো অস্ট্রোলয়েড? সবকটি মানব ধারায় আজ একটি সাধারণ নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে একীভূত হয়েছে। এমনকি অনেক পরে মধ্য যুগে যারা এসেছিল সেই তুর্কী, পাঠান, আরব, ইরানী, হাবসী, মুঘলরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেনি। মূল প্রবাহের সঙ্গে তারাও লীন হয়ে গিয়ে পেয়েছে সাধারণ এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নৃতাত্ত্বিক এই বিবর্তনের পেছনে ভৌগোলিক প্রভাবের ভূমিকা নিঃসন্দেহে মুখ্য।

একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস সেই ভূমিকার প্রতি আকৃষ্ট করে মানুষকে গভীরভাবে। আদি যুগের যাযাবর মানুষদের বেলায়ও এবং ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়নি। হয়তো দুর্ভিক্ষ কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-তাড়িত হয়ে তারা ছুটে এসেছে দূরের কোন নিরাপদ অঞ্চল থেকে নতুন জায়গায়। পরিবেশ এবং আলো হাওয়া ভালো লেগে যাওয়ায় আর ফিরে যায়নি তারা। এই স্থানই হয়েছে তাদের স্বদেশ। বংশপরম্পরায় তারা এখানে বাস করতে থাকে। মনের টান যেমন তাদের মাটিতে ধরে রাখে তেমনি মাটিও বুকে টেনে নেয় তাদের। মাটির প্রভাবে বদলে যায় তাদের স্বভাব। বদলে যায় মুখের আদল পর্যন্ত। মাটির রঙেই হয় তারা রঞ্জিত।

বাংলাদেশের প্রাচীন মানব ধারাগুলোর ক্ষেত্রে কথাটা অনেক বেশি সত্য। এখানে বসবাস করতে এসে এদেশের মাটির সঙ্গে তারা একাত্ম হয়েছে। যুগ যুগ ধরে একই মাটিতে ফসল ফলিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে পূর্ব তীরের বিস্তীর্ণ এই সমতল ভূমিগত এ প্রখর

www.nagorikpathagar.org

চেতনার উন্মেষ, ঘটেছে আজ থেকে কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর আগে। তখন বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যারা উন্নত কৃষি সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল বাংলাদেশে। যার নিদর্শন ভূমির অধিকার চেতনায়। গঙ্গার খানিকটা পরিচয় আমরা পাই উত্তরাঞ্চলের পুণ্ড্রবর্ধনে। কুমিল্লার লালমাইতে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উয়ারী বটেশ্বরে। পুণ্ড্ররা বাংলাদেশের প্রাচীনতম একটি মানব শাখা। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ পরিচয় আজো অনুচ্ছিত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তাদের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তারা দ্রাবিড় রক্তসঞ্জাত আদি বাঙালী জনশ্রেণী। কিন্তু তারা ছিল অসম সাহসী। উত্তর সীমান্তে তারা রুখেছে অনেক বহিরাগত হামলা। মোকাবিলা করেছে পান্ডবদের। আবার দেখা যায় প্রাচীন অযোদ্যারা রাষ্ট্রের সঙ্গে ছিল তাদের সুসম্পর্ক। পুণ্ড্ররা সাহসী এবং তাদের গায়ের রঙ কালো ছিল বলেই সম্ভবত তাদের অসুর আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতিপক্ষরা। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহীর বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল পুণ্ড্রজনবসত। শুধু কৃষিতে নয়, শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নত ছিল তারা। মহাস্থানগড়ে পাওয়া ধ্বংসাবশেষে আমাদের এই আদি জনশ্রেণীর সভ্যতার একটি পরিণত রূপের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

অনেক কোটি রেস বা মানব সমাজের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি জাতি। পুণ্ড্ররা ছিল সেই আদি যুগে এ দেশের প্রাচীন মাল্টি রেসিয়াল তথা বহু মানবধারা সমন্বিত সময়ের এটি শাখা বা রেস। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রখর ছিল সামাজিক এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার চেতনা। সমাজের আয়তন বিস্তৃত হওয়ার ফলে পরবর্তিকালে এই চেতনাই রূপ নেয় বৃহৎ এক জাতীয়তার চেতনায়। এ রক্তবোধ সত্যতার প্রমাণ আমরা পাই খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের ঠিক মধ্যপর্বে এসে দাঁড়ালে। এর আগের এক শতাব্দী ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। খ্রিষ্টীয় ৬৫০ থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত ছিল এই কালপরিধি। গুপ্ত সমাজের পতনের সুযোগে এই সময়ে ক্রমাগত বহিরাক্রমণের ঝাপ্টা আসছিল বাংলাদেশের ওপর। কৃষকদের ফসল লুটে নিচ্ছিল অত্যাচারী সামন্তরা। জোর যার মুল্লুক তার এমন এক অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল সর্বত্র। চরম এই সংকট মুহূর্তে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে দেখা গেলো জনগণকে। সব জনপদের প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত প্রধানগণ পুণ্ড্রবর্ধনে জমায়েত হয়ে একযোগে ভোট দিয়ে নির্বাচন করলেন দেশের একজন শাসক। ইনিই হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল।

দৈনিক বাংলা ঃ ৭ নভেম্বর, ১৯৭৮

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও উত্থান

বিচিত্রা ভ্যষ্যকার

উপমহাদেশে রাজ্য ভাঙাগড়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অসাধারণ রাজনৈতিক তাৎপর্যমন্ডিত একটি ঘটনা। প্রাচীন ভারতে, মধ্যযুগে এবং পাকাপোক্তভাবে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃপতি, রাজবংশ ও সামন্ত প্রভুদের অধীনে স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইসব রাজ্যে জাতিসত্তা সুসংজ্ঞায়িত ছিল না। 'ভারতের কেন্দ্রে এ রাষ্ট্রশক্তি যখনই দুর্বল হয়ে পড়েছে কিংবা ভেঙে পড়েছে তখন বাংলাদেশই কেন্দ্রীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সকলের আগে। এই বিদ্রোহ প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলায় সুনির্দিষ্ট জাতিসত্তা ভিত্তিক কোন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়নি বা বিদ্রোহী নৃপতি ও ভূপতিদের স্বাধীনতাও স্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাঝ দিয়ে এই প্রথম উপমহাদেশে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল যার পেছনে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক সংস্থান, ভাষা, জনগণের মানস-সংগঠন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভিন্নতা, সমন্বয় ও পরিপূরকতা চোখে পড়ে। উপমহাদেশে ভাষাগত জাতীয়তা ও সংস্কৃতির অভিন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের আগে আর কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেনি। যদিও উপমহাদেশে স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয়তার সুস্পষ্ট পরিচয়ে চিহ্নিত আরও বহু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ইউরোপে যেভাবে জাতিসত্তাগত প্রশ্নের মীমাংসা ঘটেছে এই উপমহাদেশ এখন পর্যন্ত সে অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়নি। এবং সে পটভূমিতেই ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এ অভ্যুদয়কে তাই ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই। উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রভাব ও অভিঘাত অনুভূত হতে বাধ্য। সে বিশ্লেষণ অবশ্য এখানে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

শুরুতেই উল্লেখ করেছি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি ও জনগণের মানস সংগঠনের সম্মিলিত সমন্বিত অবদান। কোন নৃপতি কিংবা ভূম্যাধিকারীর আকস্মিক উত্থানের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়নি—এদেশের আপামর মানুষের সুদীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের লড়াই সম্ভব করে তুলেছে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। জাতীয় স্বরূপ অন্বেষার এক

www.nagorikpathagar.org

একটি পর্যায় বাংলাদেশের মানুষ অতিক্রম করে এসেছে সচেতনভাবে। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সে নিত্য আবিষ্কার করেছে তাকে। মুঘল আমল, বৃটিশ আমল বা পাকিস্তান আমলে আরোপিত জাতীয়তার পরিচয় পর্যায়ক্রমে বর্জন করে এদেশের মানুষ এখন আপন সত্তার পরিচয় সুপরিস্ফুট করে তুলেছে বিশ্বের সামনে।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম, বিকাশ, উত্থান ও পরিণতির কথা বুঝতে হলে নরতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও নৈসর্গিক সংগঠনের বিশ্লেষণ যেমন দরকার তেমনি দরকার এদেশে সমাজ বিন্যাসের ইতিহাস। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম এদেশে কোন সময় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে সে ইতিহাসও আমাদের স্বরূপ অন্বেষায় অপরিহার্য। কেননা মানুষের চিত্ত সংগঠনে ও জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণে ধর্ম এবং ধর্মের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের ধারা উপলব্ধি করার জন্যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের হিসাব-নিকাশও একান্ত জরুরী। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ ও ধ্যানধারণার আদান প্রদানেও মানুষের মনোভঙ্গি নিয়ন্ত্রণে রাখে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীন অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক কার্যকারণ বোঝার জন্যে এসব উপাদান দৃষ্টির সামনে রাখা দরকার। কিন্তু সে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। বৃটিশ শাসনামলের সূচনা থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলে মুল প্রযুক্তি খর্ব না করেই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে পৌছাতে পারব বলে মনে করি। সে প্রতিপাদ্য হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী, তার জাতীয়তাবাদী চেতনা দেশজ বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত।

একটি জনগোষ্ঠী কখন জাতীয় পরিচয়ে মন্ডিত হয়ে ওঠে, নিজস্ব জাতিসত্তার অধিকারী হয় অর্থাৎ জাতীয়তার মূলগত সংজ্ঞা কি সে বিশ্লেষণ আমাদেরও আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক ও জরুরী। নেশন জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ ও পরিচয় হচ্ছে তার ভাষা। যেমন ইংরেজ জাতির ভাষা ইংরেজী, চীন জাতির ভাষা চৈনিক, জাপানীদের ভাষা জাপানী। কিন্তু ভাষার অভিন্নতাই আরব জাতীয়তার অভিন্নতার পরিচয় নয়। আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ানদের ভাষাও ইংরেজী কিন্তু জাতিসত্তার পরিচয় তাদের আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান। আরব বিশ্বের অভিন্ন ভাষা আরবী কিন্তু আরব জনগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, জাতীয় পরিচয়ের অধিকারী। জাতিগঠনে নিরবচ্ছিন্ন ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের বিরাট ভূমিকা রয়েছে কিন্তু ভূগোলের ঐক্যই আবার এককভাবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয় না। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্কচওয়েলস আর ইংরেজদের বাস। উত্তর আমেরিকায় বাস ক্যানাডীয় মেক্সিকান আর আমেরিকানদের। জাতীয়তা নির্ধারণে ধর্মের ভূমিকাও প্রবল। কিন্তু পৃথিবীতে অভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অভিন্ন জাতীয় পরিচয়ের অধিকারী নয়। খ্রীস্টানদের মধ্যে কেউ ইংরেজ, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ আফ্রিকান। বৌদ্ধদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কেউ বর্মী, কেউ সিংহলী, কেউবা জাপানী। মুসলমানদের মধ্যে কেউ মিসরীয়, কেউবা ইন্দোনেশীয়। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেই ধর্ম আবার ঐক্য চেতনাও সৃষ্টি করে, মানুষের চিত্তসংগঠনে পালন করে বিরাট ভুমিকা। জাতিসত্তা নিরূপণে মানুষের এই মানস সংগঠনেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে; অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভিন্নতাও জাতি গঠনের একটি উপাদান কিন্তু পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত সবাই এক জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন নয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতাধীন মানুষ।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা চলে একটি জনগোষ্ঠী যখন তাদের ভাষা, মানস গঠন, ভূগোল ও অর্থনৈতিক পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সংগঠিত হয় তখনই গড়ে ওঠে তার জাতীয় পরিচয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এদেশ জনগোষ্ঠীর ভাষা ও মানস গঠন, অর্থনৈতিক অবস্থা ও আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, গড়ে উঠেছে নতুন রাষ্ট্র তার বিশিষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতে।

অস্বীকার করার উপায় নেই উপমহাদেশ ও বাংলার রাজনীতি অতীতের ধর্মীয় খাত ধরেই প্রবাহিত হয়েছে। বৃটিশ আমলে হিন্দু ও ইসলাম এ দুটি প্রধান ধর্মের ভিত্তিতেই উপমহাদেশীয় রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে। অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্যে ধর্মের সাধারণ ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আন্দোলন করেছে—সে প্রমাণ আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। বৃটিশ আমলের আগেও ধর্ম-ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংঘাত ছিল। উপমহাদেশে ও অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সংঘাত, হিন্দু ও ইসলামের মধ্যের সংঘাত ইতিহাসের ছাত্রের কাছে অজানা কোন ঘটনা নয়। কথাগুলি এই কারণে বলা যে ধর্ম যেমন অন্য দেশের তেমন উপমহাদেশের রাজনীতিতেও বড় ভূমিকা পালন করেছে; এবং মানুষের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যকে স্রেফ সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিহিত করলে। পরিস্থিতির নির্ভুল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস যদি এদেশের বুদ্ধিজীবীরা দেখাতে পারেন তাহলেই হয়ত বহু জটিলতার মীমাংসা ঘটবে। হিন্দুরা বেশি সাম্প্রদায়িক না মুসলমানরা বেশি এই অর্থহীন তর্কের ভেতর না গিয়ে বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা প্রয়োজন উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে দীর্ঘকাল কেন ধর্মীয় চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতে বৃটিশ শাসকদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লগ্নে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল? শ্রী সুপ্রকাশ রায়ের লেখা 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে' তার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "বৃটিশ শক্তি প্রধানত মুসলমান শাসকদের নিকট হইতেই এদেশের শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। তাই বৃটিশ শক্তি প্রথমে মুসলমানদের শত্রু বলিয়াই গণ্য করিয়াছিল। অন্যদিকে মুসলমানগণও এই কারণে বৃটিশ শাসনের আরম্ভ হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই

www.nagorikpathagar.org

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতার বিরোধিতা করিয়াছিল। সেই হেতু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয় তখন প্রধানত হিন্দুরাই বৃটিশ শাসকদের সহিত সহযোগিতা করে প্রায় সকল জমিদারীই হস্তগত করে। ইহার ফলে বঙ্গদেশ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রায় সকল জমিদারই হিন্দু আর তাহাদের অধীনস্ত চাষীদের অধিকাংশই মুসলমান। সেই সময় হইতে বরাবর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী জমিদার মহাজন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশিলগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারের সকল কৃষক বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়াছে এবং উহাকে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করার প্রয়াস পাইয়াছে।"

বলাবাহুল্য সুচতুর বৃটিশ শাসকরা কেবল প্রয়াস পায় নাই, 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসির ভিত্তিতে তারা তাদের শাসনকালের শেষ সময় পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইন্ধন যুগিয়েছে। ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার চাপে উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় প্রায় ভবিতব্যের মতই সেই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। প্রথমত ইংরেজ আগমনের আগে মুসলমানরা ছিল এদেশের শাসক। ফলে তাদের সম্পর্কে হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব থাকাই স্বাভাবিক। ইংরেজরা শাসনক্ষমতা হাতে নিলে মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুতিতে আনন্দিত হিন্দু সম্প্রদায় নতুন শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে— প্রায় শতাব্দীকাল ধরে তারা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা। এর ফলে বাংলার হিন্দুসমাজ শিক্ষায় বিত্তে গেছে সামনে এগিয়ে — উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তাতে একারণেই ছিল হিন্দুদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে যে বাঙালী জাতীয়তাবোধ জন্ম নেয় তা ছিল হিন্দু ঐতিহ্যনির্ভর — বাঙালীত্ব ও হিন্দুত্ব তখন সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে "বিদ্যাসাগরও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে শ্রী বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "মধ্যবিত্তের বিপুল কলেবর বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে সবার আগে এই শ্রেণীর মধ্যেই জাতীয়তাবোধ জেগেছিল। আত্মমর্যাদা ও শ্রেণী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের অনেক পশ্চাতে ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি ছিল। সুতরাং উনিশ শতকের শেষপাদে যে বিশালাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল তা ছিল হিন্দুপ্রধান ; মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই দেখা যায়, মধ্যবিত্তের যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হল এই সময় বাংলাদেশে, তার মধ্যে হিন্দুত্বের সুর ও রং মিশে গেল। অর্থাৎ বাংলার নবজাতীয়তাবোধ প্রধানত হিন্দু-ঐতিহ্যনির্ভর হয়ে বিকাশ লাভ করল।"

উনিশ শতকের শেষপাদে বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষ তার গ্রন্থে আরও লিখেছেন, "বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমেই সাবালক হয়ে উঠছিল এবং দেশাত্মবোধের বিকাশের সঙ্গে তার সাবালকত্বের প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছিল জাতীয় ঐতিহ্য প্রীতির মধ্যে। মধ্যবিত্তে হিন্দুর এ প্রাধান্যের জন্যে এই ঐতিহ্য প্রীতিও হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল।" (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা— ৩১৪)

বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই সাম্প্রদায়িক মোড় প্রত্যাশিতভাবেই বাঙালী মুসলমানকে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন বাংলার মুসলমানরা উপরে উল্লিখিত ঐতিহাসিক কারণেই সর্বক্ষেত্রে ছিল পশ্চাদপদ— কৃষি সেক্টরে তারা প্রধানত প্রজা, শিক্ষাদীক্ষায় তারা পেছনে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য উপেক্ষিত। এই পরিস্থিতি বাঙলায় তথা ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধর্মভিত্তিক দ্বিধাবিভক্তি অনিবার্য করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কোন একটি জনসমষ্টি যখন পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে তখন তারা সেই অনগ্রসরতার জন্য নিকট কর্তৃপক্ষ, নিকট নিয়োগকারী বা নিকট শাসককেও দায়ী বলে চিহ্নিত করে— দূরে বা মূল শাসক অনেক সময়ই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আবার অন্যদিকে একটি জনগোষ্ঠী যখন অপর একটি জনগোষ্ঠী বা শাসকশ্রেণী কর্তৃক উপেক্ষিত, শোষিত হয় তখন শোষিত জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরে একটি সাধারণ ভিত্তি খুঁজে নেয়— সেই সাধারণ ভিত্তি কখনও ধর্মীয় সত্তা, কখনও ভাষাগত অভিন্নতা, কখনও বা আঞ্চলিক পরিচয়।

এইসব. কারণে বাঙালী জাতীয়তাবোধ বৃটিশ বাংলায় দুটি স্বতন্ত্র এমনকি পরস্পরবিরোধী খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের উপেক্ষা এবং হিন্দু ধর্মের ছুৎমার্গ বাংলার নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকে আরও বেশি বিমুখ করে তুলে। উনিশ শতকের শেষ দশকে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে নবজাগরণ ঘটে তার ফলেই স্বল্পকায় হলেও বাঙলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের গোড়াপত্তন ঘটে। এই গোড়াপত্তনের সময় থেকেই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ স্বতন্ত্র ধারায় তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে ব্রতী হয়। স্যার সৈয়দ আহমদের অনুপ্রেরণায় ভারতের মুসলমানরা বৃটিশ বিরোধিতা ও অসহযোগিতার পথ পরিত্যাগ করে ইংরেজী শিক্ষায় তাদের চিত্ত আলোকিত করে তুলতে শুরু করে এবং অতীতের সংস্কারের ও আচারের মধ্যে আবদ্ধ মুসলমানরা আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। এই পরিবর্তনের ফলে বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্প্রসারিত হতে থাকে ; দানা বেঁধে উঠতে থাকে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা।

১৮৮৫ সালে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঘটে। যদিও এ সময়ে ভারতেরই শিক্ষিত মধ্য শ্রেণী নিজস্ব জাতীয় সংগঠন গঠনের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির পুঞ্জীভূত ক্রোধ থেকে ইংরেজ শাসককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী উৎসাহ যুগিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রবলতর হয়ে ওঠে। সেই পটভূমিতে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসিতে বিশ্বাসী

www.nagorikpathagar.org

বৃটিশ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি ও আনুকূল্য দেখাতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়! কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজ আসাম ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত নতুন মুসলমান প্রধান প্রদেশে হিন্দু ভূ-স্বামী ও হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিযোগিতার বাধা এড়াতে সক্ষম হবে বলে মনে করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা উপলক্ষ করে তৎকালীন বাংলায় যে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে তা আরও বেশি করে হিন্দু প্রভাবিত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় বৃটিশ শাসকদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ— হিন্দু ও মুসলমান এ দুই ধর্মীয় খাতে ভারতীয় রাজনীতির প্রবাহ সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

আলোচনা কিছুটা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন। আমরা এখন সরাসরি ১৯৪৭ সালের পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করব। ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমান সম্মতিতে ও দায়িত্বে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান এলাকাগুলি নিয়ে বৃটিশ শাসকরা প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেল দুটি রাষ্ট্র— যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান। বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছিল এ আশায় যে স্বতন্ত্র বাসভূমিতে তাদের পক্ষে আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ সম্ভব হবে। ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালী মুসলমানেরা জাতীয়তাবোধে সেদিন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উপর বেশী নির্ভরশীল ছিল। কেননা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মধ্যেই তারা আশা করেছিল জাতীয় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালী মুসলমান দেখতে পেল নতুন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেও তাদের জাতীয় বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রথমেই এলো বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষার উপর আঘাত— উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের মুখোমুখি হতে লাগল বাঙালী মুসলমান। এ সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ষীয়ান নেতা আতাউর রহমান খান বলেছেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের ঠকাত সেভাবে এক প্রান্তের (করাচী) লোক অপর প্রান্তের (ঢাকা) লোককে ঠকাতে শুরু করে। ক্ষমতার সবটুকু কেন্দ্রীভূত করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ীকেও লাইসেন্স পেতে হলে ঢাকা থেকে করাচী যেতে হত।"

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের এ উক্তির মধ্যে বাংলাদেশে নতুন করে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান এবং নিজস্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বভারতীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের অন্তর্গত করে নিল—হিন্দীকে মেনে নিল রাষ্ট্রভাষা রূপে,

www.nagorikpathagar.org

স্বীকার করে নিল কেন্দ্রের শাসন। কিন্তু গঠনশীল বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ নতুন সমাধান অন্বেষণে ব্রতী হল—এবং তা পাকিস্তান কাঠামোর বাইরে জাতীয়সত্তা নির্ধারণী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান— ভাষাগত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে বাঙালী মুসলমান সমাজ স্বায়ত্তশাসনের দাবী থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তীর্ণ হল। পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়, এ সত্য ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০-এর সময়ের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ষাটের দশকে এদেশে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সুগম করে তুলেছিল সন্দেহ নেই।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় ঘটল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে, নবগঠিত ও গঠনশীল বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তাবোধ আবার নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। একদিকে ভারতীয় পুজিপতি শ্রেণীর প্রসারিত হাত, দিল্লী সরকারের মোড়লীপনা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা অভিন্ন, এই দাবীতে ভারতীয় সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংরক্ষণের সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে তুলল তার নিজস্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে। বিপুল সম্পদ পাচার এবং বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক পশ্চাদভূমি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় পুজিপতিদের পাঁয়তারা বাংলাদেশের জনগণকে জাতীয়তাবাদী চেতনা তীক্ষ্ণতর করে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯৭৫ সালে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। আমাদের ভাষা-ভূগোল-মানস-গঠন এবং অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এক সম্মিলিত পরিচয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বোঝার জন্যে এদেশের নৈসর্গিক গঠনের দিকেও দৃষ্টি ফেরানো দরকার। বৃটিশ শাসনামলের বাংলার পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের নৈসর্গিক ভিন্নতার বিবরণ দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর 'তাঁর **বাংলার** কাব্য' গ্রন্থে—"বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ব বাংলার নিসর্গ হৃদয়**কে ভাবুক করেছে** বটে কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে **প্রান্তরে** রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চললীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোত ধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে ওঠে সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী আর সেই জীবন ও মরণের মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবকাশ কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব সেখানে হৃদয়কে স্পর্শ

www.nagorikpathagar.org

করে কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেই অবকাশ কই।" এই পূর্ববাংলা বা আজকের বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রখর হবে, বিপ্লবী হবে, স্বতন্ত্র হবে তাতেও বিস্ময়ের অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিশিষ্ট গঠন সম্পর্কে হুমায়ূন কবীর আরও লিখেছেন, "হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে কৌলীন্য ও জাতি বিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্বদেশে বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচেছিল। মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় রূপ বদলে দিল। বাংলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কোনদিন সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি, রাজ্যশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের মধ্যে বৌদ্ধ মানসের ক্রিয়া তাই সুস্পষ্ট।" অর্থাৎ এদেশের জনগণের সাম্য চেতনা ইতিহাসের সকল পর্যায়ে পালন করেছে বিশিষ্ট ভূমিকা।

ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে বাংলাদেশে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে রয়েছে এদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ও সত্তার প্রতিফলন। আপন স্বরূপ অন্বেষায় এদেশের মানুষ কখনও গুরুত্ব আরোপ করেছে ধর্মীয় চেতনার উপর, কখনও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের উপর, কখনও অর্থনৈতিক প্রশ্ন এসেছে সামনে, আবার কখনও ভূগোল আর নিসর্গ টেনেছে মানুষের মন। এবং ইতিহাসেরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের জনগণ জাতিসত্তার উপাদানগুলি সমন্বিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এই উপমহাদেশে একটি স্বাধীন জাতিরূপে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অখন্ড উপমহাদেশীয় বা সর্বভারতীয় চেতনা নয়, একটি জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনাই এদেশের জাতীয়তাবাদের প্রধান ও একমাত্র ভিত্তি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও অস্তিত্ব সম্ভব করে তুলেছে যে জাতীয়তাবোধ তার সঙ্গে "অখণ্ড উপমহাদেশীয়" জাতীয়তাবোধ বা 'সর্বভারতীয়' চেতনার যে ঐক্য থাকতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।"

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধু নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়, এই জাতিচেতনার ভিত্তিতে আপামর মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশে একদিকে যেমন আধুনিক, শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার সাধনা করছে অন্যদিকে তেমনি রাজধানী ঢাকা নগরীকে কেন্দ্র করে চলছে বাংলাদেশী জনগণের নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের আয়োজন। বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব আমাদের এ সাধনায় সাফল্যের পূর্বশর্ত। এবং আমাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তার নিঃসংশয় প্রতিফলন আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বের মূলে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

এনায়েতুল্লাহ খান

আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী এই প্রশ্নটি নিয়ে একটি তথাকথিত উদারনৈতিক মহল সম্প্রতি কৃত্রিম বিতর্কের অবতারণা করেছেন। শব্দ নিয়ে এহেন সংশয়বাদ আক্ষরিক ব্যবধানের সীমানা ডিঙিয়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও সংক্রমিত হয়েছে। সংশয়বাদী বিদ্বজ্জনেরা বলেছেন ঃ 'বাংলাদেশী শব্দের সাংবিধানিক সংযোজন ও প্রযুক্তি আমাদের জাতীয়তার আবহমানতা ও শাশ্বত রূপকে ক্ষুণ্ন করেছে ; সমন্বিত সংস্কৃতির বিপুল সম্ভার থেকে আহরণ এবং সেই সংস্কৃতির অনুশীলনের জাতীয় অধিকার খর্ব করেছে, এবং সর্বোপরি আমাদের পরিশীলিত জাতীয় চেতনার প্রবাহকে ব্যাহত করে প্রতিক্রিয়ার খাতে পরিচালিত করেছে।'

আপাতনির্দোষ এই প্রচারাভিযান বর্তমানে কিছুটা স্তিমিত হলেও অতি সম্প্রতি অত্যন্ত জোরদার হয়ে উঠেছিল। পরজীবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির আদলে সৃষ্ট কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও প্রচারযন্ত্রকে কেন্দ্র করে এই অভিযান শুরু হয়েছিল। আর সে জন্যেই এর পেছনে এক সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল। আর তা হচ্ছে ব্যক্তি ও সামাজিক চৈতন্যের উপরিকাঠামোতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উত্তরণের অভিযাত্রাকে প্রতিপদে বিঘ্নিত করা এবং তার সুযোগে বর্তমান পর্যায়ের অসংঠিত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার চোরাপথে পুনরুত্থানবাদী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তন।

এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করতে হলে সবচাইতে আশু প্রয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যের সুস্পষ্ট নির্ধারণ। অর্থাৎ শেষ পঁচাত্তরের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের আলোকে আজকে নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি ও নতুন সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করতে হবে এবং তার সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে দেশ ও জনগণের স্বার্থে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে । এই নির্মাণকার্যের চেতনার মৌল উপকরণ হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। আর সে জন্যেই তার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন।

জাতিত্ব ও জাতীয়তা যেমন সমার্থক নয়, বাঙালী ও বাংলাদেশী এ দুটো শব্দও তেমনি গুণগতভাবে ভিন্ন। জাতিত্ব ও জাতীয়তার শর্তাবলী ও উপকরণ মূলত এক হলেও

www.nagorikpathagar.org

উভয়ের বিকাশে মৌলিক বিভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটি নৃতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। জাতিত্ব একটি মানবগোত্রের ঐতিহাসিক, জৈবিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের নির্ধারক। জাতীয়তাবাদ সেই মানবগোত্রের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক উন্মেষের আদর্শগত চেতনা। জাতিত্বের কিংবা জাতিত্বসমূহের সহাবস্থান সম্ভব। কিন্তু জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করতে পারে।

অতএব বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে আমাদের জাতিত্বের ভৌগোলিক অবস্থান, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক উন্মেষ এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমি জাতীয় চেতনার রূপরেখা নির্ধারণ করবে। এই জাতীয় চেতনার উদ্বোধন পর্যায়ক্রমিকভাবে উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হয়েছে। উনিশ'শ সাতচল্লিশ, একাত্তর ও পঁচাত্তর সেই পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস ও সংগ্রামের প্রক্রিয়ার ফল। এখানে আবহমানতা অনুপস্থিত। কেননা আমাদের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এবং সেই অস্তিত্বের সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশী। এই পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল নিয়ে আমরা একটি জাতি রাষ্ট্র। তাকে রক্ষা করা, প্রাণ দিয়ে ভালবাসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয়তাবাদের নির্যাস। আমাদের স্বাজাত্যবোধ একান্তভাবেই আমাদের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন।

স্বাজাত্যবোধ যে কোন জনগণের মূল শক্তি। বৈদেশিক আধিপত্য ও তার দেশীয় সেবাদাসদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই চেতনার স্ফূরণ ঘটে। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম, উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রাম ও সমাজপ্রগতির সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাজাত্যবোধের চেতনা বিধৃত হয়। এরই ফলশ্রুতি আজকের জাগ্রত চেতনা— আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম ও কর্মোদ্যোগী বাংলাদেশী।

জাতীয়তাবাদ যেহেতু আদর্শিক, সেহেতু জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও রূপরেখা জাতীয়তাবাদের মতই ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম, পাকিস্তানী শাসকচক্রের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের নিয়ন্ত্রিত পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনার দ্বারা নির্ণীত হবে। সেখানে কূপমণ্ডুকতা যেমন পরিত্যাজ্য, তেমনি তথাকথিত উদারনৈতিক তার নামে সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির উপাসনাও গর্হিত। আজ কেউ সাংস্কৃতিক অবিভাজ্যতার কথা বলছেন ; আর কেউবা ধর্মের অনুশাসন দিয়ে সংস্কৃতিকে সংস্কার ও পশ্চাৎমুখীনতার প্রাকারে বন্দী করতে চাইছেন। দ্বন্দ্বে লিপ্ত উভয়পক্ষই দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাবাহী এবং বাংলাদেশের নতুন জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির বৈরীকুল।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান আক্ষরিক। আবার এ-কথাও সত্য যে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ভিন্নতা, প্রতিবেশের বৈপরীত্য, রাজনৈতিক চেতনার ভিন্নমুখী প্রকাশ এবং সামাজিক আচারাবিধির প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। অতএব বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব না থাকলেও বাঙালী সংস্কৃতির আবহমানতা ও ভৌগোলিক অবিভাজ্যতা প্রসূত রূপরেখার সঙ্গে বাংলাদেশী সংস্কৃতির গুণগত তফাৎ রয়েছে।

এককালে একদেশ, একজাতি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সংস্কৃতির বিপুল তারতম্য বিদ্যমান। এমনকি ইংল্যান্ডের এ্যাংলো স্যাক্সন সংস্কৃতির সঙ্গে একই বংশোদ্ভুত ও ভাষাভাষী মার্কিনী ও অস্ট্রেলীয়দের সংস্কৃতির তফাৎ রয়েছে।

অতএব সমন্বিত সংস্কৃতি কিংবা অবিভাজ্য ঐতিহ্যের ধুয়ো যারা তুলছেন তারা মূলত ভারতীয় রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থাপ্রসূত যৌগিক সংস্কৃতির একাংশ তথা পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অপচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। পশ্চিম বাংলার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের সর্বজনীনতা রয়েছে কিন্তু জাতীয় মুক্তি ও জাতিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার নিক্তিতে সেই ঐতিহ্য সব সময় গ্রাহ্য নাও হতে পারে। ঐতিহ্যের অনুশীলন এক কথা কিন্তু সমন্বিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে পররাষ্ট্রের আধিপত্যের পথ সুগম করা আরেক কথা।

আজ তাই এই ঐতিহাসিক সময়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সৈনাপত্যের আসনে বসাতে হবে। এবং এই জাতীয়তাবাদের মুল শক্তি জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ও তার জন্যে রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গ রচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেশীয় ও বৈদেশিক শক্তিকে আমাদের আত্মশক্তির দ্বারা পরাস্ত করব। সেই আত্মশক্তির মূল চেতনা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর কি কোনো অবদান রেখেছিল ?

মাহবুব আনাম

এবার ৭ নভেম্বর পালন নিয়ে নানা কথা উঠেছে। ১৯৭৫ সালের এ দিনে সিপাহী জনতার উত্থান ঘটেছিল। সে উত্থানের ফলে কোন একটি মহল পরাজিত হয়েছিল। পরাজিত মহলটি এর আগে ৩ নভেম্বর একটি উত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তারও আগে ১৫ আগস্ট ক্ষমতায় আসে যে-মহলটি সে-মহলটিই পরাজিত হয় ৩ নভেম্বর। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা মেনে নিতেই হয়। কেননা, এটাই সত্য। এখন প্রশ্ন আসে, ১৫ আগস্ট ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বর কোন দল বা উপতল এসব ঘটনার পুরোভাগে ছিল। দেশ স্বাধীন হয় একাত্তরের একটি রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে। সে যুদ্ধে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ যোগ দেয়। এর আগে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ দলের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল আঞ্চলিক অটোনমী, যেটা এককথায় ছয় দফার দাবী বলে পরিচিত।

পাকিস্তানের শাসনকর্তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শক্তি প্রয়োগে এ দাবী নস্যাৎ করতে প্রয়াস পায়। দেশবাসীর ধৈর্যের সীমা ভেঙে যায় এবং প্রথমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও পরে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধিকারের বদলে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৭১-এর বিজয়ী দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়। এ দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান একজন পরীক্ষিত গণতন্ত্রী। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হবার ফলে তার প্রতি জনগণের আস্থা ও সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ। তিনি দেশবাসীকে বলেন, তোমাদের আমি তিন বছর কিছু দিতে পারবো না, শুধু ভালবাসা ছাড়া। তখন দেশবাসী সেটা সানন্দে মেনে নেয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ও প্রশাসনিক অবকাঠামো পুনর্বিন্যাসে সময় তো লাগতেই পারে। দেখতে দেখতে তিন বছর পার হলো। এর মধ্যে কয়েকটি বিপরীত ঘটনায় দেশবাসী দারুণভাবে মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং বলা চলে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি চরম বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে রক্ষীবাহিনী নামক একটি দলের কর্মীদের নবগঠিত

www.nagorikpathagar.org

আধা-সরকারি পেটোয়াবাহিনীর হাতে তদানীন্তন অতিশয় ক্ষুদ্র বিরোধী দলের কর্মীদের নিগৃহিত, অত্যাচারিত হবার ঘটনায় দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়। এ অত্যাচারের মাত্রা শেষটায় খুন ও গুমের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

এর মধ্যে খাদ্য সংকট। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কোন কারণই ছিল না। কিন্তু খাদ্যের চোরাচালান এবং দলীয় কর্মীদের দ্বারা মওজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যাবার কারণে ১৯৭৪ সালে স্মরণকালের বৃহত্তম দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মারা যায়। এ সব কিছু সামাল দিতে গিয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণীত হয় এবং এতেও কূলকিনারা না করতে পেরে শাসনতন্ত্রের মূল ধারাকে পাল্টে দিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি গ্রহণ করে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমস্ত দল ভেঙ্গে একদলীয় বাকশাল কায়েম করার সাথে সাথে দেশের সবকটি সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করে মাত্র ৪টি সরকার নিয়ন্ত্রিত কাগজ রাখা হয়। দেশে তীব্র অথচ চাপা অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। এর সুযোগ নেয় আওয়ামী লীগের মধ্যেই ঘাপটি মেরে থাকা আরেকটি শক্তিশালী গ্রুপ। এদের নেতৃত্বে ছিলেন, শেখ সাহেবের বিশ্বস্ত খোন্দকার মোশতাক আহমেদ। আমি বিশ্বস্ত শব্দটি ব্যবহার করলাম এ জন্য যে, শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে যে ব্যক্তি সবচাইতে বেশী অবদান রেখেছিলেন সেই তাজউদ্দীন সাহেবকে মন্ত্রিসভা ছাড়তে বাধ্য করা হলেও খন্দকার সাহেব শেখ সাহেবের পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহাল-তবিয়তেই ছিলেন। খন্দকার সাহেব মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সরল পথে চলেননি বলে গুজব ছিল। খন্দকার সাহেব একটি সফল অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে দেশে দ্বিতীয় আওয়ামী মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যাতে চার/ পাঁচজন বাদে শেখ সাহেবের সমস্ত ক্যাবিনেট কলিগরাই যোগ দেন। যারা যোগ দেননি তারা পরবর্তিতে কারাভ্যান্তরে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। খন্দকার সাহেব খুব বেশীদিন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের অপর নায়ক খালেদ মোশাররফ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং প্রধান সামরিক শাসক হন। এটাকে বলা চলে তৃতীয় আওয়ামী সরকার। বিক্ষুব্ধ জনগণ ক্ষমতাসীনদের দলীয় কোন্দলে আগ্রহান্বিত ছিল না। তাদের পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সমাধানের বদলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। এভাবেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি বিপ্লবের জন্য সবদিক দিয়েই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। জনগণ তো প্রস্তুতই ছিল। সিপাহীদের আন্দোলনমুখী করে কর্নেল তাহের। সাধারণ সিপাহীরা এ আন্দোলনে যোগ দেন প্রধানত তিনটি কারণে ঃ

অফিসারদের প্রতি ওরা ছিল ক্ষুব্ধ।

দ্বিতীয়, তাদের নেতা জিয়াউর রহমানকে বন্দী করায় ওরা হয় ক্রুদ্ধ। গুজব ছিল যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে বা হবে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয়ত, নতুন সরকারের অধীনে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিপন্ন বলে ধারণাগুলোকে নিয়েই আন্দোলনের কর্মসূচীর উদ্যোগ নেন। এ আন্দোলনে খালেদ মোশাররফ পরাভূত হন এবং জিয়াউর রহমান কারামুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে ক্ষমতায় আসেন। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের ফলে ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান। পরবর্তীকালে আসেন এরশাদ। অর্থাৎ এ দুই নেতা বিপ্লবের সরাসরি বেনিফিসিয়ারী-আওয়ামী লীগ এগ্রিভ্‌ড্ পার্টি।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, আওয়ামী লীগ বাকশালে বিলুপ্ত হয় ও পরে জিয়ার আমলে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়। আওয়ামী লীগের মূল ধারার উত্তরাধিকারী শেষ হাসিনা ৭ নভেম্বরের উত্থানকে ভাল চোখে দেখেন না। যেহেতু এর ফলে সামরিক শাসক খালেদ মোশাররফের (আওয়ামী মনোভাবাপন্ন বলে জনশ্রুতি ছিল) স্বল্পকালীন সরকারের পতন হয়। খালেদ নিজে দ্বিতীয় আওয়ামী লীগ সরকারকেই উৎখাত করেছিল কিন্তু এতে আওয়ামী লীগ দল হিসাবে দুঃখিত হয়নি। যদিও সে সরকারে প্রথম সারির সকলেই যোগ দেয়। শেখ সাহেবের সপরিবারে নিহত হওয়ায় সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন শেখ হাসিনা। দলীয় ও জাতীয় ক্ষতির উপর ব্যক্তিগত ক্ষতি ছিল অনেক বেশী। কাজেই খন্দকার সাহেবের পতন আনয়নকারী তার দৃষ্টিতে পরম মিত্র। আওয়ামী লীগ (মৌলধারা) দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে। ক্ষমতায় এসেছে একটা তিক্ত বঞ্চিত স্মৃতির বোঝা নিয়ে। এ জন্য এখনও এরা প্রতিশোধ স্পৃহা এদের থাকবে না বা নাই। শেখ হাসিনা আমেরিকায় বলেছেন, ৭ নভেম্বর কিসের বিপ্লব ও সংহতি দিবস—দিনে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে, সৈনিককে হত্যা করা হয়েছিল। এসব বল্লেও তিনি এখনও এদিনের ছুটির ঘোষণা অটুট রেখেছেন। এ বিপ্লবের সরাসরি নেতৃত্বে ছিল কর্নেল তাহের ও জাসদ। কর্নেল তাহের পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন এ দিনকে মুক্তিযোদ্ধা হত্যার দিন মানতে রাজি নয়। এদের এবং অন্যান্য ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক সমর্থকেরও এই একই মত। এ বিপ্লবে অন্যেরা বেনিফিটেড হলো কি হলো না—এটা বড়ো কথা নয়, এ বিপ্লব মূলতই সিপাহী-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অনন্য উদাহরণ। ৭ নভেম্বর আগে জাসদ খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করতো। স্মর্তব্য যে, বাংলাদেশে বিরোধী আন্দোলনের হোতা ওরাই, শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে, সে সময় একটি অপজিশন আন্দোলন জন্ম দেয়া সাহসের পরিচায়ক। জাসদের আদি নেতৃত্ব আজ ছিন্নভিন্ন। জাসদ (রব) নেতা আসম আব্দুর রবের বঙ্গবন্ধুর হাতে বাংলাদেশের পতাকা ধরিয়ে দেবার জনশ্রুতি আছে। তিনি একজন বিরাট অর্গানাইজার। এরশাদের সময়ে ১৯৮০-এর নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলনেতার ভূমিকায় ছিলেন। এবার শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকারে নিজেই একজন মন্ত্রী হবার সুবাদে মুখ বন্ধ। সরকারী বক্তব্যের বাইরে কোন কথা বলার ক্ষমতা তার নাই। অপর নেতা শাজাহান সিরাজ (জাসদ সিরাজ) সদলবলে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। অতএব, বিএনপির নীতি

www.nagorikpathagar.org

তার নীতি। বাকি থাকছে জাসদ ইনুর হাসানুল হক। ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রীত্ব পাবার আশায় তিনি ও দলের অন্যরা মোটামুটি আওয়ামী লীগের লাইনের বাইরে কিছু বলতে দ্বিধাগ্রস্ত। জাতীয় পার্টি বর্তমানে নাজুক অবস্থায় আছে। দলের সেক্রেটারী জেনারেল বর্তমানে সরকারের মন্ত্রীত্ব পাবার ফলে ৭ নভেম্বর আলাদা কোন অবস্থান নিতে পারছেন না। দলীয় নেতা কারাগার থেকে বের হয়ে একটি প্রাসাদ্যোপম বাড়ীতে আরাম-আয়েশে বন্ধু-বান্ধবী পরিবৃত হয়ে ভালই আছেন এবং খালাস পাবার দ্বার প্রান্তে এসে বড় শরীক আওয়ামী লীগের বলয়ে আশ্রিতের জীবন যাপন করছেন। অতএব, এ দিনটি এরাও পালন করছে না। রাশেদ খান মেনন ও বাম দল আওয়ামী সরকারের কার্যকলাপ নজরে রাখছে এবং কোন ব্যাপারেই কোন জোরালো অবস্থান নিচ্ছে না। আসলে ৭ নভেম্বর কেন আমরা পালন করবো? উল্টো দিক থেকে এ সফল বিপ্লবের ফলে গুণগতভাবে আমরা কিভাবে এগিয়ে গেছি? জাতি হিসাবে এ বিপ্লব আমাদের কি উপকারে এসেছে? এ ব্যাপারে সেদিন এক আলোচনা সভায় একজন বক্তা খুবই সিগনিফিক্যান্ট বক্তব্য দিয়েছেন। ৭ নভেম্বরের আগে আমরা একটি প্রতিবেশী দেশের উপর পুরোপুরিভাবেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম, যা থেকে এ বিপ্লব আমাদের মুক্তি দেয়। একজন প্রথিতযশা কলামিস্ট বলেন, '৭৫-এর ৭ নভেম্বর ভারতীয় নাগপাশ থেকে মুক্ত হলে এ দেশ সত্যিকার স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে দেশটি অর্থাৎ ভারত অবশ্য এই প্রতিশোধ নেয় অন্যভাবে। সিপাহী-জনতার মিলিত অভ্যুত্থানে শাসকগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে রকম হয়েছিল ১৮৫৭ সনে। সে সময় এটা ছিল সিপাহী বিদ্রোহ এবং অসফল। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেরকে আইসোলেট করে এবং দারুণ প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু ৭ নভেম্বরের বিদ্রোহ ছিল সফল তাই এটাকে বিপ্লব বলা চলে। আর সংহতির কথা? শুধু বাংলাদেশের কেন, সমগ্র পৃথিবীতে সিপাহী-জনতার মিলিত আন্দোলনের নজির দুর্লভ। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন আদতে হয়েছিল কি-না সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা গেলেও এর ফলে যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করেছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এ দিনটি সকলের জন্যই অবশ্য পালনীয়। এর ইন্টারপ্রিটেশন মর্জিমাফিক দিলেও মূলত এটা দেশের মঙ্গল ডেকে এনেছিল। আর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা? কর্নেল তাহের, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফরা ও অন্যান্য যারা ৭ নভেম্বর ঘটনার আগে বা পরে জড়িত তারা প্রায় সকলেই সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা, কেউ বিজিত, পরাজিত আবার কেউ জয়ী।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বরের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

ড. কে এ এম শাহাদত হোসেন মণ্ডল

আজ ৭ নভেম্বর। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। দেশ ও জাতির জন্য দিবসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ১৯৭৫ সালের এই দিনে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ; গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই দেশে ঘটেছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব যা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। এদেশের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে সেদিনের সেই মহান বিপ্লবের নায়ক সিপাহী-জনতাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘটনা থেকে ৭ নভেম্বরের ঘটনা (বিপ্লব) সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ আগস্টের বিপ্লব ছিল একটি সফল সেনা অভ্যুত্থান, যার মাধ্যমে একদলীয় শাসন "বাকশাল' ও বাকশালের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী শাসনের অবসান হয়। অপরপক্ষে ৩ নভেম্বর ১৫ আগস্টের (৭৫) অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের নামে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। কিন্তু ৭ নভেম্বর '৭৫-এর বিপ্লব সংঘটিত হয় ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে। একথা সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারত বাংলাদেশের সৎপ্রতিবেশী দেশ হিসেবে পরিচয় দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ভারত তার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের মতলবেই সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছিল যা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এদেশের জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ভারত চেয়েছিল এদেশে তাদের বাধ্যগত একটি পুতুল সরকার, যারা ভারতের স্বার্থ সবসময় যে কোন মূল্যেই রক্ষা করবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণায় (তৎকালীন মেজর জিয়া) উজ্জীবিত হয়ে এদেশের জনসাধারণ দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে। ৩০ লাখ শহীদের পবিত্র রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায় স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে 'বাংলাদেশ'। দেশবাসীর আশা ছিল ভারতের আধিপত্যবাদের করাল গ্রাস

www.nagorikpathagar.org

থেকে মুক্ত হয়ে দেশটি দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের ছায়াতলে আপন মর্যাদায় বিকশিত হয়ে বিশ্বের দরবারে আত্মমর্যাদাশীল দেশ ও জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যেই দেশবাসীর সে আশা, সে প্রত্যাশা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের তাঁবেদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় শাসন বাকশাল সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের স্বার্থবিরোধী অনেক চুক্তি ভারতের সাথে সম্পাদিত করল। ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য মরণ ফাঁদ জেনেও শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ভারতকে ফারাক্কা ব্যারেজ চালূ করার অনুমতি প্রদান করে। ভারত সাময়িক অনুমতির সুযোগে ফারাক্কাকে চিরস্থায়ীভাবে কার্যকর করে বাংলাদেশের সাথে রাষ্ট্রীয় প্রতারণা করল। ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় দেশের একটি বৃহৎ অংশ মরুভূমিতে পরিণত হতে শুরু করল। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের সাথে চুক্তি করে তৎকালীন সরকার ভারতকে বেরুবাড়ী ছেড়ে দিল। কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডোর প্রদান করেনি। শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ১৪ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে " India will retain the southern half of South Berubari Union No 12 and the adjacent encleares, measuring an area of 2.64 square miles approximately and in exchange Bangladesh will retain the Dahagram and Angarpota enclaves. India will lease in perpetuity of Bangladesh an area of 178 metres X 85 metres near 'Tin' Bigha' to connect Dahagram with Panbari Mouja (P. S Patgram) of Bangladesh". কিন্তু ভারত এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বাংলাদেশের সাথে বেঈমানী করেছে তা দেশবাসীর বুজতে বাকী ছিল না।

এছাড়া ভারতের সাথে সম্পাদিত ২৫ বছরের গোলামীর চুক্তি তো ছিল বাংলাদেশের জনগণের মাথার ওপর খড়গ। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, তৎকালীন আওয়ামী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সম্পূর্ণ দিল্লীনির্ভর—অর্থাৎ নতজানু। সরকার প্রধানকে দেশের বাইরে যেতে হলে কিংবা বিদেশ ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরতে হলে ভারতে অবস্থান প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। একটা স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর এটা ছিল ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপ যা কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করা যায় না। এতকিছুর মূলেই ছিল তৎকালীন সরকারের ভারতপ্রীতি। তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য "দেশপ্রেম'-র চেয়ে ভারতপ্রেম পেয়েছিল অধিক প্রাধান্য যা দেশপ্রেমিক জনগণ মেনে নিতে পারেনি। ভারতনির্ভরতার পাশাপাশি দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সমান্তরাল 'রক্ষীবাহিনী' গঠন করা হয়, ভারতের নির্দেশে আওয়ামী লীগের তথা মুজিবের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা হয়। রক্ষীবাহিনীর বর্বরতা আজও এদেশের মানুষকে বিচলিত করে। এছাড়াও ছিল 'এক নেতা এক দেশ শেখ মুজিব বাংলাদেশ' কার্যকরী ও বাস্তবায়নের জন্য মুজিববাহিনী ও

www.nagorikpathagar.org

তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। রক্ষীবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল শেখ মুজিব ও তার সরকারকে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় রাখা, যাতে ভারতের আধিপত্যবাদ এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ; এ বিষয়টি কিন্তু প্রতিটি দেশপ্রেমিক জনগণ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের অনুধাবন করতে এতটুকুন কষ্ট বা দেরী হয়নি। তারা এটাকে কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেনি। অপরপক্ষে দেশের জনগণ বিশেষ করে বিরোধী দলও সংবাদপত্রের কণ্ঠকে দমন করার জন্য সংবিধান সংশোধনের নামে ১৯৭৩ সালের ১৫ নং আইন বলে ৪৭(৩) দফা সংযোজিত হল যার মাধ্যমে নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার হরণ করা হল। ১৯৭৪ সালে জারি করা হল বিশেষ ক্ষমতা আইন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বিরোধী দলহীন সংসদের মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় শাসন 'বাকশাল' গঠন করা হল। এর কয়েক মাস পরেই ১৬ জুন '৭৫ জারিকৃত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে মাত্র ৪টি সংবাদপত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে সব পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হল। শুরু হল দেশে আওয়ামী দুঃশাসন। এক সময়কার গণতন্ত্রের পূজারী হল গণতন্ত্রের হত্যাকারী ও স্বৈরশাসক। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটল। জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বলে কিছুই থাকল না। খাদ্যাভাব চরম আকার ধারণ করল। কয়েক লাখ লোক অনাহারে মারা গেল। যারা বেঁচে থাকল তারা জীবন্ত লাশ হয়ে অভিশপ্ত জীবনের বোঝা বহন করল। একমুঠো ভাতের জন্য মানুষের আহাজারি এবং এক টুকরো রুটির জন্য ডাস্টবিনে কুকুর ও মানুষের লড়াই এদেশের আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করলেও তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীকে এতটুকুন বিচলিত করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে সেদিন শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটা থেকে মাইনাসে এসে দাঁড়াল। মানুষ বাঁচতে চাইল এই অবস্থার করাল গ্রাস থেকে। মানুষ বুঝতে পারল গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য বাকশালের অবসান এবং ভারতের নাগপাশ থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ভারতের তাঁবেদার আওয়ামী সরকারের পতনের কোন বিকল্প নেই। এমনি অবস্থায় ঘটে গেল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন এক সফল সামরিক অভ্যুত্থানে। ক্ষমতায় এলেন শেখ মুজিবের এক সময়কার ঘনিষ্ঠ ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা খন্দকার মোশতাক আমহদ। গঠিত হল মন্ত্রিপরিষদ শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য নিয়ে স্বাধীনতার মহান ঘোষক জিয়াউর রহমানকে '৭৫ সালের আগস্টের শেষদিকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে করা হয় প্রেসিডেন্টের সামরিক উপদেষ্টা। দেশের মানুষ আওয়ামী শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সম্প্রসারিত ভারতের আগ্রাসী হাত অনেকটাই সঙ্কুচিত হল এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে। কিন্তু নভেম্বর '৭৫-এর শুরু থেকে ভারতীয় আকাশ থেকে এসে কালো মেঘ জমা হতে থাকে বাংলাদেশের আকাশে। দেখা দেয়

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অশনি সংকেত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের নামে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর '৭৫ একটি অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। অভ্যুত্থানের সূচনালগ্নেই সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হয় এবং সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে তার স্থলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নিজেকে মেজর জেনারেল পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেন।

একথা সত্য যে, ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত দেশে কোন প্রশাসন ছিল না। সেনাবাহিনীর মধ্যে চেইন অব কমান্ড ছিল না। গোটা দেশটাই ছিল সরকারবিহীন এক অন্ধকারে। দেশে একটা আতঙ্কজনক ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করে। দেশবাসী জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু এই যখন দেশ ও জনগণের অবস্থা, তখন খোন্দকার মোশতাক আহমদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার পর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ এবং মুজিব সমর্থিত দলগুলো মাঠে নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার তারা মুজিব দিবস পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ মিনারসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি মিছিল ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। সে মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন খালেদ মোশাররফের মা, তার ভাই বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য রাশেদ মোশাররফ ও বেগম মতিয়া চৌধুরী। তারা ৭ নভেম্বরের শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশে শোকসভার আয়োজন করে। (সূত্র ঃ কাজী সিরাজ, জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ, সম্পাদনায় ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ঃ ২১৬)।

এসব ঘটনার উল্লেখ করে বৃটিশ সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারেনহাস তার বইয়ে লিখেছেন, 'এসব কারণে জনগণের মনে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভ্যুত্থানের (৩রা নভেম্বর) সূচনা হয় বলে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সর্বোপরি তারা যখন আবিষ্কার করল, আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন তারা বুঝে নেয় যে, তার অভ্যুত্থানের পেছনে ভারত আর আওয়ামী লীগ জড়িত এতে কোন সন্দেহ নেই।' (বাংলাদেশ ঃ এ লিগ্যাসি অব ব্লাড, অনুবাদ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬)। এই প্রতিক্রিয়া দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। ফলশ্রুতিতে ৭ নভেম্বর ঘটে গেল সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান। সকাল বেলা সৈনিকরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাজপথে হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায়। সেদিনের ঢাকা শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে এন্থনী ম্যাসকারেনহাস তার উপরোক্ত গ্রন্থে (অনুবাদ গ্রন্থ পৃষ্ঠা ঃ ১২২) লিখেছেন, 'উল্লসিত কিছু সৈনিক আর বেসামরিক লোক নিয়ে কতগুলো ট্যাঙ্ক ঢাকা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়। এবার এই ট্যাঙ্ক দেখে লোকজন ভয়ে না পালিয়ে ট্যাঙ্কের সৈনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে

www.nagorikpathagar.org

আসে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। চারদিন ধরে তারা মনে করেছিল যে, খালেদ মোশাররফকে দিয়ে ভারত তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খর্ব করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এতক্ষণে তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। জনতা সৈনিকদের তাদের ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দন করল। সর্বত্রই জোয়ার আর সাধারণ মানুষ খুশিতে একে অপরের সাথে কোলাকুলি শুরু করে। রাস্তায় নেমে সারা রাতভর তারা স্লোগান দিতে থাকে—আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ ইত্যাদি। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণের মত জনমত আবার জেগে উঠেছে। এটা ছিল সত্যিই এক স্মরণীয় রাত'।

অভ্যুত্থানকারী সৈনিকরাই প্রথমে জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে এবং তাকে কাঁধে নিয়ে উল্লাসের মধ্য দিয়ে পূর্বপদে বরণ করে নেয়। ডঃ আবদুল লতিফ মাসুমের ভাষায়, 'অতিশয় উক্তি শোনালেও এটি বাস্তব সত্য যে, বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিপাহী বিপ্লব ছিল সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা Entirely a new story a story never known or told before. সেনানায়ক আসে সেনানায়ক যায়, কিন্তু একজন সেনানায়ক তার সাধারণ সৈনিকদের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে—এরকম ইতিহাস বিরল। আর সেই অধিষ্ঠানকে জনগণ মিছিলের স্রোত আর উল্লাস দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। একটি পেশাগত সেনাবাহিনীর জন্য ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। এটি রাজনীতি বিজ্ঞান। (Political Science) -এর তথ্য কথিত প্রথাগত গতানুগতিক অভ্যুত্থান (Coup) নয়। এটি কোন প্রতিবিপ্লবও (Counter Coup) নয়। সত্যিকার অর্থে এটি ছিল গণবিপ্লব। দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতি সৈনিকদের অপরিসীম ভালবাসা। জাতির ঐক্য ও সংহতির জন্য প্রতিটি সৈনিকের আনুগত্য উজ্জ্বল ৭ নভেম্বর আমাদের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের একটি অনিবার্য মাইলফলক (আবুল কাসেম হায়দার সম্পাদিত 'দেশনায়ক শহীদ জিয়া' গ্রন্থ ঃ পৃষ্ঠা, ১৩২-১৩৩)।

প্রথমে সেনাবাহিনীর প্রধান ও পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল জিয়াউর রহমানকে। রাষ্ট্রপতি জিয়া কর্তৃক সামরিক আইন প্রত্যাহার, জরুরী অবস্থার অবসান, বাকশাল বিলুপ্ত করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন, উন্নয়নের রাজনীতি, দেশের জনগণের জানমাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতাসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা প্রদান, আওয়ামী লীগের তলাবিহীন ভিক্ষার ঝুড়ি বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের পরিচিতি লাভ এবং সর্বোপরি আমাদের সঠিক পরিচয় 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রবে। এছাড়া পবিত্র সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন বাংলাদেশের বারো কোটি মুসলমানসহ সারা বিশ্বের

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। এদেশের প্রাণপ্রিয় নেতা স্বাধীনতার ঘোষক ও সর্বোপরি '৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের গণবিপ্লবের মাধ্যমে, দেশ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল জিয়াউর রহমান। এখানে উল্লেখ্য ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জিয়াউর রহমান পবিত্র সংবিধানের সংশোধন ঘোষণা করেন। এই সংশোধনী অনুযায়ী সকল ধর্মের ভিত্তি হিসেবে আল্লার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থাই রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি বলে গৃহীত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কথাগুলো সংযুক্ত করার কথা বলা হয়। এই ঘোষণা বলে ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হয় ঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লার প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।' এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের রাষ্ট্রীয় দর্শন, রাজনীতি ও জাতিসত্তার পরিচয় নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নবধারার সূচনা হয়। এদিক থেকে ৭ নভেম্বরের গণবিপ্লব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, যদি কোন সম্প্রসারণবাদী শক্তি আমাদের জাতিসত্তা কিংবা কষ্টার্জিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে চায়, কিংবা জাতীয়তাবাদী চেতনার শিকড় উপড়ে ফেলতে উদ্যত হয় তাহলে সৈনিক জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে তাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আজকে দীর্ঘ ২৫ বছর পর দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও আমাদের জাতিসত্তা ভারতীয় আগ্রাসনে বিপন্ন। এ কাজে ভারতকে সক্রিয় সহযোগিতা করছে বর্তমান সরকার। ইতিপূর্বে বেরুবাড়ী ভারতকে দেয়া হয়েছে। ফারাক্কায় গ্যারান্টি ক্লোজহীন চুক্তি করে বাংলাদেশকে তার ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার বীজ বপন করা হয়েছে ভারতের ইন্ধনে। এছাড়া ভারতে গ্যাস রফতানী ও ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার পায়তারা করছে বর্তমান সরকার। ইতিমধ্যে একটি মহল দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর হুমকি দিয়েছে। এ সবই হচ্ছে ভারতীয় ইন্ধনে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায়। দেশের জনগণ আজ আবার নতুন করে অনুধাবন করতে শুরু করেছে যে, ৭ নভেম্বর '৭৫-এর চেতনাকে ধূলিসাৎ করে এদেশকে একটি ভারতীয় করদরাজ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আওয়ামী সরকারের পুনঃক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্যে ভারত তার মিশন শুরু করেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরসুরি স্বাধীনতার-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল ও দেশপ্রেমিক জনগণ আজ দেশের স্বার্থবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তির ঐক্যের নিকট ভারতীয় আগ্রাসন ও তার তাঁবেদার শক্তি সমূলে ধ্বংস হবে। দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশবাসীর এই প্রত্যাশা।

www.nagorikpathagar.org

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঃ কিছু স্মৃতি

কাজী আবদুর রউফ

অনেকে অনেক কথা এ যাবৎ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে লিখেছেন। কিন্তু যা লিখেছেন তার বেশিরভাগ লেখাই রাজনৈতিক জীবনাদর্শ নিয়ে এবং ব্যক্তি জিয়াকে পাশ কাটিয়ে গেছেন অতি সন্তর্পণে। অবশ্য ব্যক্তিগত সহচর ছাড়া লেখাটাও বেশ কঠিনই বটে। ভেবেছি শহীদ জিয়ার জীবনাদর্শ নিয়ে আমার জানা বাস্তব সত্য কথাগুলো লিখি, কিন্তু সাহস করতে পারিনি। কেননা আমার লেখার গ্রহণযোগ্যতা পাঠকের কাছে কতখানি হবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। সুদূর আমেরিকায় বসে পত্র-পত্রিকায় অনেক বিষয়ে লিখেছি—কোন কথা ওঠেনি, তবে এই দেশে মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিরূপ মন্তব্য করতে অনেকেই অভ্যস্ত। তবুও সংক্ষেপে লিখব, লেখাটা প্রায় প্রয়োজনই মনে করি। কেননা একজন অসাধারণ কৃতিত্ববান ব্যক্তির সাধারণ জীবনপ্রণালী জনমনে শান্তির আলোকবর্তিকা বহনের একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সহায়ক অনুকরণ হতে পারে। লেখা শুরুর আগে খুবই স্বল্পাকারে মুক্তিযুদ্ধে আমার ভূমিকা কিছুটা টানতে হচ্ছে।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারীতে লাহোর থেকে দু'মাসের ছুটিতে বাড়িতে আসি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর লাহোরে যাওয়া থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নেই। প্রত্যয়ী হয়ে উঠি স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য। অতঃপর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল বাংলার মাটিতে। আমিও অংশ নিলাম। ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পেট্রাপোলে রিপোর্ট করলাম মেজর হাফিজ-এর কাছে। তাঁর বেটালিয়ন তখন তেলঢালা যাওয়ার কারণে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ৮নং সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আবু ওসমান চৌধুরীর কাছে এবং তাঁর অধীনে পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশ নেই। দেশ স্বাধীন হল। ঢাকা গেলাম। ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডার আমাকে পছন্দ করলেন এবং ঢাকা সেনানিবাসে ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে জেনারেল জগজিৎ শিং অরোরার দপ্তরে কাজ করতে হল। অতঃপর সেনাসদর প্রতিষ্ঠা হল এবং আমি সেনাসদরে জি এস ব্রাঞ্চ স্টাফ ডিউটিস ডাইরেক্টরেটে পোস্টিং পেলাম। কাজ যথারীতি চলছে। ইতিমধ্যে কর্ণেল

www.nagorikpathagar.org

জিয়া জেড ফোর্স বা ৪৪ ব্রিগেড থেকে সেনাসদরে ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ হিসেবে বদলী হয়ে এসেছেন। আমি তখনও তাঁকে চিনি না। শুধু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে "আমি মেজর জিয়া বলছি" প্রদীপ্তকণ্ঠে মুক্তিকামী যোদ্ধাদের যিনি স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সেই যুধিষ্ঠির নামকেই চিনতাম। তাই বাস্তবে তাঁকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত বোধ করলাম। পরবর্তীদিনে শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে একজন জোয়ানকে সেনাসদরের বারান্দায় সাময়িক ডবল মার্চ করতে বলেছি। উক্ত ডবল মার্চ পালনকালে বুটের শব্দটা বেশ জোরেশোরেই হচ্ছিল এবং সেই শব্দেই জিয়া সাহেব তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে আমাকে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন, এখানে হচ্ছেটা কি? বললাম, স্যার, কিছু না, অপরাধের শাস্তি হচ্ছে। তিনি বললেন, আমার অফিসে এসো। ভিতরে ঢুকলাম। আমার ছাত্রজীবন, পারিবারিক জীবন, পাকিস্তানে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ জেনারেলের অধীনে চাকরি করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধে আমার অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে বিস্তারিত জানলেন। দরজার বাইরে পা বাড়াতেই আমাকে হুকুম করলেন, আমি যেন কর্ণেল খালেদ মোশাররফকে আসতে বলি। যথারীতি আমি তা বললাম। ঘন্টা দু'য়েক পরেই কর্ণেল খালেদ মোশাররফ সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, তুমি এই মুহূর্তেই তোমার কাজ বুঝে দিয়ে কর্ণেল জিয়া সাহেবের কাছে রিপোর্ট কর এবং এখন থেকে তুমি তাঁর সাথেই কাজ করতে থাকবে। বুকটা দুরুদুরু করতে লাগল। শুনেছি জিয়া সাহেব খুব রাগী অফিসার এবং কাউকে খাতির করে কথা বলেন না। যা হোক চাকরি তো করতে হবে, কাজেই ভয় করে লাভ কি। স্যালুট দিয়ে তাঁর টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে বললেন, তুমি তো এস ডি ডাইরেক্টরেট থেকে মোটামুটি অর্গানাইজেশন করা শিখেছ। অতএব, আমার সেক্রেটারিয়েট অর্গানাইজ করার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। যতদিন আমার অন্যান্য স্টাফ না আসে ততদিন অফিসের সমস্ত কাজ তোমাকে একাই করতে হবে। বললাম, আপনি আশির্বাদ করবেন, আমি পারব। অফিসের আসবাবপত্রের সাথে স্যারের অফিসে কার্পেট বিছাতে হবে কিনা জানতে চাওয়ায় স্যার বললেন, যে দেশে বর্তমানে অন্ন-বস্ত্রের অভাব সেখানে তুমি কার্পেটের কথা জিজ্ঞেস করলে কোন্ সাহসে? বললাম, আমি বুঝতে পারিনি স্যার! এরপর থেকে সাতটি বছর আমি তাঁর সাথে পার করেছি এবং তিনি শিখিয়েছেন সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা এবং এককথায় তিনি আমাকে করেছেন সত্যিকার আদর্শবাদী। তিনি নিজে আদর্শবান ছিলেন, তাই আমিও তাঁর কাছ থেকে আদর্শ শিক্ষা পেয়েছি। একটা সময় ছিল যখন আমাদের রেশনের চাল-আটা বলতে গেলে অখাদ্য ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব অভিযোগ তাঁর কাছে তুলে ধরেছি, কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল; সাধারণ সৈনিকরা যা খায় আমিও সেই খাদ্যই খাই, অতএব, এ নিয়ে বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়। এখনকার নিয়ম জানা নাই,

www.nagorikpathagar.org

তবে সে সময়ে স্টাফ অফিসারদের স্টাফ কার ব্যবহারের জন্য মাসিক তিনশত টাকা নিজের বেতন থেকে ভাড়া দিতে হত। বেতনও তখন অনেক কম। একদা তাঁর অফিস কক্ষে ঢুকে তিনি ব্রিফকেসটা টেবিলের উপর খুলে বসে আছেন আর পেন্সিলটা দিয়ে ব্রিফকেসে টুকটুক শব্দ করছেন। ভাবলাম কিছু একটা তিনি ভাবছেন। আমাকে বললেন, তুমি এমটি সেকশনকে বল সামনের মাসের বেতন পেয়ে স্টাফ কারের পেমেন্ট দেব, এখন টাকা নেই। আর তুমি সোনালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকে যেয়ে আমার ব্যালেন্সটা জেনে আস। আমি সোনালী ব্যাংকে, জনতা ব্যাংকে যে ব্যালেন্স পেলাম তা দিয়ে স্টাফ কারের পেমেন্ট করা সম্ভব হয়ে উঠল না। তবুও তাঁর মানসিকতায় এতটুকু কষ্ট দেখিনি।

খেলাধুলা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। প্রতিদিনই তাঁকে আসমানী রংয়ের একটিমাত্র হাফপ্যান্ট এবং কলারবিশিষ্ট একটিমাত্র সাদা গেঞ্জি পরেই লনটেনিস্ খেলতে দেখেছি। শুধু তাই নয়, ঐ হাফ প্যান্টটি আমি নিজে দর্জী দিয়ে রিপিয়ার করেও দিয়েছি। আমি তাঁকে নামাজ পড়তে, রোজা করতে দেখেছি এবং পানসুরাতে কোরআনের আয়াত নিয়মিত পাঠ করতে দেখেছি। ঢাকার বাইরে যাতায়াতে তিনি পানসুরাখানা ব্রিফকেসে রেখেছেন। একের পর এক তাঁর পদোন্নতি হয়েছে কিন্তু কর্মসহিষ্ণু মানসিকতা আমি একই রকম দেখেছি। একবার তিনি চট্টগ্রাম থেকে জনসভা করে এলেন। সকাল সকালেই আমার ডাক পড়ল। বললেন, রউফ আমার মনটা আজ খুবই খারাপ, আমার কৈশোরকালের স্মৃতি আমি হারিয়ে ফেলেছি। বললেন, আমি ৭ম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে আমার চাচা আমাকে একটা ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ হাতঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। এতদিন সেই ঘড়িটাই ব্যবহার করে এসেছি। কোনদিন হারায়নি অথচ গতকাল তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি স্যারকে আমার সাধ্যমত সান্ত্বনা দিলাম। স্যার বললেন, তুমি বায়তুল মোকাররম থেকে তোমার চয়েজ মত দুই তিন'শ টাকায় একটা ঘড়ি নিয়ে এসো। আমি সাড়ে তিন'শ টাকায় তাঁকে একটা সিকো ঘড়ি এনে দিলাম। পুরাতন দিনের সেই হাতঘড়ি এবং গুরুজনের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধ আমার বিবেককে সেদিন জাগ্রত করে দিল। স্যার আমাকে বলতেন, তুমি কখনও অর্থ অপচয় করবে না, উৎকোচ গ্রহণ করবে না এবং আমার কাছে কোন কথা লুকাবে না।

তিনিই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড কাউন্সিলের গোড়াপত্তন করেন এবং ১নং নওরতন কলোনীর বাড়িটা কাউন্সিল অফিস-এর জন্য ভাড়া করে দেন। তাঁর অফিসের গ্রান্ট থেকে থানা সংসদ পর্যন্ত তিনিই অর্থ সরবরাহ করেছেন এবং সেসব চেক আমিই লিখেছি। নঈম জাহাঙ্গীর তখন কমান্ড কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল। মুক্তিযোদ্ধারা কোন দলভুক্ত হতে পারে এমন কথা আমি তাঁকে বলতে শুনিনি। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জাতিকে অবগত করার জন্য শহীদ জিয়া সকল সেক্টর কমান্ডারদের কাছ থেকে

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন এবং আমি চার মাস পরিশ্রম করে সেগুলোকে যথাক্রমে বাংলা এবং ইংরেজীতে অনুবাদ করি তাঁরই বাসভবনে বসে। কোন পার্টি ফাংশনে এটেন্ড করতে সামরিক অফিসারদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লাউন্জ স্যুটে যেতে হয়। ব্রিগেডিয়ার থাকা অবস্থায় জিয়া সাহেব লাউন্জ স্যুটের জরুরী প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এম আই করিমের ধানমন্ডির বাড়িতে এবং সেখান থেকে তাঁর ব্যবহৃত লাউন্জ স্যুট এনে স্যারকে দিলাম। স্যার সেটাই পরে পার্টিতে গেলেন। এই সত্য উদ্ধৃতি এ কারণেই লিখছি যে, তিনি এই লাউন্জ স্যুটটি অন্যের কাছ থেকে নিলে ছোট হয়ে যাবেন এটা তিনি ভাবতেন না। দেশকে ভালবাসা তথা অতি সহজ পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের এমন দৃষ্টান্ত একমাত্র শহীদ জিয়াই রেখে গেছেন। অন্যায় সহানুভূতি শহীদ জিয়ার ছিল না। যেমন ঃ এশিয়াটিক প্রেসের মালিক জনাব হাজী আব্দুল হাই সাহেব-এর স্যারের কাছে যাতায়াত ছিল। তিনি একদিন কারো চাকরির সুপারিশ চাইলেন। কিন্তু স্যার বললেন, আমি জিয়া কাউকে বললে হয়তো কথা রাখবে কিন্তু সমাজ আমাকে ধিক্কার দিবে। তাই আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারলাম না, দুঃখিত। আমাকেও তিনি বলতেন কারো কাছে কখনও অনুগ্রহ চাইবে না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। যে কোন কাজের জন্য অর্থকে তিনি প্রাধান্য দেননি; প্রাধান্য দিয়েছেন কাজ শুরু এবং তা শেষ করার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে। তাঁর কথাই ছিল পরিশ্রম করে যাও এবং কৃতকার্যতাকে সম্মানী বলে গণ্য করে নিও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জেনারেল এম এ জি ওসমানীর প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব শ্রদ্ধাবোধ, যার বহিঃপ্রকাশ আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি। এই দুই মহান নেতার প্রতি তিনি কখনও কটূক্তি করেছেন বলে আমার জানা নাই।

একদিন তিনি তাঁর অফিস কক্ষে আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, আজ তোমার মন খারাপ কেন? বললাম, স্যার, আমার শিশু বাচ্চার খাবারের জন্য দুধের কৌটা নিয়ে বাসায় ফিরতে হবে, কিন্তু টাকা নেই, তাই মনটা খারাপ। বললেন, দুধের দাম কত? বললাম, স্যার এক কৌটা লাক্সিসিয়ানা দুধের দাম ১১০ টাকা। তিনি তাঁর পকেট থেকে ১১০ টাকা বের করে দিলেন। আমি বেতন পেয়ে স্যারকে টাকাটা ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বললেন, You stupid, get out of here। তিনি আমাকে বলেন, কিন্তু এটাও বুঝে নিলাম যে, তাঁর এই বকুনীর ভিতরে থেকে গেল একজন জুনিয়রের প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহবোধ। অফিস টাইম শুরু হবার সময় সেনাসদরের সকল দপ্তর-পরিদপ্তর-এর সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে দেখেছেন সকলেই সঠিক সময়ে কাজে আসে কিনা। তাঁর মধ্যে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল যে, প্রত্যেক অপরাধের জন্যই শাস্তির বিধান অনুযায়ী অভিযুক্তদের শাস্তি পেতে হবে এবং যদি কেউ ক্ষমা পায় তাও আইনসংগতভাবেই পাবে।

www.nagorikpathagar.org

তিনি তাঁর স্টাফকে কখনও বাড়িঘরের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেননি অথবা কোন উপায়ে কাউকে কোন আর্থিক সুযোগসৃষ্টি করেও দেননি। তিনি স্বজনপ্রীতিকে স্থান দেননি। তাঁর অফিসে আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব কোন প্রকার ফায়দা হাসিলের জন্য আসতে পারেনি। আমি একটি ফায়দা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছি এবং তা হচ্ছে তাঁর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংরেজীতে লেখা চিঠিপত্রে উন্নতজাতের ভাষার সমাহার এবং ভাষার শিল্প-কৌশল অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছি। সেই সুবাদে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশে ভাল কর্মসংস্থান পেয়েছি এবং বলতে লিখতে—বেগ পেতে হয়নি।

শহীদ জিয়া যে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা পছন্দ করেননি তার চাইতে বড় প্রমাণ তাঁর কর্ণেল পদবী থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়া পর্যন্ত নিম্নমানের সেই ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ-এর জন্য বরাদ্দকৃত বাড়িটিতেই অতি আনন্দে জীবন যাপন করে গেছেন।

জাতীয় বরেণ্য এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে মানুষটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন তাঁর এবং তাঁর এতটা সরল জীবন যাপনের কথাগুলোই যে শহীদ জিয়াকে মহীয়ান করেছে তা সত্যিকার অর্থে সাধারণ জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে নিঃসন্দেহে আশার আলোক সঞ্চার করেছে। পরিশেষে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

www.nagorikpathagar.org

INDO-SOVIET REACTION TO THE CHANGE
ACHINTYA SEN

On August 15 last, Bangladesh entered a new phase of its struggle against national and international reaction and for sovereignty and democracy. Whether or not that struggle will finally culminate in the emancipation of the masses will largely depend on our ability to identify and unite with real friends in order to attack our real adversaries. The failure to do so will cause collosal loss of human and material resoureces, sacrifices will go in vain and victory will only elude us. It is imperative, therefore, that we correctly understand the ambitions, attitudes and modus operandi of our adversaries, particularly in the context of the changed circumstances brought about by the overthrow of the government of Sheikh Mujibur Rahman on August 15, 1975.

The world was surprised to learn of the collapse of the government of 'mighty' Sheikh Mujibur Rahman who held complete sway over his people. But actually there was nothing to be surprised at; the inevitable happened on the morning of August 15. One who understands the philosopy of dialectical materialism can surely grasp that the change was not sudden. The conditions of chage were accumulating over the years.

The principal condition of change was the sharp and irreconcilable contradiction between the people of this country and the forces of foreign imperialism, expansionism and their follwers resulting in the heroic and protracted struggle of the broad masses of the people of this country,

www.nagorikpathagar.org

particularly the intense struggle launched by the peasantry and other sections of oppressed people in the countryside.

About 25,000 of the brighest sons of the soil laid down their lives in this struggle and another 65,000 were thrown behind bars.

The secondary condition of change was the fierce contradiction between Soviet social imperialism and U.S. imperialism for hegemony in the South Asian subcontinent and the Indian Ocean. The United States considers South Asia and the Indian Ocean as an important flank of the oil-rich Middle East and the Gulf and the only route for the transport of all-important oil. The adjacent areas also possess some important strategic raw materials coveted by U.S imperialism.

On the other hand, the Soviet Union dreams of carving an Asian empire for herself with the subcontinent as its launching pad. Again, one superpower is not satisfied with its own spheres of influence in the subcontinent; it must reach into the other's spheres too. Wherever one goes, the other must follow.

Thus the Soviet Union tightens its control of India through economic and military aid and has imposed on it a treaty of peace, friendship and cooperation with a view to reducing it to a dependency. It attempts to engineer trouble in Pakistan and encourages secessionnist movement there in order to open a corridor toe the Indian Ocean to save its intersts, and plans to launch an Asian collective security plan under its hegemony. To cope with the U.S. deployment based on the twoocean (Atlantic and Pacific) strategy, the Soviet Union works furiously to bring the Indian Ocean under its control and break up the U.S. naval deployment there. It has set up a permanent sub-fleet in the Indian Ocean and seeks to establish naval bases there.

The USA, on the otherhand, seeks to tighten control over Pakistan through economic aid. Taking advantage of the

www.nagorikpathagar.org

difficult situation faced by Pakistan arising from the expansionist threat t her independence and sovereingnty, the USA tries to influence the political cess of that country through arms aid. By exploitin struggle of the great and heroic Indian people against Soviet hegemony, the USA tries to interfere in the internal affairs of Indian and carries out sabotage with a view to easing out the Soviet Union from there and take her place.

The USA has also decided to expand its military base on Diego Garcia in the centre of the Indian Ocean and has sent more naval ships there.

These two nuchear superpowers—the USA and the Soviet Union—have cast their covetous eyes on the territory of Bangladesh too. They are making frantic efforts to use Bangladesh as a pawn on the chessboard of their power politics. The contention between these two superpowers for hegemony in the subcontinent has thrown the entire area into great disorder which is bound to continue.

These two contradictions, coupled with the patriotic spirit and the democratic consciousness in the ranks of the armed forces, helped to initiate the change in the governance of the country. The people, by the large, silently welcomed the change with a feeling that deadweight had been removed from their chest once and for all; that a dark chapter of our national history is finally gone; and that a new era will soon dawn.

The democratic political forces in the country hailed the change in the hope that it will accelerate the process of forming the broadest possible national united front which is the only course ar present for the salvation and emancipation of this nation of 75 million people.

Why should the strategy of forming the broadest possible national united front be emphasised? To under stand it clearly, let us firist examine the public reaction of the governments of India and the Soviet Union to the change in Bangladesh. These two states were very much involved in the

www.nagorikpathagar.org

affairs of Bangladesh during the last five years and therefore their attitudes to the change in this country will have to be studied very seriously.

INDIAN REACTION

The first official reaction from the indian government came on August 16 in the form of a statement by an official spokesman in New Delhi stating. "We (India) cannot remain unaffected by the political developments in a neighbouring country, but these are internal matters of Bangladesh". What did the statement want to convey? Did it mean that if the govrnmental change in Bangladesh develops in a directior unfavourable to the Indian schemes for asserting hegemony in the subcontinent or if the new goverment ceased to be sufficiently pro-Indian in its basic foreign policy orientation and curbed the priviliges India enjoyed in Bangladesh so long, she (India) would then be affected.

The official spokesman, of course, did not say how India would act if she thought that the developments in Bangladesh were affecting her vitally. It, however, seems to assure the Bangladesh government that if developments here did not affect the basic Indian Interests in any way, the situation will then be considered as an internal affair of this country. This is called "carrot and stick diplomacy". "If you do not move away from the dotted lines, it is your internal affair, otherwise we shall be affected. And if we are affected, obviously we cannot sit idle"

Meanwhile, on August 18 an unofficial meeting to condole the death of Sheikh Mujibur Rahman was held in New Delhi. The Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi sent a message to that meeting wherein she said : "Sheikh Mujib was a great national leader dedicated to the vision of Sonar Bangla" West Bengal Chief Minister Siddhartha Shankar Roy and Priya Ranjan Das Munshi, the president of the Youth Congress, were summoned from Calcutta to New

www.nagorikpathagar.org

Delhi to address that meeting wher Mr. Munshi said : "We cannot remain silent spectators to the development in Bangladesh": The government-controlled radio network gave full publicity to the entire proceedings of the meetings.

HEAVY PRESSURE

· Then Indian Ambassador Samar Sen arrived in Dacca on August 19 and called on Moshtaque Ahmed the next day. What transpired in that meeting is anybody's guess, but from the subsequent developments one can imagine the India must have mounted heavy pressure on the government of Bangladesh. The official Bangladesh news agency described that meeting as on between the representative of the 'friendliest country' and the President of Bangladesh. In the meeting Khandaker Moshtaque conveyed his highest regards for Mrs. Gandhi. He lthen sent a message on August 25 to Mrs. Gandhi reiterating Bangladesh's `friendship of India and its readiness to abide by all the agreements and treaties existing between the two states. Indian recognition followed that.

Indian President Fakhruddin Ali Ahmed observed in Budapest on September 30 : "We hope outside forces will not try to interfere in the internal affairs of Bangladesh." The people in this country and the world were more intersted to know whether Indian would interfere in the internal affairs of Bangladesh or not. But nothing on that is said. Neither is anything said on whether India considers herself an outside force in Bangladesh. Are there some people in India working to find a pretext to invoke the "threat to India's security' clause by claiming that outside forces are interfering in Bangladesh?

Mrs. Gandhi, in a recent interview to the Sunday Telegraph, told the world: China interferes in the internal affairs of India. This interference is continuing and, of course, is not limited to India." It is a preposterous and mischievous

www.nagorikpathagar.org

statement. How far would Mrs. Gandhi want to extend the sphere of Chinese interference? China has accorded recognition to Bangladesh and said: "We are convinced that the existence of a soverign, independent and genuinely non-aligned Bangladesh will surely be conducive to safeguarding peace and security in the S. Asian subcontinent." Would the expansionists and reactionaries construe this as an interference in the internal affairs of Bangladesh?

INTERFERENCE

An open discussion meeting on the "recent developments in Bangladesh" was held in New Delhi in mid September under the auspices of the Indian Council of World Affairs the news of which was intriguingly distributed by the national news agency here. That the Government of India approved of holding such a meeting was indicated by the presence of Brigadier Sawhney, the Deputy Director of the government -sponsored Institute for Defence Studies and Analyses, in the meeting. The holding of such a meeting in public in itself constituted a gross interference in the internal affairs of this country. No self-respecting and sovereign nation can take it lightly.

Brigadier Sawhney delivered a highly provocative and aggressive speech in the meeting. The threatening tone of the speech was obviously meant to cower and intimidate the people and the government of Bangladesh. He had the audacity to ask us what foreign policy we should pursue for our benefit. It is quite significant that the Government of India chose an army leader to 'advise' the Bangladesh government on its external relations.

Sawheny said: "It is difficult to believe Dacca will join either Pakistan or China in a confrontation with India". In other words that mean that if Bangladesh government forges friendship with Pakistan and China on the basis of the five principles of peaceful coexistence, India would treat it as a

www.nagorikpathagar.org

hostile act on the part of Bangladesh, in which case India could not but take a policy of confrontation toward her (Bangladesh).

Sawhney says : "Geo-political factors will prompt any government in Bangladesh to live in peace with India". It is obvious and only natural that since Bangladesh does not, and cannot, have any abitions outside its border, it will have peace with all peace-loving countries. But Sawhney introduces the element of geo-political factors here and, like the army general of a big power, says, it will be forced to live as a peace-loving client of India. Sawhney says: "Bangladesh armed forces are in a rudimentary stage and even when developed they are unlikely to become a threat to India". He is confident not only of now but that even in remote future Bangladesh will be in a position to defend itself against Indian thrust.

ADVICE AND WARNING

Sawhney advises the prospective Bangladesh leaders: "Internal factors will prevent any top leader in Bangladesh from embarking on an adventure agairst India". He warns the 'political and military leaders of Bangladesh to think twice before they chart an independent policy for this country, because he might then consider it as an adventure against India. And he seens confident that the people having a stake in power in this country will take his warning seriously.

Inspite of all these warnings and intimidations, if any leader of Bangladesh becomes 'recalcitrant' and asserts the sovereign will of the people of this country, what will happen? Saw havy says; In my opinion India will not even need to keep two divisions of her troops on vigil at she Bangladesh border, as the did during the 1965 conflict with Pakistan." The arrogance is evident; even two divisions are not necessary for them to control the 75 million people of Bangladesh.

www.nagorikpathagar.org

It appears from Sawhney's statements that a country cannot have sovereignty as well as peace with India at the same time. People like Sawhney are prepared to go against the historical current; they have never heard of people's war, they have never heard that a small nation called Vietnam defeated the most powerful nation on earth in the battlefield; they may not hesitate to embark on an adventurous course against another country.

Let, therefore, the government, the armed forces and the people of this country forge steel-like unity. Let us all cast away illusions, heighten our vigilance and remain prepared; for without preparations the nation may suffer.

SOVIET REACTION

The first official reaction from the Soviet Union on the change in Bangladesh came in the form of a commentary by an observer on August 22. The commentary first reproduced a long excerpt from Indian Prime Minister Indira Gandhi's statement in which she paid tributes to the late President of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. The commentary then said that the Soviet people also shared the grief over his tragic death.

The commentary added: "The political situation in the South Asian subcontinent affected not only the destiries of the people of the nearby countries but also the climate of international relations as a whole."

It is apparent from this statement that the Soviet Union is attempting to internationalise the domestic developments in a country which is entirely its internal affairs and cannot and will not affect international relations as a whole unless interested quarters wanted to trample under foot the wishes of the people here by conspiracy and sabotage. The Soviet Union says that developments in Bangladesh will first affect the political situation in the South Asian subcontinent and it will affect international relations. From this might this

www.nagorikpathagar.org

question follow: "How can the Soviet Union, being a superpower and 'guardian' of world peace, remain unconcerned about internal situation in Bangladesh.

The commentary further says: "The latest developments in Bangladesh, therefore, must not be permitted to be used to enliven the opponents of normalisation of the South Asian subcontinent, inhabited by 700 million people, leading to new outbreaks of tension. Obviously, it was important to create essential conditions in which those positive tendencies in Bangladesh foreign policy in recent years might develop and strengthen."

NORMALISATION OBSTRUCTED

Now, let us discuss the first point, the opponents of normalisation. Who are opposing normalisation in the subcontinent? Firstly, it is the rivalry between the Soviet Union and the USA for hegemony in the subcontinent which is obstructing normalisation of relations between the countries concerned. Secondly, it is the expansionist ambition of a Soviet-backed country in this subcontinent which is responsible for intranquility and disorder in the region. The Soviet record of the last few years in the subcontinent does not prove that it really wants normalisation of relations between the subcontinental countries.

Now the second point—'positive tendencies' in the foreign policy of Bangladesh. What are those positive tendencies? The foreign policy of Bangladesh over the last four year was geared to serve the Indo-Soviet interests in the region and the world as a whole. The Soviet Union imposed its will over Bangladesh and made us pursue a foreign policy which drove us away from China and Pakistan with which the Soviet Union and India do not lave good relations. In all vital issues we practically became an appendage of India and the Sovet Union.

www.nagorikpathagar.org

By our policy, we helped India to maintain her hegemony in the subcontinent. On Sikkim, on Indian nuclear blast, on the question of nuclere free zone in South Asia, on US arms supply to the subcontinent, on Diego Garcia, we simply played a second fiddle to India. And on the US-Soviet rivalry for world domination, we sided with the Soviet Union, whereas we ought to have opposed both the superpowers like other leading states of the Third World. This bankrupt foreign policy pursued by the previous government of Bangladesh is called 'positive tendencies' by the Soviet Union.

The commentary then said: "Political observers in various countries ask : whether the forces hostile to the national liberation movement on the whole and striving of the Bangladesh people for, good neighbourliness and socio-economic progress will affect the further development of events in the country. The concern is no accident. Such forces do exist. These are imperialism, Maoism and domestic reaction".

GHOST OF DULLES

This statement amounts to gross interfernce in the internal affairs of Bangladesh. It has laid bare the imperialist features of the Soviet rulers who now express concern over the existence of internal political forces in this country. This reminds us of the American by the name of John Foster Dulles who was haunted by the fear of Communism in every corner of the globe. The ghost of John Foster Dulles, it seems, has now gone to the Kremlin where they are haunted by Maoism. But the people of Bangladesh are now wide awake and ready to resist all forces of oppression, exploitation and plunder, be it imperialism, social imperialism, or expansionism. No amount of trickery can conceal anybody's designs over Bangladesh from its people.

The commentary ended on the note : "The friend of the Bangladesh people express the hope that Bangladesh will

www.nagorikpathagar.org

continue the line of cooperation with its neighbours." In other words, the Soviet Union insists that Bangladesh accept Indian leadership in her defence and foreign policy affairs for all time to come.

A report from Tokyo, carried by the Pravda on August 24, says: "The population and part of the army officers grieve over the killing of Sheikh Mujibur Rahman and his family and that leaflets expressing grief are being secretly distributed in Dacca".

The publication of this report in the Pravda is an indicator of the Soviet attitude to the acts of sabotage and conspiracy that may be launched against the new government of Bangladesh. Pravda never publishes any report of "struggle" unless it is supported by the Soviet government.

On September 6 when the foreign policy of the new government was gradually unfolding itself, the Soviet Union, in the form of a review in the Pravda, issued a sort a warning to the Bangladesh government, saying: "The ganging up by forces hostile to the national liberation movement will hamper Bangladesh's advance of the road to socio-economic deveopment, peace and good neighbourliness".

ADVICE AND THREAT

Then there was a piece of 'advice' (an element of threat is also there) for the new government of Bangladesh. The statement said: "One would like to believe that in the conditions created, the people's Republic of Bangladesh will remain loyal to its foreign policy, guidelines and continue efforts aimed at further normalisation in the South Asian subcontinent and at cooperation with the neighbouring and other countries in the interests of stronger peace and security".

Consistently, the Soviet Union insisting that Bangladesh must pursue the foreign policy of the previous government

www.nagorikpathagar.org

and "cooperation with neighbouring countries", meaning unequal friendship with India. It is now for the people of Bangladesh to judge the Soviet attitude toward the independence, soverignty and teritorial integrity of this country.

There was again interference by the Soviet Union in the internal affairs of Banladesh on September 8 when the Soviet daily, 'Sovietskaya Rossiya', carried a commentary by Pavel Mezentsev who said that "many foreign policy observers abroad are concerned about forces existing in Bangladesh and outside it who would like to turn the country from its chosen progressive way of development and separate it from its time tasted allies". They say they are concerned about forces existing in Bangladesh. Do they then intend to crush these forces themselves?

Again another unwarranted piece of advice : Mr. Mezentsev says: "All sincere friends of the Republic hoped that Bangladesh would stick to its foreign policy". And he introduces the element of world peace in the affairs of Bangladesh with an ulterior motive. Mr. Mezentsev said: "The destinies of peace in Asia and the rest of the world largely depended on the political scene in South Asia. It is important that recent events in Bangladesh should not serve as a pretext for the enemies of relaxation to revive the cold war and confrontation on the subcontinent."

COLD SHOULDER

When President Moshtaque sent Mohiuddin Ahmed as his special envoy to the Soviet Union with a message for Soviet President Nikolai Podgorny, Mr. Ahmed was given a diplomatic cold shoulder. His arrival news appeared in the inside page of the Pravda while the Syrian and Iraqi envoys got the front page converage. Mr. Mohiuddin Ahmed stayed there for 10 days but failed to meet President Podgorny inspite of repeated urgings.

www.nagorikpathagar.org

For a short while he could only meet two Soviet leaders of lesser stature". It is reported that these leaders did not even give a patient hearing to the viewpoits of the Bangladesh government. They reportedly told Mr. Ahmed to maintain the status quo in every vital issue that affects this country, which would mean remaining satisfied with limited sovereignty (a pet theory of the USSR for the Third Word) if the new government of Bangladesh genuinely desires friendship, cooperation and support of the Soviet Union.

The above makes it obvious that the Soviet Union is not at all favourably disposed towards the new government of Bangladesh. The Soviet Union, under similar circumstances, invaded Czechoslovakia in August, 1968. In mid-1973, it helped overthrow the government in a certain Asian country because that particular government was not helping the Soviet designs on a subcontinental state. The Soviet Union was not happy over the neutrality pursued by the Sihanouk government of Cambodia from mid-60s, and so when the USA engineered a coup against Prince Sihanouk, the Soviet Union did not hesitate to extend its support to the Lon Nol puppet cliqe.

Let us, therefore, beware of superpower conspiracies against Bangladesh. The interests of the Soviet Union under the present leadership and the people of Bangladesh are diametrically opposite, antagonistic and irreconcilable. Hence only by defeating such anti Bangladesh-people policies in the subcontinent can we build and consolidate an independent, soverign and free Bangladesh.

www.nagorikpathagar.org

THE SIGNIFICANCE OF NOVEMBER 7

ACHINTYA SEN

The people of Bangladesh are awakening. The glorious movement of November 7 was the dawn of the great struggle which will liberate the Bengalees. On this day hundreds and thousands of people came out in the streets of Dacca to greet the soldiers who together with the people thundered, "Down with expansionism-social imperialism." That day the politically most backward section of the people also showed a tendency to rise, a tendency to defend the sovereignty of the motherland. This upsurge of the people's movement is a colossal event.

It indicates that in a very short time the whole people of the country will rise like a mighty storm, like a hurricane, a force so swift and violent that no power, however great, will be able to hold it back. They will smash all the trammels that bind them and rush forward along the road to liberation. All those forces that criticise the people and stand against the wishes will be smashed to smithreens. The people will sweep the forces of aggression and a handful of traitors into their graves and in the process will build a new Bangladesh, a people's Bangladesh where life will be abundant and culture will flourish.

On November 7 the people demonstrated the heroic spirit of the Bengalee nation, they displayed extraordinary revolutionary entl siasm. They proved that the Bengalees have backbone, they have shown the determination to vanquish all enemies and never to yield. The Bengalee nation has the spirit to defend the motherland to the last drop of its blood.

www.nagorikpathagar.org

The people are now standing up and that day is not far off when nobody will ever be allowed to intimidate or bully us, none will dare to touch us, we shall stand on our own feet and live as genuinely equal in the family of nations.

Our heroes will spring up from the ranks of the people in the great struggle that lies ahead of us. They will be steeled in the ordeal and lead us to victory.

The November 7 movement was also directed against a government led by a few traitors which usurped power against the wishes of the people and conspired to betray the national independence of the country. Through the experience in the struggle in the streets the people realised that thear med forces which unite with the people are invincible.

Through the November 7 struggle the people and soidiers also displayed a militant unity, a unity born of a common objective and common goals and the objective is the defence of the motherland and the liberation of the whole nation. But what is the guarantee that the people's struggle which in the past encountered repeated failures will now culminate in victory?

The first guarantee is that the people this time have correctly identified their principal adversary, their main target of attack. The people cannot aim at a variety of targets so that the bullets do not hit the principal adversary but the lesser adversaries or even the allies. The second guarantee of success in the struggle is that the people through their November 7 struggle have also evolved the correct tacties to fight the principal adversary, that is, the tactics of the unity of the whole people—the tactics of the united front.

Now; therefore, the principal task before the whole nation is to form the broadest possible national united front of all political parties and groups, people in all walks of life—a united front consisting of workers, peasants, soldiers and commanders, intelligentsia, government officers and

www.nagorikpathagar.org

employees, businessmen, industrialists, enlightened gentry, patriotic landlords and all those persons who want to defend the motherland against foreign aggerssion. The need of the hour is to form this united front and use it as a means of organising and rallying millions of people for the purpse of defending our national soveignty. The people must move a mighty revolutionary army into action. Only a force of such magnitude can crush our adversaries who belong to the world front of aggression.

But without struggle there cannot be any united front. Already forces are at work to wreck the national unity that was forged through struggle. The adversaries are sowing dissension among the ranks of the people. Everybody must be alive to the danger of the situation.

A LEAFLET

To forge the national unity, to forge the unity of the armed forces a leaflet distributed among the ranks of the army in the name of the "revolutionary soldiers council" on November 5 should be discussed.

The leaflet in part read : "During war and other emergencies the officers leaving us (soldiers) in danger go away to seek safe refuge ... these officers in order to use us in the contradictions of the bourgeoisie are attempting to artificaially divide us Punjab regiment, Bengal regiment' corps and infantry ... now is the time to resist this conspiracy ... the broad masses of the exploited and oppressed people are now taking preparations for final liberation from the clutches of the exploiting bourgeoise." etc.

Then in the name of revolutionary soldiesrs certain demands were raised which inter alia included: (1) the armed forces have to be transformed from the army of the rich to the army of the poor, (2) the distinction between officers and soldiers have to be removed, (3) the same salary and same arrangements for accommodation have to be provided for

www.nagorikpathagar.org

both officers and jawans, (4) better living conditions for the soldiers have to be ensured etc.

The progressives always hold that a proper measure of democracy should be put into effect in the army by having officers and men share weal and woe. The progressives also want that feudal practices should be abolished in the army. Once this is done, unity will be achieved between officers and men and the combat effectiveness of the army will be greatly increased. It will also strengthen discipline.

But in the name of democracy or better living conditions for the soldiers one should not be allowed to wreck the unity of the armed forces and bring about a split between officers and soldiers. But that is what appeared to be the objective of the above-mentioned leaflet.

It is not correct to demand the transformation of "the army of the rich to the army of the poor." Our army is an army of the whole nation—the rich and poor alike. Unlike the army of an imperialist nation which carries out aggression abroad, our army is the army of an oppressed nation. Here both officers and soldiers are politically oppressed and economically exploited the difference are of degrees. The duty of our army is to defend the motherland against external aggression. The attempt to transform a national army into a "class army" if successful will result in the disappearance of the army itself.

Here it may be noted that Sheikh Mujibur Rahman in the name of introducing socialism destroyed the economy of Bangladesh; in the name of democracy of the exploited he imposed one party fascist dictatorship. Now in the name of "army of the poor" apparently an attempt is being made to wreck the armed forces of Bangladesh and deprive this nation of its first line of defence against aggression.

When the entire nation is demanding the unity of the armed forces, a militant unity between soldiers and officers, the leaftet then declared a soldiers' war against the officers. The demand of the nation are diametrically opposite.

www.nagorikpathagar.org

In the name of better living conditions for the soldiers demands were made for the removal of distinctions between officers and soldiers. If these ultrademocratic demands are implemented right now, discipline in the army will vanish. Can an army worth its name do without a high sense of discipline among officers and soldiers ?

We firmly support the demend for better living conditions for the soldiers in the army. But this genuine urge of the soldiers must not be allowed to be used as a pretext to wreck discipline in the army. The better living conditions for the soldiers and officers and democracy in the army is meant to strengthen discipline and increase the cambat effectiveness, not to weaken them.

Over the last few days some disturbing reports pourd into our office. Therefore, HOLIDAY, which stands for the defence of the motherland, liberation of the whole nation and democracy for the entire people appeals to the officers and soldiers of the armed forces to unite more closely and resist all attempts to split the armed forces and impose fatricidal strife on us.

The officers and soldiers must heighten their sense of unity and discipline and respect the Chain of command. They must introduce democracy in the armed forces as far as possible but they must not allow breach of discipline at this critical hour for the nation. The officers must rise to the occasion, be courageous and frustrate all attempts to isolate them from their men. They should never desert their posts because that will only give a handle to the enemies of the nation. They must be on guard against all conspiracies against this country.

All of us must take lessons from the events taking place in Portugal, Angola and Lebanon. Our rear must be made safe and secure. Internal peace is a prerequisite to the struggle for the defence of the motherland. Hence all attempts to divide the people, like arousing communal tensions of one variety

www.nagorikpathagar.org

or another or districtism' in the industrial areas must be ruthless suppressed.

We must also remain alive to the danger of fanaticism and chauvinism. At the same time we shall oppose those forces which spread pessimism among the people. Inspite of difficulties that lie ahead, the future of Bangladesh is bright; there cannot be any two opinions about it.

PARTY

Now let us discuss in brief the polices of a certain political party which during the last four years struggled against the tyranny of the Mujib regime. A large nember of its cadres were liquidated during that struggle and thousands others were put behind the bars. It has also some influence among the masses.

After the movement of November 7 this party issued a leaflet wherin it was said that the fundamental object of the movement was to liberate the nation from exploitation, corruption, oppression and autocracy.

But this is not correct since the fundamental objective of the November 7 movement was the defence of the motherland and resistance to expansionism-social imperialism. This is apparent from the slogans the people and soldiers raised during the great struggle of November 7. And even when the objectives of the November 7 struggle are realised, some form of expoitation will remain.

The struggle to end all exploitations, therefore, will be a future struggle and it belongs to an entirely different historical period for the nation. The struggle of the future must not be confused with the struggle of the present. This will only create confusion among the people and serve the adversary's purpose.

The leaflet then said : "In order to ensure the liberation of the whole nation, the first and foremost task of the present is to save the nation from the aggression of the external forces

www.nagorikpathagar.org

and conspirators, to wipe out the existence of the domestic reaction-aries and exploiting bourgeoisie and root out all forms of exploitations, corrouption and misrule."

Now if the first task is so massive as to fight aggressors, the domestic bourgeaisie and all forces of exploitation then, may we ask, what are the second and third tasks of the party? The leaflet's line thinking obviously then will again serve to create confusion among the people and shield the principal adversary from the attacks of the people.

We hold that the principal or first task before the whole people is to fight the forces which threaten this nation, the bourgeoisie who are willing to defend the motherland against external aggression are a staunch component of this struggle. To hit them actually means not to hit the enemy. It would in fact mean helping the adversary, holding back, isolating and constricting the struggle and bringing it to a low ebb and even to defeat.

Any slogan which emphasises class struggle too much at this moment of life or death for this nation will be suicidal. The class struggle in Bangladesh is now being transformed into national struggle and in the final analysis, national struggle is nothing but a form of class struggle.

Any slogan which weakens this national struggle must be opposed and hence at this moment we firmly oppose the slogan of " Sramik Raj Krishak Raj" raised by this party. We want a government which will represent not only workers and peasants but also soldiers and commandos, intelligentia, businessmen, industrialists, government officials and employees, enlightened gentry, patriotic landlords and all those people who want to defend the motherland aganst aggression. We support the policy which calls for the mobilisation of the entire forces of the nation for the defence of the motherland. Hence the slogan now should be : Let those with strength contribute strength; those with money contribute money; those with guns contribute guns; and those with knowledge contribute knowledge.

www.nagorikpathagar.org

In the circumstances, HOLIDAY which stands for the defence of the motherland, liberation of the whole nation and democracy for the entire people appeals to the leaders of the party who have a tradition of fighting against tyranny to coolly ponder over the objective tealities, realise that the threat to our sovereignty is not imaginary but real. We urge them to give up those activities which may split the people and instead to unite with other patriotic political parties in good faith and lead the people's struggle for national liberation to victory.

Let us conclude by recalling a chapter from the Great October Socialist Revolution. The Great Lenin during the First World War propounded his celebrated theses that the world war raised the possibility of socialist revolution becoming successful in a single country and then he concluded that as Russia forms the weakest link in the chain of imperialism, it was possible for socialism to be victorious in Russia alone. The arch counter-revolutionary Trotsky who sneaked into the party of the protelariat then opposed Lenin's thesis and called for revolution in a series of countries which is popularly known as the "theory of permanent revolution." Lenin denounced Trotsky's theory and said, "Permanent revolution means no revolution at all." In fact, that super-actor Trotsky did not want revolution to succeed in any country and to camuflage his designs mouthed all kinds of ultra-revolutionary slogans. Later events unmasked Trotsky as a traitor to the Soviet people and an agent of international imperialism.

HOLIDAY : November 16, 1975

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ঃ এক

(জনগণের প্রতিক্রিয়া)

(৭ নভেম্বর উল্লাসমুখর রাজধানী ও অন্যান্য শহর সম্পর্কে তিনটি পত্রিকার রিপোর্ট।)

ক। প্রাণবন্যায় উচ্ছল নগরী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট) ঃ "পথে পথে আজ জনতার কলরোল, পথে পথে আজ বিজয়ের আনন্দ। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘনঘোর অমানিশার অবসান ঘোষণা করিয়া হেমন্তের প্রভাতসূর্যের আগমনের সাথে সাথে পথে নামিয়াছে আনন্দোচ্ছল অজস্র মানুষের ঢল। মানুষের নিকট স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব কতখানি প্রিয়তম সম্পদ তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে আজ। ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর সাজোয়া গাড়ীর শব্দ আর জয়ধ্বনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ধ্বনির সহিত একত্রিত হইয়াছে।

রাত্রি হইতে একটানা গোলাগুলীর শব্দে রাজধানীর মানুষগুলি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় প্রহর গুনিতেছিল—অকস্মাৎ সেনাবাহিনীর শ্লোগান আর অভয়বাণী তাহাদের সমস্ত জড়তাকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। সেই ১৯৭১ -এর ১৬ ই ডিসেম্বরের মত একইভাবে একই উল্লসিত প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত হইয়াছে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের প্রত্যুষ। ভোর হইতে রাস্তায় রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ নামিয়াছে, মিছিল করিয়াছে—জিয়া ও মোশতাকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছে।

ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই হর্ষোৎফুল্ল সৈনিক-জনতা জিয়া ও মোশতাকের ছবি লইয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক। গাড়ীতে করিয়া সেনাবাহিনী প্রত্যেকটি মহল্লায় গিয়া জনগণকে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার অনুরোধ জানাইয়াছে, দেশের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়াছে—কামনা করিয়াছে জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, তথা সমস্ত আইন প্রয়োগ সংস্থার সহিত জনগণের আন্দোলন প্রাণের স্পন্দন একইলয়ে স্পন্দিত হইয়াছে।"

[ইত্তেফাক বিশেষ সংখ্যা ঃ ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫]

www.nagorikpathagar.org

খ। প্রাণবন্যায় উচ্ছল নগরী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট) ঃ তখনও আকাশে অন্ধকার ছিল। গোলাগুলির শব্দে প্রকম্পিত শেষ রজনীর ঢাকা। শাসরুদ্ধকর। মুহূর্তগুলি ছিল যুগের মত। বিনিদ্র রাত্রিতে আতঙ্কিত নগরবাসী হয়তো ভাবিতেছিল একাত্তরের সেই পাষাণ ঢাকা দিনগুলির কথা। এমনি সময়ে রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রের ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল শ্লোগান 'সিপাহী বিপ্লব। জিন্দাবাদ' উৎকণ্ঠ নগরবাসীর শ্রবণেন্দ্রিয়। এই অসময় রেডিও কি বার্তা শুনাইবে? ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হইল ঃ "সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিবেন।"

ঘোষকের এই ঘোষণার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটল চারদিনের অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্নের। ভোরের আলো উঠিবার আগেই জনতা নামিল রাস্তায়। প্রচন্ড গুলির মুখেও নিঃশঙ্ক দুঃসাহসী পদবিক্ষেপে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর গাড়ী আর ট্যাংকের ঘর্ঘর শব্দ। ইহার পর মিছিল, মিছির আর মিছিল। সিপাহীদের প্রতি উৎফুল্ল অভিনন্দন বা হৃদয় নিংড়ানো আলিঙ্গন। সেনাবাহিনী পরিণত হইল জনগণের সেনাবাহিনীতে। পথে পথে জনতার কলরোল আর সিপাহী-ফেলিয়া আসা স্মৃতি বিজড়িত দিনটির।

১৯৭৫ সনের ৭ নভেম্বর সকাল মুখরিত হইল জনতার জয়নিনাদে। সামরিক বাহিনীর গাড়ীতেই নহে—বাস ট্রাকে সেই একই দৃশ্য। খন্দকার মোশতাক আহমদ আর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবি লইয়া রাস্তায় মিছিলের ঢল।

গাড়িতে করিয়া সেনাবাহিনী প্রতিটি মহল্লায় গিয়া জনগণকে আদব ও শৃঙ্খলা রাখিবার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাইয়াছেন। দেশের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়াছেন—কামনা করিয়াছেন জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। সিপাহীদের সহিত জনতার আনন্দোচ্ছল প্রাণের স্পন্দন একইলয়ে স্পন্দিত হইয়াছে গতকাল।

নারায়ণগঞ্জে বিজয়োল্লাস

গতকাল সকালে সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা বিভিন্ন যানবাহনে করিয়া নারায়ণগঞ্জে পৌছিলে শহরের হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতা রাস্তায় নামিয়া আসে এবং সিপাহী-জনতা এক হইয়া শ্লোগানে-শ্লোগানে শহর মুখরিত করিয়া তোলে। নারায়ণগঞ্জ বাসযাত্রীসহ টার্মিনালের লঞ্চ যাত্রীরাও বিভিন্ন ধ্বনি দিয়া বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিতে থাকে।

(ইত্তেফাক ঃ ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

www.nagorikpathagar.org

গ। রাজধানীর পথে পথে জনতার আনন্দ মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) ঃ রাজধানী ঢাকা গতকাল শুক্রবার ছিল বিজয় উল্লাসের আনন্দে উদ্বেল এক উৎসবমুখর নগরী। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় দুটোয় রেডিও বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ-এর দায়িত্বভার গ্রহণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মতো রাজপথে নেমে আসে করতালি আর শ্লোগানে মুখর স্বতঃস্ফূর্ত লাখো জনতার ঢল আর আনন্দ মিছিল।

সে এক অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব দৃশ্য। শহরের পথে পথে অলিগলিতে ফুল, মালা, আর হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য দিয়ে জনসাধারণ বরণ করে নেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিরাপত্তা রক্ষাকারী অকুতোভয় সেনাবাহিনীর সিপাহীদের। আগের দিন গভীর রাত থেকে গতকাল প্রায় সারাদিন ধরে সেনাবাহিনী আর জনতা একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে হাতে হাত রেখে সারা শহরকে প্রকম্পিত করে রাখে গগণবিদারী শ্লোগানে। সিপাহী আর জনতার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠে—বাংলাদেশ জিন্দবাদ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সিপাহী-বিপ্লব জিন্দাবাদ, মোশতাক আহমদ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই ইত্যাদি।

শুধু মিছিল আর মিছিল। ট্যাঙ্কের মিছিল। বাস, ট্রাক, জীপ, রিক্সার মিছিল। পায়ে হাঁটা জনতার এ মিছিল সেনাবাহিনী আর জনতার মিলিত মিছিল, আবাল বৃদ্ধবনিতার মিছিল। পাশাপাশি আনন্দ-কতরালি, কাওয়ালী, গান, ব্যান্ড পার্টি আর নৃত্যে মুখর সিপাহী-জনতার গাড়ী আর মিছিল ঘুরেছে সারা শহর জুড়ে। মুহূর্তে মুহূর্তে সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা তাদের স্টেন রাইফেল থেকে উৎসবের আনন্দে উপরে গুলী ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করেছেন, আর রাস্তার ধারে বাড়ীর দরজা জানালায় ছাদে দাঁড়ানো জনতাকে আরো উল্লসিত করে তুলেছেন। যে পথ দিয়ে সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীরা অতিক্রম করেছেন আবালবৃদ্ধবনিতা তাদের ফুলের মালা দিয়ে আর হাত তুলে জানিয়েছে আন্তরিক অভিনন্দন। সূর্য সারথী সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা শুধু গাড়ীতে চেপেই শহরে ঘোরেননি, তাঁরা কলোনীতে, পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে ঈদের আনন্দে জনগণের সাথে আলিঙ্গন করেছেন, হাত মিলিয়েছেন। এ সময় তাদের মুখে কেউ তুলে দিয়েছেন মিষ্টি, করেছেন আদর আপ্যায়ন।

একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বরের পরে ঢাকার রাজপথে জনতা-সেনাবাহিনীর মিলনের এমন তুলনাবিহীন দৃষ্টান্ত আর অযুত জনতার আনন্দ মুখর মিছিল দেখা যায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অফিস আদালতের কর্মচারী, শিল্প কারখানার শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকেই গতকাল ঢাকা শহরে আনন্দ আর বিজয় মিছিল বের করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গতকাল সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীরা শহরে প্রবেশের সাথে সাথে শহরের শিশু, কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, নরনারী সর্বস্তরের মানুষ তাদের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন ও সিপাহীদের অভিনন্দন জানান। এপর জনসাধারণ সিপাহীদের গাড়ীতে ওঠে এক সাথে শহর পরিক্রমণ করেন, আর বিভিন্ন আনন্দ ধ্বনি প্রদান করেন। *(সংবাদ ঃ ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)*

ঘ। উল্লাসে উদ্বেল ঢাকা নগরী

(স্টাফ রিপোর্টার) ঃ রায়ের বাজার নিউমার্কেট এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন ঃ রায়ের বাজার জিকাতলা, ধানমন্ডী, নিউমার্কেট এলিফ্যান্ট রোড, শাহবাগ, সেই কাকডাকা ভোর থেকেই এই সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ঘর আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বেরিয়ে এসেছে ছাত্র-যুবক-বৃদ্ধ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এমনকি মহিলারাও বেরিয়ে এসেছেন কোথাও কোথাও।

পথে পথে সে আর এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী-জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে-ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলা গাড়ি, হাফট্রাক জীপ। ছুটে চলছে ট্যাংক। সহস্র বিপ্লবী সিপাহীদের সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে বিপ্লবী জনতা। কণ্ঠে তাদের শ্লোগান—বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। আর সেই সাথে সাথে প্রাণের উন্মাদনায় আকাশমুখী ফুটিয়ে চলেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের গুলী। সারা শহর জুড়ে শুধু গুলীর আওয়াজ। আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়া প্রাণের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের আওয়াজ। এ যেন সেই একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরের দৃশ্য। জনতা সেনাবাহিনী মিলনের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত। শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়ীতে নয় বেসামরিক যানবাহনেও উঠেছে সেই উল্লাস, একই শ্লোগান। এখানেও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সিপাহীরা।

মেজর জেনারেল জিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনে আনন্দে উদ্বেলিত ঢাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করেছে মিছিল। ট্রাকে ট্রাকে উল্লসিত জনতার গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ৭ই নভেম্বরের সকাল। মেজর জেনারেল জিয়ার কণ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগময় দিনে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বাংলার মানুষকে ঠিক তেমনিভাবে যেন আবারও সৃষ্টি করেছেন উন্মাদনার জোয়ার।

এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত শহরের পথে পথে চলেছে উল্লসিত জনতার আনন্দ মিছিল। জনতার জোয়ারে যে প্রাণ জেগেছে সেই কাকডাকা ভোর থেকে তা অব্যাহত রয়েছে। এগিয়ে চলেছে বিপুল গতিতে।

www.nagorikpathagar.org

মতিঝিল ও হাটখোলা থেকে লিখেছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার ঃ কাকডাকা ভোর। দূরে বহুদূরে শ্লোগানের ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা হচ্ছিল। সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছেন। এ ঘোষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আনন্দের উচ্ছ্বাস। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হলো খন্ড খন্ড মিছিল। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা লরি, ট্রাক ও বাসে করে মতিঝিলের রাস্তা ধরে যাচ্ছেন।

এ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এ ঘটনা বিরল। শুধু স্মৃতি পটেই ধরে রাখা যায় তা। মহিলারাও বাড়ীর ছাদে উঠে দেখেছিলেন সে দৃশ্য। শুধু শ্লোগানে আর শ্লোগানে। রাত ঝিমিয়ে পড়া মতিঝিলের আকাশছোয়া বাড়িগুলোও যেন নতুন দিনের হাতছানি। ভোরের আকাশে উঁকি দিচ্ছে রক্তিম লাল সূর্য।

(দৈনিক বাংলা ঃ টেলিগ্রাম ঃ ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)

ঙ। জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বিপ্লব

(স্টাফ রিপোর্টার) ঃ সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লবে চার দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

মিছিল আর মিছিল। বিপ্লবের বিজয়ের, উল্লাসের মিছিল। শ্লোগান আর শ্লোগান, কণ্ঠের আর বুলেটের মিলিত শ্লোগান। করতালি আর করতালিতে প্রাণের দুন্দুভি। আকাশে উৎক্ষিপ্ত লাখো হাত একের পর এক হচ্ছে প্রত্যয়ের স্বর্ণঈগল। পথে পথে সিপাহী আর জনতা আলিঙ্গন করছে, হাত নেড়ে জানাচ্ছে অভিবাদন—কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত এক কণ্ঠে একি আওয়াজ—সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জওয়ান-জওয়ান ভাই ভাই; বাংলাদেশ জিন্দবাদ, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ। খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ আমাদের আজাদী—রাখবোই রাখবো, স্বাধীনতা স্বাধীনতা—রাখবোই রাখবো, হাতের সঙ্গে হাত মিলাও—এক কাতারে সামিল হও, হাতের সঙ্গে হাত মিলাও—সিপাহী জনতা এক হও। এত আনন্দ, এত উল্লাস—সিপাহী ও জনতার হৃদয়ের হৃদয়ের কোরাস, শ্লোগানের সঙ্গে কামানের এমন অর্কেস্ট্রা—এ এক অনন্য ইতিহাস। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার—এই চারদিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর পেরিয়ে এসেছে শুক্রবারের সোবেহ সাদেক—সিপাহী ও জনতার মিলিত বিপ্লব এনেছে শুক্রবারের সূর্য। ঢাকা উল্লাসে টাল মাতাল, বাংলাদেশ আনন্দে উদ্বেল। এই রিপোর্ট আমরা যখন লিখছি তখনো পথে পথে একের পর এক বিজয় মিছিল যাচ্ছে—ট্রাকে চেপে, পায়ে হেটে, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ, আনসার ও দমকল বাহিনীর একেকটি দল যাচ্ছে—করছে রাজধানীর পথ পরিক্রমা। তাদের সঙ্গে এক ট্রাক সারিতে রয়েছে নানা স্তরের জনগণও।

www.nagorikpathagar.org

পথে পথে ঘুরছে ট্যাংক আর আর্মার্ডকার। পেছনে পেছনে জনতা। কোন কোন ট্যাংক ও আর্মার্ডকারেও জনতা উঠে বসেছে, শ্লোগানে শ্লোগানে-আনন্দে নিক্ষিপ্ত সিপাহীদের গুলীতে আনন্দে উল্লাসে উদ্বেল নগরী। শুরু অনেক আগে থেকেই—বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত প্রায় দুটো-আড়াইটা থেকে—ঢাকার জনগণ যখন বুঝতে পারলেন—দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষ হয়ে আসছে—শুরু হয়েছে সিপাহী বিপ্লব—তখন থেকেই তারা রাজপথে নামতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে দেখা গেল—ময়মনসিংহ রোডে হাজার হাজার লোক—নানা স্তরের নানা বয়সী। সিপাহীরা তাদেরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলছেন। শ্লোগান দিতে দিতে জনতা এগোচ্ছে ফার্মগেটের দিকে, রেডিও-ট্রানজিস্টারের পাশে জনতা উৎকর্ণ—মেজর জেনারেল জিয়া কখন ভাষণ দিবেন। ভোর হলো। পথে পথে তখন জনতার জোয়ার। প্রাণের ঢল। ঢাকা নগরে তখন ছড়িয়ে গেছে বিজয়ের বার্তা। পথের পাশে মোড়ে মোড়ে জনতা। সিপাহীরা ট্রাকের পর ট্রাকে, লরির পর লরিতে যাচ্ছে তারা উচ্চকণ্ঠে বলে যাচ্ছে জয়ের কথা—পথের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য রাখছে শ্লোগান দিচ্ছে আর তার পর সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান জনগণের। বহু মহিলা এসে রাস্তার পাশে এখানে-সেখানে জড়ো হয়েছে। স্কুল ড্রেস পরা ছেলেমেয়েরা এখানে-সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিপাহীরা যাচ্ছে—জনতা অভিনন্দন জানাচ্ছে—তাদের দিকে ফুল ছিড়ে দিচ্ছে, ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। সিপাহীরা অভিনন্দন জানাচ্ছে জনতাকে। পথে পথে গাড়ি থেকে নেমে আলিঙ্গন করছে। তাদেরকে দেয়া মালা পরিয়ে দিচ্ছে জনগণের গলায়। ব্যান্ড পার্টির বাদ্যের তালে তালে পথে পথে আনন্দে নৃত্য করছে জনগণ। সকালে পথের পাশে এখানে সেখানে লোকজন আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছে। কোথাও কোথাও সড়কদ্বীপে পথচারীরা মিলিত হয়েছেন মিলাদ মাহফিলে।

(দৈনিক বাংলা ঃ টেলিগ্রাম ঃ ৭ নভেম্বর ১৯৭৫)

চ। আনন্দ উদ্বেল মানুষের ঢল নেমিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার) ঃ আনন্দ উদ্বেল মানুষের এক অভূতপূর্ব জোয়ার নেমেছিল গত কালের ঢাকায়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার সফল বিপ্লবে এবং বেতারে জিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে হাজার হাজার মানুষ নেমে এসেছিল পথে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে যে সিপাহী বিপ্লবের শুরু তার সার্থক পরিণতি আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ অংশগ্রহণে। জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে বিপ্লবের সাফল্যের বার্তা নিয়ে সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছিল যে হাজার হাজার বীর সেনা তাদের হাতে হাত মিলিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ ঘোষণা করেছে সর্বাত্মক একাগ্রতা। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তুলেছে বিপ্লবের সপক্ষে।

এ উল্লাসের শুরু সেই ভোর থেকে। চলেছে সারাদিন। বেলা দুইটার দিকে জেনারেল জিয়ার আহ্বানে সিপাহীরা ছাউনিতে ফিরে যাবার পরও জনতার এ উল্লাস

www.nagorikpathagar.org

চলতেই থাকে। অসংখ্য মিছিল আর সভার মধ্য দিয়ে জনতা এই বিপ্লবের প্রতি জানায় তাদের সমর্থন। জেনারেল জিয়ার প্রতি জানায় আন্তরিক অভিনন্দন।

গতকালের ঢাকা নগরী সম্পর্কে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টাররা লিখেছেন ঃ

রায়েরবাজার, জিকাতলা, ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, শাহবাগ—সেই কাকডাকা ভোর থেকেই এ সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য। ঘর আর কাউকে বেঁধে রাখতে পারেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে সবাই। বেরিয়ে এসেছে ছাত্র-যুবক-বৃদ্ধ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এমনকি মহিলারাও বেরিয়ে এসেছেন কোথাও কোথাও।

পথে পথে সে আর এক অভাবিত দৃশ্য। গাড়িতে গাড়িতে বিপ্লবী সিপাহী জনতার এক দুর্জয় উল্লাস। এদিকে ওদিকে চারদিকে ছোটাছুটি করছে সামরিক বাহিনীর খোলা গাড়ি, হাফ-ট্রাক জীপ। ছুটে চলেছে ট্যাংক। সশস্ত্র বিপ্লবী সিপাহীদের সাথে এসব গাড়িতে স্থান নিয়েছে জনতা। কণ্ঠে সবার শ্লোগান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। আর সেই সাথে প্রাণের উন্মাদনায় আকাশমুখী ফুটিয়ে চলেছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের গুলী। সারা শহরে শুধু গুলী আর গুলীর আওয়াজ। আকাশের দিকে ছুড়ে দেয়া প্রাণের বাঁধ উল্লাসের আওয়াজ।

এ যেন সেই একাত্তরের ডিসেম্বরের দৃশ্য। জনতা সেনাবাহিনীর মিলনের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়িতে নয়—বেসামরিক বাহনেও উঠেছে একই উল্লাস একই শ্লোগান। এখানেও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সিপাহীরা।

মেজর জেনারেল জিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তনে আনন্দে উদ্বেলিত ঢাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করেছে মিছিল। ট্রাকে ট্রাকে উল্লসিত জনতার গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ৭ নভেম্বরের সকাল। মেজর জেনারেল জিয়ার কণ্ঠস্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগময় দিনে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিল বাংলার মানুষকে ঠিক তেমনি ভাবেই যেন আবারও সৃষ্টি করছে উন্মাদনার জোয়ার।

মতিঝিল ও হাটখোলার এলাকা থেকে লিখছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার ঃ কাকডাকা ভোর। দূরে বহুদূরে শ্লোগানের ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়েছে। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছেন।

এ ঘোষণায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আনন্দের উচ্ছ্বাস। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হলো খন্ড খন্ড মিছিল। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা লরী, ট্রাক ও বাসে করে মতিঝিলের রাস্তা ভরে যাচ্ছেন।

এ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এ ঘটনা বিরল। শুধু স্মৃতিপটে ধরে রাখা যায় তা। মহিলারাও বাড়ীর ছাদে উঠে তখন দেখছিলেন সে দৃশ্য।

www.nagorikpathagar.org

শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান। রাতে ঝিমিয়ে পড়া মতিঝিলের আকাশ ছোয়া বাড়িগুলোও যেন পেল নতুন দিনের হাতছানি। ভোরের আকাশে উঁকি দিচ্ছে রক্তিম লাল সূর্য।

বিভিন্ন বয়সী লোক শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর করে তুললেন আকাশ বাতাস। তাদের কণ্ঠে তখন বজ্র ধ্বনি—জনতা-সিপাহী ভাই ভাই। জেলের তালা ভেঙেছি, জেনারেল জিয়াকে এনেছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিপাত যাক।

জনতা দুই হাত তুলে বিপ্লবী অভিবাদন জানালো তাদের প্রিয় সৈনিক ভাইদের। ইস্কাটন এলাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাত দুটো থেকে একজন দু'জন করে লোক জমতে শুরু করে রাস্তার মোড়ে। রাত তিনটেয় জনতায় ভরে উঠতে শুরু করে। আনন্দে উদ্বেল জোয়ানদের সাথে একাত্ম হয়ে যায় জনতা। শ্লোগান উঠে—বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ। সিপাহী- জনতা ভাই ভাই। জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ। জনতার আনন্দ চীৎকার আর ফাঁকা গুলীর আওয়াজ একাকার হয়ে যায়।

ফার্মগেট, তেঁজতরী বাজার, হাতিরপুল, সেন্ট্রাল রোড সর্বত্র সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সাথে মিশে যায়।

ভোরে রেডিওতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বীর নায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে চীফ মার্শাল 'ল' এডমিনিস্ট্রেটর এবং সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের খবর শোনার পর মোহাম্মদপুর রায়ের বাজার ধানমন্ডি এলাকার জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে মেতে ওঠে। পূর্বের আকাশ ফর্সা হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ী বীর সৈনিকেরা বাস ও ট্রাকে করে মিছিলে বের হলে মুক্তিপাগল মানুষও ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে তাদের সাথে যোগ দেন। মিছিলকারী সিপাহীদের জনগণ মুহুর্মুহু করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করেন। বাড়ির মেয়েরা আঙিনায়, বাড়ি ছাদে ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে বীর জোয়ানদের বিজয় মিছিলকে হাত তুলে অভিনন্দন জানান। তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সূর্য ওঠার সাথে সাথে রাস্তা মুক্তিপাগল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে ছেয়ে যায়। সিপাহীদের সাথে একই বাস ও ট্রাকে করে মিছিলে যোগ দেন। তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি দেন। বাং**লাদেশ জিন্দাবাদ**, সিপাহী জনতা ভাই ভাই, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ। **বীর সিপা**হীদের হাতের রাইফেল, মেশিনগানগুলো মুহূর্মুহূ গর্জে উঠে অধিকার বঞ্চিত মানুষের বিজয় বারতা ঘোষণা করে। এই অস্ত্রশস্ত্রের গর্জন কাউকে ভীত করেনি, যেন বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাস্তিলের কারাদুর্গ ভেদ করে শৃংখলিত মানুষ যেন শাশ্বত মুক্তির স্বাদ লাভ করেছে। মুক্তিকামী মানুষের বক্ষ থেকে যেন স্বৈরাচার স্বেচ্ছাচারের জগদ্দল পাথর নেমে গেছে। সিপাহীদের এই মিছিলে ছিল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, রাইফেল বাহিনী, পুলিশ এবং আনসার। তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছেন

www.nagorikpathagar.org

আনন্দ উল্লসিত মানুষ। শুক্রবার ভোর থেকেই মোহাম্মদপুর ধানমন্ডি এলাকায় চলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত উচ্ছল জনতার বিজয় মিছিল। এখন স্বাধীনতার মহোৎসব। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন পরম সার্থকতা খুজে পাচ্ছে। মিছিলে ট্যাংকও চলেছে। মুক্তিপাগল জনতা ও সিপাহীদের সশস্ত্র মিছিল চলার সময় কোথাও স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়নি। মুহূর্মহু গুলীর আওয়াজ বঞ্চিত মানুষের বিজয় ঘোষণা করেছে, বিভীষিকার সৃষ্টি করেনি। জনগণ সৈনিকদের সাথে আলিঙ্গন করেছেন। অস্ত্রশস্ত্রকে মনে করেছেন তাদের শাশ্বত মানবিক অধিকার রক্ষার হাতিয়ার। মুক্তিপাগল সৈনিক জনতার এ আনন্দস্রোত নিউমার্কেট, সায়েন্স লেবরেটরী, শাহবাগ এলাকায় এসে উর্মিমুখর জনতার মহাসমুদ্রে মিলিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ ঃ বাসসর খবর ঃ সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গতকাল ভোরের দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরে প্রবেশ করলে সর্বস্তরের লোক তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যর্থনা জানান। পথে পথে শুরু হয় আনন্দ মিছিল।

রাস্তার পাশে পাশে এবং আশপাশের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সিপাহী জনতার এই মিছিল দেখেন। নারায়ণগঞ্জে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর লোকজনও সিপাহী জনতার আনন্দ মিছিলে যোগ দেন।

মানিকগঞ্জে আনন্দ মিছিল

মানিকগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে—এই সংবাদ রেডিওতে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় খন্ড খন্ড আনন্দ মিছিল। মিছিলে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়।

আরিচা, মানিকগঞ্জ, ধামরাই, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সাভার থেকে ট্রাকযোগে আনুমানিক ৮ হাজার ছাত্র যুবক ও সামরিক বাহিনীর বীর জোয়ানরা দেশাত্মবোধক শ্লোগান দিয়ে ঢাকার দিকে যান।

আনন্দোৎসবে ২৪ জন আহত

(স্টাফ রিপোর্টার) ঃ শুক্রবার মিছিলের নগরী ঢাকায় ২৪ জন ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে এ খবর জানা গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আনন্দোৎসবে যোগ দিতে গিয়ে বাস ও ট্রাক দুর্ঘটনায়ও দশ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত কিছু কিছু ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

(দৈনিক বাংলা ঃ ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ঃ দুই

(কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকীয়)

ক। দৈনিক ইত্তেফাক

(শনিবার ২১ শে কার্তিক, ১৩৮২)

নব উথ্থান

'রাজনীতিতে শেষ কথা শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু মানবপ্রকৃতি মানুষের মতই স্টেবল বা স্থিতিশীল।' কথাটা বলিয়াছেন সমাজতত্ত্ববিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক গাইভার। এই কথার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে গতকাল শুক্রবার, দেশের বীর সিপাহী ও জনতার অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া। গতকাল শুক্রবার (৭ই নভেম্বর ১৯৭৫) প্রত্যুষে মেজর জেনালের এম. জিয়াউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল' এমনিটিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। দায়িত্বভার গ্রহণটির পর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে মেজর জেনারেল এম. জিয়াউর রহমান বলিয়াছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যদের অনুরোধে আমাকে চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' সর্বস্তরের জনগণের প্রতি একই ভাষণে মেজর জেনারেল এম. জিয়াউর রহমান স্ব স্ব স্থানে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহবান জানাইয়াছেন।

গতকল্য ৭ই নভেম্বর যে প্রভাতের সুচনা হইয়াছে তাহা ছিল দেশের বীর সিপাহী ও আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণঢালা আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখর। গত ৩রা নভেম্বরের এ্যাডভেঞ্চারিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পতনের সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজধানীর জনতা আনন্দকলরবে ছুটিয়া আসিয়াছে রাজপথে। দেখা গিয়াছে লরী ও ট্রাকের অন্তহীন মিছিল। শোনা গিয়াছে মোশতাক ও জিয়ার নামে ধ্বনি ও কণ্ঠবিদারী শ্লোগান। লরী ও ট্রাকের

www.nagorikpathagar.org

মিছিল বা জমায়েতের সর্বত্র পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অবস্থান করিয়াছেন বীর সিপাহী ও সাধারণ জনগণ। একই সাথে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। দেশ, দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের প্রতি সেনাবাহিনীসহ দেশের বিভিন্ন স্তরের জনগণ কতখানি যে সজাগ সচেতন, তাহা হর্ষোৎফুল্ল সৈনিক-জনতার কণ্ঠধ্বনিতে বার বার সমুদ্র-কল্লোলের মত মন্দ্রিত স্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে।

গতকল্যকার ঘটনায় কার্যতঃ ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা ও শিক্ষাই উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনগণের আস্থা ও সমর্থনই যে দেশের শাসন-ক্ষমতার একমাত্র সোপান, এই সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে বহুবারের মত আর একবার। প্রমাণিত হইয়াছে এই সত্যই যে, জনতার অধিকার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবনের পথে বা কোন চক্রান্তই অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা করুক, তাহা শেষপর্যন্ত নস্যাৎ হইয়া যাইবেই। গত ১৫ আগস্ট তারিখে নবপরিবর্তনের ধারায় মোশতাক আহমদের সরকার জনগণের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে যে কার্যসূচী ঘোষণা করেন, গতকল্যকার সৈনিক–জনতার বিশাল ব্যাপক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উহার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও আস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

গতকল্যকার বীর সৈনিক ও জনতার অভ্যুত্থানকে বিবেচনা করিতে হইবে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামী ইতিহাসের আলোকে এবং নিতে হইবে সেই ইতিহাস হইতে শিক্ষা। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাদ দিয়া তাহাদের অধিকারের কথা চিন্তা না করিয়া, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি কোনটাই হইতে পারেনা। মানুষ লইয়াই দেশ এবং মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ চেষ্টার মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠে দেশের সার্বভৌম আত্মা। এই হিসাব ও বিবেচনার এতটুকু ব্যত্যয়, এতটুকু বিচ্যুতি ঘটিলেই অনিবার্যভাবে দেখা যেত জনতার রোষবহ্নি ও প্রতিরোধ শক্তি। সময় আপন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, সাথে সাথে বহিয়া চলিয়াছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারাও। যেকোন দেশের উত্থান ও পতনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যেরই প্রতিফলন দেখা যায়। গতকল্যকার সৈনিক-জনতার বিশাল-ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পতন হইয়াছে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা। এই ঘোষণা এখন যথোচিত ব্যবস্থা ও কার্যসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হইবে। জাগ্রত করিতে হইবে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর দায়িত্ববোধ।

গতকল্যকার উত্থানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সৈনিক জনতা জনাব মোশতাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি যে প্রত্যাশা, আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করিয়াছেন উহা ইতিহাসের এক নজিরবিহীন অধ্যায়। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সৈনিক জনতার এই রায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

www.nagorikpathagar.org

খ। দৈনিক ইত্তেফাক

(রবিবার ঃ ২২ শে কার্তিক, ১৩৮২)

নবযাত্রা শুরু

গত শুক্রবার সেনাবাহিনী ও জনগণের সম্মিলিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থায় ও জাতীয় পরিস্থিতিতে যে পটপরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এক কথায় ঐতিহাসিক।

সিপাহী-জনতা নির্বিশেষে দেশবাসী কি চায়, গত শুক্রবারের সম্মিলিত অভ্যুত্থানে তাহা আর একবার পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষায়, —এই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীয় সত্তার সব অর্জিত মহিমা সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, স্বতঃস্ফূর্ত গণদাবী সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও খন্দকার মোশতাক আহমদ পুনরায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যিনি সম্পূর্ণ নির্দলীয় এবং অরাজনৈতিক। এই কারণেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনরত প্রেসিডেন্ট সায়েমকেই তাঁহার জাতীয় দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এদিকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানও প্রধান সামরিক আইনে প্রশাসকের পদ ছাড়িয়া দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে অপর দুইজন বাহিনী প্রধানের সহিত অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদ গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়া দেশবাসীর স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আদর্শিক নিষ্ঠা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে। আরেকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, এডভাঞ্চারীজমের হঠকারিতা নয়, বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশবাসী দেশ শাসনের অধিকার চায়। তাহারা চায়, কাহারও লেজুড়বৃত্তি না করিয়া স্বকীয় আদর্শের উজ্জ্বল আলোকে জগৎসভায় নিজস্ব ভূমিকা পালন করিতে।

কথায় বলে, সঙ্কটের সময়ে ব্যক্তির মত জাতিরও সঠিক পরিচয় ধরা পড়ে। আমাদের মতে, সিপাহী-জনতার সাম্প্রতিক, বিপ্লব-অভ্যুত্থানে বাঙালী জাতির যে পরিচয় সমুদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা জাতীয় সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিপাহী-জনতার এই অভ্যুত্থান প্রমাণ করিয়াছে, যে কোন হুমকির মুখে জাগ্রত জনতা তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম। আমাদের স্থির বিশ্বাস, বর্তমানের এই আদর্শনিষ্ঠ আবেগ, মোহমুক্ত মানসিকতা এবং প্রাণচাঞ্চল্যের কর্মধারা যদি আমরা সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে অব্যাহত রাখিতে পারি, তবে, জাতীয় ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা হইয়া দেখা দিতে পারিবে না, কোন সংকটই চলার পথের এই উদ্যমগতিকে রোধ করিতে পারিবে না। এ জন্যই প্রয়োজন আজ নিয়ম শৃংখলার, প্রয়োজন আজ ঐক্য ও সংহতির এবং

www.nagorikpathagar.org

সর্বোপরি প্রয়োজন আজ জাতীয় জীবনের ঈমান-সমৃদ্ধ অটুট মনোবলের। অতীতে খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারকে ঘরে ও বাহিরে অনেক অসুবিধা ও সংকটের মধ্য দিয়া পথ চলিতে হইয়াছে। বর্তমানেও সেসব সঙ্কট ও অসুবিধা-বাধা এবং বিপত্তি যে একেবারে অপসারিত হইয়াছে, তাহা নয়। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট সায়েমের এই নির্দলীয় অরাজনৈতিক- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সঙ্কট ও বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাহা বাস্তবায়নের পথে আভ্যন্তরীণ অনেক অসুবিধাই কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমান সরকার অরাজনৈতিক নির্দলীয় হইলেও এই পথযাত্রায় গোটা জাতিকেই পরিচয় দিতে হইবে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার। দেশের শাসন ব্যবস্থায় যাহারা রহিয়াছেন এবং থাকিবেন, তাহাদিগকে পরিচয় দিতে হইবে রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টির, বিচারকসুলভ ন্যায় পরায়ণতার এবং গণমুখী ভূমিকার। বলা বাহুল্য, শাসক ও শাসিতের- সারকার ও জনগণের এই উভয়বিধ ভূমিকাই জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করার দাবীদার। এই পর্যায়ে, দেশের শাসকমন্ডলীর মধ্যে যে ঐক্য, যে সমঝোতা এবং যে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, জাতীয় জীবনে উহার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটাইতে হইবে। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি জওয়ানকে স্ব-স্ব কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদও বিপ্লবের ফলে সমুদ্ভাসিত জাতীয় সত্তার মহিমাকে কর্ম-প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ, সংগঠিত এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করার আহ্বান জানাইয়াছেন। আর প্রেসিডেন্ট সায়েম বলিয়াছেন, সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সর্বশ্রেণীর জনগণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমরা আনন্দিত যে, আমাদের জোয়ান ভাইয়েরা সেনাবাহিনী প্রধানের আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমরা আশান্বিত যে, নব বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী স্ব-স্ব কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং আদর্শনিষ্ঠ ও অধিকার সচেতন জনগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে নব উদ্দীপনার সহিত কাজ-কর্ম করিয়া চলিয়াছেন। একথা সত্য যে, দেশের সাধারণ মানুষের মত আমাদের সেনা, বিডিআর, পুলিশ বাহিনীর নানা রকম সমস্যা রহিয়াছে। রহিয়াছে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবস্থারও অন্যবিধ সমস্যা। আমরা আশা করিব, সরকার সীমিত সাধ্যের মধ্যেও সহানুভূতির সহিত উহা সমাধানের চেষ্টা করিবেন।

আমরা আগেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি, ইতিহাস বারে বারেই জাতিকে সঙ্কট সন্ধিক্ষণে নিপতিত করিয়াছে। বারে বারেই এ জাতি নবউদ্দীপনায় নব প্রাণ-সঞ্জীবনী ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এবারেও প্রমাণিত হইয়াছে, উদ্বুদ্ধ এই প্রাণশক্তিকে অবদমিত করার সাধ্য কাহারও নাই। তাই স্বার্থান্বেষী চক্রের সকল পাঁয়তারা নস্যাৎ করিয়া জাতীয় আশা-আকাঙ ক্ষা পূরণের স্বার্থে সর্বস্তরে রক্ষা করিতে হইবে শান্তি, শৃঙ্খলা সেসব সঙ্কট ও অসুবিধা এবং একতা।

www.nagorikpathagar.org

গ। দৈনিক ইত্তেফাক

(সোমবার ঃ ২৩ শে কার্তিক, ১৩৮২)

'স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা' ....

বনের পাখীর দুঃখ খাঁচার পাখী বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু বনের পাখীর মুক্ত জীবনের আনন্দ খাঁচার পাখীর বুঝার আওতার বাহিরে। কথাটা 'রিটোরিক' বা নিছক আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রসূত বলিয়া বোধ হইতে পারে, তবু স্বীকার করিতে হয় জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই আবেগ-উচ্ছ্বাসটুকুই পরম সত্য। যেকোন দেশের যেকোন জাতির সবচাইতে বাঞ্ছিত ধন যাহা তাহা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বাঙালী কবির প্রশ্ন ছিল, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?' ইতিহাস ঘাঁটিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলে দেখিতে পাই যাঁহারা আত্মসম্ভ্রমহীন, যাহাদের মনুষ্যত্ববোধের অভাব, শুধু তাঁহারাই স্বাধীনতা হেন পরম ধনের মূল্য দেয় নাই। তাহার স্বাভাবিক পরিণতিলাভ ঘটিয়াছে ইতিহাসের উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিস্মৃতিতে। অপরপক্ষে গাঁহারা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, সাত পুরুষের বহমান জীবনধারা, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা যাঁহাদের জীবনবোধ, মমত্ববোধ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের অংশ, তাঁহারা জাতি হিসাবে ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ের অধিকারী। শত বাধাবিপত্তি, হাজার প্রতিকূলতা ও অন্তরায়ের মধ্যেও যাঁহারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ রক্তধমনীর প্রবাহে অনুভব করিয়াছেন, এই পবিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির জন্য অকুণ্ঠচিত্তে সবকিছু বিসর্জন দিয়াছে, তাঁহাদের কেহ বা কোনকিছুই পরাজিত করিতে পারে নাই। না কোন বহিঃশত্রু, না কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। যেকোন দেশ, যেকোন জাতি একটি অনন্য সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া এক ও অভিন্ন কণ্ঠে সোচ্চার করিয়া তুলিতে পারে এবং সেই সূত্রটির নাম জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

বাংলাদেশ হয়ত দরিদ্র দেশ। উন্নয়নশীল দেশ। শতাব্দীর নানা শোষণ ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় বহুবিধ সমস্যা এখানে জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এই দেশ, এই জাতি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও কীর্তির অধিকারী। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এই জাতি কখনো আপোষ করিতে শিখে নাই। এই দেশের গহীন নদী, নীল বিস্তৃত আকাশ, বৈচিত্র্যময় নিসর্গের মতই স্বাধীনতা এই জাতির প্রিয় উচ্চারণ, বহু বাঞ্ছিত প্রাণের ধন। বার বার হায়েনারা এই দেশের উপর লোভ-লালসার চকচকে সবুজ চোখ রাখিয়াছে। এই জাতি কখনো হায়েনাদের বিরুদ্ধে একমন একপ্রাণ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে নাই। এই জাতির বহমান ইতিহাসের ধারায় সাময়িক ব্যর্থতা হয়ত আছে, দুনিয়ার কোন্ জাতির ইতিহাসেই বা তাহা নাই, দুঃখ-দুর্ভোগের চিহ্নও হয়ত

www.nagorikpathagar.org

আছে, কিন্তু নাই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিচ্যুতিজনিত গ্লানি বা অপমানের কালিমা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে দেশ-প্রাণ জাতি সকল সময়ই নিজেদের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ, স্বার্থচিন্তা, আত্মকলহ ও পারস্পরিক হানাহানি ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, পর্বতের ন্যায় অটল ও বজ্রের ন্যায় তীব্র কঠোর হইয়াছে। ইহা জাতি হিসাবে আমাদের গর্বের বিষয়।

গত ৭ নভেম্বরের সুপ্রভাতে সৈনিক-জনতার বিশাল-ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে যে বক্তব্যটি পুনরায় কম্বুনাদে মুখরিত হইয়াছে, তাহা আর কিছু নহে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বেগ-বিস্তারি ঘোষণা। যেকোন বাধা আসুক, যে কোন প্রতিকূলতা দেখা দিক, হায়েনার নখরে যত শক্তিই থাকুক, জাগ্রত জনতা সেইসবের পরোয়া করে না, —ইহাই ৭ নভেম্বরের অনন্য অভ্যুত্থানের বক্তব্য। দেশে বর্তমানে বিরাজমান সাময়িক বিভ্রান্তি ইত্যাদি হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী কোন শক্তি বা মহল যদি মনে করেন যে আভ্যন্তরীণ শাঠ্যষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাইয়া ইহার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করার ইহাই মোক্ষম সময়—আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাহাদের জানাইয়া দিতে চাই যে, তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে। কারণ, বাঙালীরা শুধু স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিতেই জানে না উহাকে রক্ষা করিতেও জানে।

ঘ। সংবাদ

(ঢাকা শনিবার ঃ ২১ শে কার্তিক, ১৩৮২)

মুক্তি সংগ্রামের অগ্রনায়কের অগ্রণী ভূমিকা

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর অগ্রনায়ক জিয়াউর রহমান জাতির এক সংকট সময়ে এগিয়ে এসেছেন। অনিশ্চয়তা ও দিশেহারা জাতির জীবনে সঠিক পথনির্দেশের সুস্থ ও সুস্পষ্ট কর্মধারার ভিত্তি রচনার সুকঠিন ও মহান দায়িত্ব পালনে তাঁর সময়োচিত প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা জাতিকে সঙ্কট উত্তরণের পথনির্দেশ দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসারসহ সকলের অনুরোধে পূর্বাহ্নে মেজর জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও চীফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্বভার সাময়িকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সংকট মুহূর্তে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সাথে প্রশাসন কাঠামোতে স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভূমিকা ও অবদান পালনে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধান্বিত ছিলেন না। জনতার ভালবাসায় ও অভিনন্দনে সিক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক সেনানী হিসেবে তিনি মুহূর্তের জন্যও ক্ষমতাগর্বে আত্মহারা হননি।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের মানুষের মনে মেজর জেনারেল জিয়ার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। একাত্তরের পঁচিশে মার্চে জাতির হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ার পর ২৬শে মার্চের প্রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে জাতির অন্তরে সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছিল। অকুতোভয় সেনানী সেদিনই সর্বপ্রথম উদাত্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশের মানুষ বাংলার দেশপ্রেমিক বীর সৈনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় মুক্তি অর্জন করেছে। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়ার সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামী ভূমিকা চির অম্লান হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে ঘোষিত পদক্ষেপ থেকে একথাই আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণ সাধনে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্তই জনগণকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করে। গতকাল বেতারে জাতির উদ্দেশে খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষণ দেশে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক সুস্থ পরিবেশের পটভূমি রচনা করেছে। পুনরায় প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা এদেশের মানুষের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে।

বাংলাদেশের অশান্তিক্লিষ্ট মানুষের কাছে শান্তিই আজ সবচেয়ে বেশী কাম্য। এই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ সকল মেহনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সমস্ত পর্যায়ের মানুষের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার।

৬। দৈনিক বাংলা

(৮ নভেম্বর, ১৯৭৫)

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

শুক্রবার এক ঐতিহাসিক, অভূতপূর্ব বিপ্লব সূচিত হলো জাতির জীবনে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর নায়ক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অপার সাফল্যে জয়যুক্ত সিপাহী-জনতার মিলিত এই বিপ্লব। সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণের ইচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্বের সঙ্গে সাময়িকভাবে প্রধান সামরিক শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল জিয়া। দেশের আপামর মানুষের সঙ্গে ঐতিহাসিক এই বিপ্লবী অভিযাত্রীর শরিক সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং আনসার বাহিনী। সিপাহী এবং জনতার এমন অভেদ্য, নিচ্ছিদ্র ঐক্য তুলনাহীন। মুক্তিসংগ্রামকালীন দিনের সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলির সঙ্গেই শুধু এর তুলনা চলে।

www.nagorikpathagar.org

রাজধানী ঢাকার রাজপথ শুক্রবারের প্রথম কাকডাকা ভোরে প্রত্যক্ষ করেছে অনন্য, অতুলনীয় এক দৃশ্য। রাস্তায় রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্ত গণমিছিল, সিপাহীদের সঙ্গে জনতার মিলিত উল্লাস, জয়ধ্বনির উল্লাস, আনন্দের কলকল্লোল। কণ্ঠে উচ্চারিত নিনাদ ঃ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। অভিন্ন একটি আবেগে, দেশপ্রেমের একাগ্র একটি অনুভূতিতে উদ্বেলিত সমগ্র রাজধানী নগরী—গোটাদেশ। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের স্পর্শে একাত্ম হয়েছে সৈনিক এবং জনগণ। যে ঐক্য আকীর্ণ হয়েছিল এতদিন সংশয়ে তাকে আবার অবিনাশী সত্যে প্রতিষ্ঠিত করলো সেই জাগ্রত চেতনা যার নাম স্বাধীনতা। যার নাম দেশপ্রেম। জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তির এই নব উত্থান, তার বৈপ্লবিক সত্তার এই উদ্বোধন আবার প্রমাণ রাখলো, বাঙালী জাতির স্বাধীনতাকে খর্বিত করার সাধ্য নেই কোন চক্রান্তের, দেশীবিদেশী কোন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবুদ্ধির। কারো ক্ষমতা নেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে আঘাত করার, দুর্বল করার।

ছয়ই নভেম্বরের মধ্যরাত্রির ঘন তমিস্রা ভেদ করে দেশপ্রেমিক সৈনিকদের অকুতোভয় অভিযাত্রা নিষ্কম্প এই প্রত্যয়ের অবিচল, এই অঙ্গীকারের ঘোষণাই রেখেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী এই জাতির সামনে। ঘোষণা রেখেছে তাবৎ বিশ্ববাসীর কাছে। যে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিভ্রান্তির কয়েকটি ঘন্টা অতিক্রম করছিল দেশবাসী বিনিদ্র একটি রাত জেগে তার অবসান কামনার প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুখ উৎকর্ণ হয়েছিল তারা। সেই প্রতীক্ষার শেষ হলো প্রভাতের আলোর বিচ্ছুরণে আকস্মিক অন্ধকারের ঘোর কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাজপথে তখন স্বাধীনতার অতন্দ্র সিপাহীদের বিজয় পদধ্বনি। সেই বিজয়কে নন্দিত করার জন্যে মুহূর্তে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলো অগণিত নরনারী। রাজপথ হলো উদ্বেলিত একটি জনসমুদ্র, সারা শহর ক্লান্তিহীন মিছিল নগরী। বিজয় তোপধ্বনির সঙ্গে প্রভাতের বাতাসে সাড়া জাগালো জনতার উল্লাসধ্বনি। অজস্র কণ্ঠের কল্লোলে, প্রত্যাশায় সচকিত নিনাদে ছিন্নভিন্ন হলো সেই তমসা, যা হঠাৎ জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এক আশাহত বিমূঢ়তায়। শুক্রবারের নির্মেঘ আকাশ এবং নতুন সূর্যরশ্মিখচিত উজ্জ্বল প্রভাত আবার ছিনিয়ে আনলো জাতির পরাভবহীন বিশ্বাসকে। ছিনিয়ে আনলো তার অনিবার আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং আত্মচেতনার সুতীক্ষ্ণ বোধকে।

বিভেদ এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি আজ পরাভূত। সংশয় এবং আচ্ছন্নতার কুটিল মেঘ আলোকিত আকাশ থেকে নিষ্ক্রান্ত। তা হলেও আত্মতুষ্ট হলে চলবেনা কাউকেই। অতীতের ভ্রান্তির সর্বনাশা পরিণাম থেকে নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন শপথ নিতে হবে ঐক্যের এই প্রেরণাকে নিয়ত জাগ্রত রাখতে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিভেদের

www.nagorikpathagar.org

শক্তি কোনো দুর্বলতার ছিদ্রপথে আর মাথাচড়া দিয়ে উঠতে না পারে। অসামান্য দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিতে হবে এই মুহূর্তে প্রতিটি দেশপ্রেমিককে, প্রতিটি নরনারীকে। এবং গোটা জাতিকে। সুখী সমৃদ্ধ এবং সুস্থ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের সংগ্রামের চিহ্নিত লক্ষ্য। অবিচল আস্থা নিয়ে সেই লক্ষ্যের পথে আমাদের পা বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে এই জাতির অজেয় শক্তির উৎস হলো তার অচ্ছেদ্য জাতীয় ঐক্য এবং দেশপ্রেম। তার রক্ষাকবচ হলো স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব।

সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব, তাদের মিলিত কণ্ঠের বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি এই বিশ্বাসকেই আজ সবকিছুর উপর বড় করে তুলে ধরেছে। এই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষাই আমাদের সকলের, দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী এবং জনগণের সুমহান দায়িত্ব। বাংলাদেশ চিরঞ্জীব তার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সকল অভিঘাতের উর্ধ্বে। অনাগত যুগে যুগে ধ্রুব এই সত্য থেকেই অনুপ্রাণিত এবং বলীয়ান হবে বাঙালী জাতি। সৈনিক-জনতার ঐক্য অমোঘ হোক। অমর হোক।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ঃ তিন (কয়েকটি প্রচারপত্র)

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি দিবস পালন করুন

স্বাধীন বাংলাদেশের জনক সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালীর অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আর আমাদের মাঝে নেই। গত ১৫ই আগস্ট সূর্য উঠার আগেই বঙ্গবন্ধু এবং তাঁহার পরিবারের সকলকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অসহায় শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আজ স্তম্ভিত, শোকাহত। সারা বিশ্বের সকল বিবেকবান মানবতাবাদী মানুষ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হইয়া গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী জাতির দীর্ঘদিনের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিক ও পথ প্রদর্শক। তাঁহার আহ্বানেই লক্ষ লক্ষ বাঙালী সন্তান মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে মহান স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের নামের সহিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম তাই অবিভাজ্য।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই দেশের দুঃখী মানুষের অতি আপন জন। তিনি সবসময় বাংলার শোষিত, বঞ্চিত, গরীব দুঃখী মানুষের পক্ষে কথা বলিতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন বাংলাদেশ একটি আত্মনির্ভরশীল সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে গড়িয়া উঠুক। আমাদের জাতির নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালীকে বিশ্বে এক গৌরবদীপ্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমরা জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগামী ৪ঠা নভেম্বর "বঙ্গবন্ধু স্মৃতি দিবস" পালনের আহ্বান জানাইতেছি। বাঙ্গালীর অস্তিত্বের সহিত একাত্ম বাংলার আপামর জনতা, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, উকিল, ডাক্তার, সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারী তথা সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষকে ঐ দিন মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গমন করিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের জন্য আহ্বান জানাইতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মশক্তিতে বাঙ্গালীকে জাগাইয়া তুলিবার কাজে এই আজীবন সংগ্রামী নেতার অবদানের কথা স্মরণ করিয়া আসুন, প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয়মথিত ক্রন্দনের অভিব্যক্তি স্বরূপ তাঁহার স্মৃতিতে আমরা আমাদের শোক প্রকাশ করি।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী:

৪ঠা নভেম্বর, মঙ্গলবার
সকাল দশটার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় মিলিত হইয়া সেখান হইতে মৌনভাবে ৩২ নং ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গমন ও শ্রদ্ধানিবেদন।

জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু !!

সংগ্রামী ছাত্র সমাজ

www.nagorikpathagar.org

কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-বুদ্ধিজীবি-দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ও বীর সিপাহী এক হউন

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও জনতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়

জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন

সংগ্রামী দেশবাসী

ও

বীর সিপাহী ভাইয়েরা,

৭ই নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জল দিন। এই দিন সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমীক বীর সেপাহী ভাইয়েরা জনতার সাথে একাত্ম হয়ে সূচনা করেছিল এক সুমহান অভ্যুত্থানের। এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে ভারত-রাশিয়া ও আমেরিকার প্রভাব ও কতৃত্ব থেকে মুক্ত করা এবং কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ও সিপাহী তথা সমগ্র জনতার জন্য একটি সুখী সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। তাদের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সমগ্র জনতার লৌহদৃঢ় জঙ্গী ঐক্য। বস্তুতঃ এই মুহূর্তে বিদেশী শত্রু এবং মুষ্টিমেয় দেশী রক্তশোষকদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন লড়াই পরিচালনার শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের জাতীয় ঐক্য। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, ভারত-রাশিয়া-আমেরিকা প্রমুখ সকল বৈদেশিক শক্তি বিশেষ করে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী আমাদের জাতীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিজয় অভিযানকে নস্যাৎ করার জন্য সুকৌশলে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে ও যাবে।

বীর সিপাহী ভাইয়েরা,

আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর মধ্যেও তারা সুকৌশলে নানা শ্লোগানের আড়ালে বিভেদের বীজ বপন করে চলেছে। অফিসার বনাম বীর সিপাহী, মুক্তিযোদ্ধা বনাম অ-মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি ধুয়া তুলে আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে বিভক্ত, বিপর্য্যস্থ ও পঙ্গু করে দিয়ে বিদেশী শত্রুদের আগ্রাসন ও সাবোতাজ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে চায়। বীর সিপাহী ভাইয়েরা নিশ্চয়ই এ কথা জানেন যে, মুষ্টিমেয় কিছু অফিসার বিদেশী শক্তির ভাড়াটিয়া দালাল হিসাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু সকল অফিসার ঐতিহাসিক কারণেই দেশদ্রোহী বা গণবিরোধী হতে পারে না। তাই সকল অফিসারই দেশদ্রোহী এই শ্লোগান তুলে আমাদের শত্রুরা বীর সিপাহীদের নেতৃত্ব বিহীন করে তুলে তাদের সুদুর-প্রসারী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চায়। আমাদের ভুললে চলবে না যে, কি সাধারণ সেনাবাহিনী, কি বিপ্লবী সেনাবাহিনী সর্বত্রই নেতৃত্বের প্রয়োজন। তবে আমরা মনে করি, সেই নেতৃত্বকে হতে হবে প্রগতিশীল, আদর্শবাদী ও গণতন্ত্রমনা। নেতৃত্ব ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে রচিত হবে, আবার অন্যদিকে তা হবে বন্ধুত্বমূলক-প্রভুত্বমূলক নয়। তাই এই মুহূর্তেই সেনাবাহিনীর বীর সিপাহীদের একদিকে নেতৃত্বকে সম্মুখে রেখে নিজেদের সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে হবে, আবার সাধারণ সৈনিকদের প্রতি নেতৃত্বকে পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বন্ধুত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে ক্রমান্বয়ে বীর সিপাহীদের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী শক্তিশালী, জাতীয় সেনাবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাই।

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

www.nagorikpathagar.org

দেশবাসী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

জাতীয় জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা এখনও কাটেনি। আমাদের মনে রাখতে হবে: (ক) ভারত-রুশ শাসকচক্র ও তার দালালরা এখনও তৎপর। সিপাহী ও জনতার অসংগঠিত অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তারা সবোতাজ, ষড়যন্ত্র, এমনকি আক্রমণ দ্বারা সিপাহী ও জনগণের বিজয়াভিযানকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। (খ) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একইভাবে তৎপর। ঘোলাপানিতে তারাও মাছ শিকার করতে চায়, ব্যবহার করতে চায় জনতার দেশপ্রেমকে, ব্যবহার করতে চায় বীর সিপাহীদের অভ্যুত্থানকে। ইতিহাসের চাকাকে পিছে ঠেলে দিয়ে উল্টে দিতে চায় প্রগতির ধারাকে।

তাই আজ একদিকে বৈদেশিক হামলার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে জনতার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের দাবীতে সকল দেশপ্রেমিক, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে—সকল দলীয় সংকীর্ণতাবাদের উর্ধে উঠে গড়ে তুলতে হবে জাতীয় ঐক্য। এই জন্য শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষকে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে প্রতিটি এলাকায় সংগঠিত হতে হবে ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল ও সংগঠিত হ'তে হবে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে। জাতীয় স্বার্থেই ঐক্যের সেতু রচনা করতে হবে বীর সিপাহী ও জনগণের মধ্যে। জাতীয় ঐক্যের বিভেদাত্মক শক্তিকে জাতীয় দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে, রাজনৈতিকভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে এবং হানতে হবে চূড়ান্ত আঘাত। জনতার বিজয় অনিবার্য।

- স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের লড়াই চলছে—চলবে।
- জনতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে—চলবে।
- শ্রমিক-কৃষক সৈনিক-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবি-দেশপ্রেমিক জনতার ঐক্য জিন্দাবাদ।
- স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

১১ই নভেম্বর '৭৫

ইউনাইটেড পিপলস পার্টি

(ইউ, পি, পি)

www.nagorikpathagar.org

সাবাস বীর সিপাহী ! সাবাস বীর জনতা !
জাতীয় ঐক্য জোরদার করুন
বৈদেশিক হামলার চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

দেশবাসী-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং বীর সিপাহী ভাইয়েরা,

৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে জনগণের দৃঢ় সংগ্রামী মেজাজের আরেকটি জলন্ত নজীর। মুজিবী নেতৃত্বের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিস্ট কার্য্যকলাপ, এবং সম্প্রতি রুশ-ভারত শাসকচক্রের দালালদের ঘৃণ্য অপচেষ্টা কোনটাই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের অবিচল আস্থাকে দুর্বল করতে পারেনি। সাবাস বীর সিপাহী! সাবাস বীর জনগণ! জনগণের আশা আকাংখাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজ আপনারা সূচনা করেছেন এক সুমহান অভ্যুত্থানের।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

আজ আমাদের সমস্ত ঘটনাকে আগপাছ তলিয়ে দেখতে হবে। ১৫ই আগষ্টের ঘটনার পর যে বিপদ সমূহ জনগনের সামনে এসে দাড়ায় তা হোল (ক) মুজিবী প্রেতাত্মার পূণঃ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ভারত-রুশ চক্রের হস্তক্ষেপ ও আধিপত্যের দরজা খুলে দেওয়া। (খ) সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরুত্থানের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে বাস্তবায়িত করা।

ভারত-রুশ-মার্কিনী চক্রান্তই এদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামকে বার বার বিপথে নিতে চাচ্ছে। তাদের সংগঠিত দালালদের সাহায্যে অসংগঠিত জনগণকে আরেকটি ভুলে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এই ভুলেরই মাশুল আমরা গত সাড়ে তিন বছরে দিয়েছি। আজিকার সিপাহী বিপ্লবের পূর্বের দিনগুলিতে সেই ভুলের চরম মাশুল দেওয়ার পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম।

বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বীর সিপাহী - বীর জনগণ আমাদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করার পথে এগিয়ে এসেছেন। এই জন্য বীর সিপাহীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমরা বলতে চাই আপনারা হুশিয়ার থাকুন যাতে স্বতঃস্ফূর্ততার চোরাবালিতে আবার এতবড় বলিষ্ঠ কার্যক্রম যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে: (ক) ভারত-রুশ শাসকচক্র ও তার দালালরা এখনও তৎপর। সিপাহী জনতার অসংগঠিত অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তারা ষড়যন্ত্র, সাবোতাজ এমনকি আক্রমন দ্বারা সিপাহী ও জনগণের বিজয় অভিযানকে নস্যাৎ করে দিতে পারে (খ) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একইভাবে তৎপর। ঘোলা পানিতে তারাও মাছ শিকার করতে চায়, ব্যবহার করতে চায় জনতার দেশপ্রেমকে, ব্যবহার করতে চায় বীর সিপাহীদের ঐতিহাসিক অভ্যুথানকে।

ইতিমধ্যেই সুযোগসন্ধানীরা তৎপর হয়েছে। যেখানে আজ বৈদেশিক হামলার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্য ও সংগঠিত শক্তির প্রয়োজন সেখানে সুকৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জাতীয় ঐক্যের এই বিভক্তি যে কোন শ্লোগানের আড়ালে আসুক না কেন তা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকেই বিপদগ্রস্ত করে তুলবে।

www.nagorikpathagar.org

বীর সিপাহী! বীর জনতা!

আজকের এই মুহূর্তের করনীয়:—বৈদেশিক হামলা বিশেষ করে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির সম্ভাব্য আগ্রাসন, ষড়যন্ত্র ও সাবোতাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ও ব্যাপক ঐক্যগড়ে তোলা। এই ঐক্য হবে শ্রমিক কৃষক সিপাহী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি তথা সকল দেশপ্রেমিক জনগণের জাতীয় ঐক্য। এর বিরুদ্ধবাদীদের জাতীয় দুষমন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এবং যেকোন মূল্যের বিনিময়ে রুখতে হবে।

শ্রমিক কৃষক ও তাদেরই সন্তান সিপাহী এবং মধ্যবিত্ত তথা ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতেই এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বৈদেশিক হামলা বা জাতীয় শত্রুকে কে রুখতে পারে? সাধারণ সৈনিক ও মেহনতি জনগণই তাকে রুখতে পারে। তাই জাতীয় স্বার্থে সিপাহী জনগণের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের করনীয়। আমরা জানি যুগ যুগ ব্যাপী মেহনতী মানুষের সন্তান সিপাহীদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি স্বীয় স্বার্থে কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করেছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে সামাজিক, ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সেনাবিভাগে নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। শ্রমিক কৃষক জনতার নূন্যতম গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দাবীসমূহকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটা আমাদের আজকের মূহুর্তের বিপ্লবী কর্তব্য।

বীর সিপাই ভাইয়েরা,

আপনারা এই পরিবর্তন অভিমুখে মহান অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছেন। তাকে এগিয়ে নিতে হলে নিজেদেরকে নিজ নিজ এলাকায় শৃঙ্খলার সাথে সংগঠিত হতে হবে এবং দেশব্যাপী শ্রমিক কৃষক জনতার সাথে মিলেও সংগঠিত সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জনতার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে পরাস্ত করার জন্য এখনই জনগণকে রাজনৈতিক ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। জনগণ ও বীর সিপাহীদের এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যাতে স্বাধীন সার্বভোম ও জনতার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম করার লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে বর্তমান অভ্যুত্থানকে গণবিপ্লবে পরিণত করা যায়।

সিপাহী-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবি-জনতা,

বীর সিপাহী বীর জনগণের সংগঠিত ও সংগ্রামী ঐক্য দৃঢ় করুণ। জাতীয় ঐক্যকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করুন। জাতীয় ঐক্যের সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত্রুদের চিহ্নিত করুণ, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করুণ ও রুখে দাড়ান। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরুণ। ভারত-রুশ-মার্কিন চক্রান্ত ব্যর্থ করুণ। জনতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

ইউনাইটেড পিপলস পার্টি

১ই নভেম্বর '৭৫ (ইউ পি পি)

www.nagorikpathagar.org

৭ই নভেম্বরের সিপাহী অভ্যুত্থান

শাসক শোষকদের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছে

যে কোন দেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী (ধনিক শ্রেণী এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্টির প্রতিনিধি) নিজেদের স্বার্থের প্রশ্নে কয়েকভাগে বিভক্ত থাকে। ক্ষমতার কোন্দলে লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তারা একদিকে দেশে পুঁজিবাদ অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীকে আরও ধনশালী করার নীতি কায়েম করার মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক-মধ্যবিত্ত অর্থাৎ জনতার বৃহৎ অংশকে শোষণ করে; অন্যদিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যে কোন বিদেশী শক্তি বা কয়েকটি শক্তির সংগে আপোষ করে। আর্থিক উন্নয়নের নামে সামরিক ও বিভিন্ন ধরণের বিদেশী সাহায্য নিয়ে তারা গোটা দেশকে বিদেশীদের কাছে বাঁধা রাখে এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের সংগে আপোষ ও দহরম মহরম করে। বর্তমান বিশ্বে কোন বুর্জোয়াই সম্পুর্ণ স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে না। বুর্জোয়ারা দুইমুখী চরিত্র নিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং সমাজে অবস্থান করে। একদিকে তারা জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ জাতির অগ্রগতির নামে ধনিক শ্রেণীর শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদ কায়েম করে এবং অন্যদিকে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনে অর্থাৎ দেশের সমাজতান্ত্রিক শক্তি (শ্রমিক কৃষক-জনতার সম্মিলিত শক্তি)কে ঠেকানোর জন্য যে কোন বিদেশী শক্তির সংগে (যেমন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, সংশোধনবাদী রাশিয়া ও আধিপত্যবাদী ভারত) আপোষ করে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী কখনো স্বাধীনতার নামে, কখনো ধর্মের নামে, কখনো রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখণ্ডতার নামে, এমনকি লোক দেখানো সমাজতন্ত্র (?) ও বিপ্লব (?) এর দোহাই দিয়েও ক্ষমতার মসনদে বসে ধনিক ও আমলাগোষ্টির স্বার্থরক্ষা করে এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ বৃহত্তর জনতাকে শোষণ করে। এজন্য বুর্জোয়ারা মাঝে মাঝে শাসনপদ্ধতিও বদল করে; সংসদীয় গণতন্ত্রে কাজ না হলে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু করে এবং কখনো একদলীয় শাসন আবার কখনো মিলিটারী শাসনের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সব পদ্ধতির পেছনেই এদের এক উদ্দেশ্য—তা হলো শোষণ, আরও বেশী শোষণ। মুখে এদের 'গণতন্ত্র' আর 'জনকল্যাণ'-এর বড় বড় কথা এবং 'সাম্য' 'মৈত্রী' 'স্বাধীনতা' ইত্যাদির মুখরোচক বুলি। অথচ বাস্তবে এরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হয় অক্ষম, এরা চরম মুহুর্তেও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ব্যস্ত থাকে, আগ্রাসনকারী দেশের সংগে আপোষ রফা করে নতুবা এক সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে লোক দেখানো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে গিয়ে দেশকে অন্য এক সাম্রাজ্যবাদী দেশের খপ্পরে ঠেলে দেয়। ধর্মকেও এরা রক্ষা করতে পারে না। মুখে ধর্মের কথা বললেও এদের ব্যক্তিগত জীবনে অধর্মই বেশী। ধর্মের মানবতার দিককে এরা বিসর্জন দেয়, গোঁড়ামীর দিককেই তুলে ধরে এবং সহজ সরল মানুষকে ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত করে তোলে। ধর্মকেও তারা ব্যবহার করে তাদের শাসন শোষণ বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবে। বুর্জোয়াদের এই শোষণ ও বিদেশীদের সংগে আপোষমূলক নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেই তারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীসহ গোটা জনতার বিরুদ্ধে শুরু করে অপবাদ, কুৎসা, মিথ্যা রটনা, জেল জুলুম, গুলি, অত্যাচারসহ হাজার নির্যাতন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে এর অসংখ্য নজীর। এই বুর্জোয়ারাই রাশিয়ার মহামতি লেনিনকে বলতো জার্মান এজেন্ট বা জার্মানীর চর, চীনে কমরেড মাও সেতুঙকে বলতো ইংরেজ-মার্কিনীদের দালাল, কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে বলতো আমেরিকার এজেন্ট। কিন্তু এসব

www.nagorikpathagar.org

মহান নেতা এবং তাঁদের রাজনৈতিক দলসমূহ সমস্ত অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে সাহসিকতার সংগে নিজ নিজ দেশের শাসক শোষকগোষ্ঠির মোকাবেলা করেছিলেন এবং গোটা দেশ, জাতি ও নিপীড়িত মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যিকার মুক্তির দিকে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, অপবাদকারী ও মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণকারী শাসক শোষকেরাই হলো আস্তাকুঁড়ের সামগ্রী; আর দুর্জয় শক্তির অধিকারী শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ জনতা ও তাদের রাজনৈতিক দল হলো অজেয়-অমর।

এখন প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্টিত বুর্জোয়ারা কিভাবে তাদের শাসন শোষণ বজায় রাখে? তারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী একই দেশে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল,, গোষ্টি ও মহল গড়ে তোলে। অসুবিধায় পড়লে একটির বদলে আর একটিকে ক্ষমতায় বসিয়ে জনসাধারণকে ধোকা দেয়। শাসন-শোষণ চালানোর জন্য বুর্জোয়াদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো সরকারী সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আমলা গোষ্টি। সরকারী সামরিক বাহিনীকে তারা এমন ধাঁচে সাজিয়ে গুছিয়ে গড়ে তোলে, যাতে এর এক দিকে থাকে অফিসারবৃন্দ আর অন্যদিকে থাকে সাধারণ সিপাহী। সামরিক বাহিনীর সাধারণ অফিসারেরা নিজেদের অজ্ঞাতে এমনকি সচেতনভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। আর যখনই সাধারণ অফিসারেরা এটা বুঝতে পারে তখনই সামরিক শৃংখলার নামে কিংবা পদোন্নতির মাধ্যমে তাদের সচেতনতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু এইসব লোভ লালসা ও দমননীতি আজকাল আর খুব বেশী কাজে লাগে না। যুগের বিপ্লবী হাওয়া অফিসারদেরকেও আজ নাড়া দেয়। অন্যদিকে, এক একটি লড়াইয়ে সাধারণ সিপাহীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচাইতে বেশী। তবু যুদ্ধনীতিকে সুকৌশলে তাদের কাছ থেকে দূরে রাখা হয়। কারণ, সাধারণ সিপাহীরা যুদ্ধনীতি আয়ত্ব করে ফেললে অফিসারদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে এই নিয়মেই গড়ে তোলা হয় সামরিক বাহিনী—অফিসারেরা হয় হুকুমের একচেটিয়া মালিক আর সিপাহীরা থাকে শুধু হুকুম তামিল করার জন্য। এ কারণেই পুঁজিবাদী দেশের সামরিক বাহিনীকে বলা হয় 'ভাড়াটিয়া বাহিনী'। এই 'ভাড়াটিয়া বাহিনী' কে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে অর্থাৎ জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও সমাজ জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে একটি ভিন্নজাত ও ভিন্নজগতের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। সমাজ-জীবন ও রাজনীতি বহির্ভূত এই 'ভাড়াটিয়া বাহিনী' কে লেলিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে। 'দেশ গেল' 'স্বাধীনতা গেল' 'শান্তি শৃংখলা গেল' 'দুষ্কৃতিকারী দমন কর' 'ধর্মকে বাঁচাও' 'সামরিক বাহিনীর শৃংখলা ফিরিয়ে আন, ইত্যাদি ধুয়া তুলেই সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হয় শাসক শোষকের পক্ষে—শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে।

কিন্তু সাধারণ সিপাহীরা তো শ্রমিক-কৃষক তথা সাধারণ মানুষেরই সন্তান, ভাই বা আত্মীয়। তাই সাধারণ সিপাহীরা যখন জনগণের অভাব অভিযোগ উপলব্ধি করে, শ্রমিক-কৃষকের আদর্শে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সাধারণ সিপাহী ও সচেতন অফিসারেরা মিলে বুর্জোয়া শাসন শোষণ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তখনই বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া 'সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডারেরা আঁৎকে ওঠে। তখনই শুরু হয় 'দেশ গেল' 'ধর্ম গেল' 'স্বাধীনতা গেল' 'শান্তি-শৃংখলা গেল' সামরিক বাহিনী খোঁড়া হয়ে গেল' ইত্যাদির জিকির। এ সমস্ত জিকিরের আড়ালে সিপাহীদের বিপ্লবী চেতনাকে দাবিয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক যুগেই বুর্জোয়ারা এই একই কথা বলে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই ফল হয়েছে উল্টো। প্রতিবারই বিপ্লবী সিপাহীরা ঠিক সময় ও সুযোগমতোই শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী তখন বিপ্লবী সিপাহীদের বিরুদ্ধে অফিসারদের উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করে। অফিসারেরাও একটা সহজ কথা ভুলে যায় যে সিপাহীদের এ বিদ্রোহ আসলে অফিসারদের বিরুদ্ধে নয়—বরং ঘুণেধরা এই পচা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে; ধনিক শ্রেণীর পুঁজিবাদী শাসন শোষণের বিরুদ্ধেই তাদের ঘৃণা, ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। যে সব অফিসার এই শোষণমূলক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন, ভাড়াটিয়া বাহিনীর সদস্য হিসাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতে অস্বীকার করবেন এবং জনতার কাতারে সামিল হবেন—তাঁদের সংগে সিপাহীদের কোন বিরোধ নেই; বরং বিদ্রোহী অফিসার ও বিদ্রোহী সিপাহীদের যৌথ নেতৃত্বই শ্রমিক-কৃষকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানবে। শ্রমিক-কৃষক-সিপাহী-অফিসারদের যৌথ শক্তিই জনতার শক্তি।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। অফিসার ও সিপাহীদের যৌথ নেতৃত্বেই সেখানে কমাণ্ড-ষ্ট্রাকচার। সেখানে অফিসারদের ন্যায় সিপাহীরাও হয় যুদ্ধনীতিতে পারদর্শী ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন। সেই সামরিক বাহিনী কোন প্রকার লোভ লালসা, মিথ্যা ভণ্ডামী, হুজুগ ও সস্তা শ্লোগানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। এই সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের শ্রমিক-কৃষক তথা জনতার বিরুদ্ধে পরিচালনার কোন প্রশ্নই ওঠে না; বরং যখনই শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে আঘাত লাগার কোন আশংকা দেখা দেয় তখনই এই সেনাবাহিনী এগিয়ে যায় শ্রমিক-কৃষকের পক্ষে—শ্রমিক-কৃষকেরই স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। জনতার সংগে একাত্ম বলে এই সেনাবাহিনীকে বলা হয় 'গণ বাহিনী' বা পিপলস্ আর্মি।

এই গণবাহিনী কিভাবে গড়ে ওঠে? একদিকে বুর্জোয়া শাসন শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবকদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সবচাইতে সচেতন, ত্যাগী, সাহসী, সৎ ও আদর্শবান কর্মীদের সশস্ত্র করে তোলা হয়; অন্যদিকে বুর্জোয়া সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সিপাহী এবং শ্রমিক-কৃষকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ অফিসারদের অতি গোপনে সংগঠিত করা হয় এবং কালক্রমে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক সিপাহী ও আদর্শবাদী অফিসারদের নিয়ে যৌথভাবে গড়ে ওঠে 'গণবাহিনী'। এই গণবাহিনী বুর্জোয়া শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে; শ্রমিক-কৃষকসহ জনসাধারণের সকল অংশের সংগে মিশে যায় এবং বিভিন্ন ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও গণসংগঠনের মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাংখাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রমিক এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে, গ্রামের ক্ষেত মজুর ও কৃষকদের মধ্যে, শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-ব্যবসায়ী-মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মধ্যে বুর্জোয়া-শাসন শোষণ বিরোধী ধ্যান-ধারণা ও লড়াই গড়ে তোলে; বিদেশী হামলার বিরুদ্ধে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে; সকল প্রকার অসামাজিক কাজ যথা খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারী, অসৎব্যবসায়ী, বিদেশী চরদের অনুপ্রবেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনগণকে উৎসাহিত ও সংঘবদ্ধ করে; ক্ষেত মজুর ও কৃষকদের ধনিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং শোষক সরকারের সকল শোষণনীতি ও গণনির্যাতনের বিরুদ্ধে সাহস ও দৃঢ়তার সংগে রুখে দাঁড়ায়। এমনি ধরণের সচেতন রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনায় মধ্য দিয়েই শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও বিপ্লবী সিপাহীদের (বিপ্লবী অফিসারসহ) নিয়ে গড়ে ওঠে সরকারী সশস্ত্র হামলা মোকাবেলার উপযোগী শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী—গণবাহিনী। আদর্শ দিয়ে গড়া এই গণবাহিনী যে কতো শক্তিশালী তার প্রমাণ রাশিয়ার 'লালফৌজ', চীনের 'গণবাহিনী' ও 'লালফৌজ', ভিয়েতনামের 'গণফৌজ', কম্বোডিয়ার 'খেমার রুজ' বাহিনী, লাওসের 'প্যাথেট লাও' বাহিনী প্রভৃতি। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 'বাহিনী' গণবাহিনীর কাছে হার মানতে বাধ্য। কারণ ভাড়াটিয়া বাহিনীর সৈন্য যুদ্ধ করে বেতনের লোভে, আর গণবাহিনীর সৈন্য যুদ্ধ করে সঠিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। ভাড়াটিয়া বাহিনীর সৈন্যরা অনেক সময় প্রাণ বাঁচানোর জন্য আত্মসমর্পন করে; আর গণবাহিনীর সৈন্য প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে স্বদেশভূমিকে—শ্রমিক-কৃষক-শোষিত জনতাকে। গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী গণবাহিনীর একজন গেরিলা যোদ্ধা ভাড়াটিয়া বাহিনীর ১৮ জন যোদ্ধার সমতুল্য। এ হিসাব থেকেই সহজে বোঝা যায় 'গণবাহিনী' ও 'ভাড়াটিয়া বাহিনী'র মধ্যে গুণগত পার্থক্য কতটুকু।

বুর্জোয়াদের সামরিক বাহিনীর মতো তাদের পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ফাটল ধরতে বাধ্য। কারণ এ কথা প্রমাণিত সত্য যে বুর্জোয়ারা আজকের পৃথিবীতে দেশ শাসনের অযোগ্য—দেশ ও জাতিকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করতে ব্যর্থ। উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়ারা তাদের নিজ নিজ দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের দিকে পরিচালনা করেছে এ কথা সত্য—কিন্তু আজ বুর্জোয়াদের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিকাশের যুগ। বুর্জোয়া শাসকরা আজ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রসহ জনতার জাগরনকে ভয় করে; কারণ জনতার জাগরণ স্বাভাবিকভাবেই তাদের পতন ঘটায় এবং শ্রমিক-কৃষক তথা জনতার রাজত্ব কায়েম করে।

জনসাধারণের সঠিক মুক্তির পথে বুর্জোয়ারা এক বিরাট বাধা। এই বাধাকে হটিয়ে যদি শ্রমিক-কৃষক-সিপাহী-ছাত্র অর্থাৎ জনতার যৌথ রাজনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানো না যায়, তাহলে ধনিক

www.nagorikpathagar.org

সিপাহী বিপ্লবকে এগিয়ে নিন

বাংলাদেশ বিপ্লবী সৈনিক পরিষদের জরুরী বিবৃতি

বিপ্লবী সৈনিক বন্ধুগণ,

বিগত জীবনের অপরিমেয় ব্যথা-আঘাত, দুঃখ-লাঞ্চনা, ও স্তুপিকৃত গ্লানি নিয়েও প্রিয় মাতৃভূমির চরম বিপদের দিনে আমরা সিপাহী বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়েছি এবং অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। জনতার হাতে হাত মিলিয়ে দেশকে কলুষমুক্ত ও বিপদমুক্ত করার জন্য বজ্রকঠিন শপথ নিয়েছি। আমাদের এই বিপ্লব গরীব সিপাহীদের এবং গরীব মানুষের মুক্তির বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে চাই গরীব সিপাহী, সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা মানুষের ভবিষ্যত। আমাদের এই বিপ্লবের সাথে ষড়যন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো বিশেষ ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠির স্বার্থে আমরা আন্দোলনে নামিনি। এই বিপ্লবের সাথে জড়িত রয়েছে আমাদের ন্যায় গরীব সিপাহী সমাজের ভবিষ্যত ভাগ্য ও এই দেশের শোষিত শ্রমজীবি মানুষের ভবিষ্যত।

বন্ধুগণ,

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং সিপাহী বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে আমাদেরকে আরো ক্ষিপ্র, সুশৃংখল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। আরো উদ্দাম গতিতে বিপ্লবের ধারা প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বন্ধুগণ, এই বিপ্লব আমাদের জীবন-মরণের বিপ্লব, এই বিপ্লবে জড়িত রয়েছে দেশের সকল শোষিত মেহনতী মানুষের ভবিষ্যত। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই আমাদের গরীব পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের ভাগ্যকে নির্ণয় করতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়েছি, কোন ষড়যন্ত্রে নয়।

সাথীরা,

বহু আমলা ও কুচক্রী অফিসার নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য বর্তমানে আপনাদের সাথে মেশার এবং আপনাদের বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করার চেষ্টা করবে। এদের সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। এরা আপনাদের সর্বনাশ করার জন্য সক্রিয় হয়েছে।

সিপাহী বন্ধুগণ,

আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। কারণ, আমরা ন্যায়ের জন্য লড়ছি, এবং দেশের শোষিত মেহনতি মানুষ আমাদের সাথে রয়েছে। জনগণের সাথে এক হয়ে যদি আমরা সংগ্রাম করে যেতে পারি, তাহলে অনতিকালের মধ্যেই দেশকে পুঁজিবাদ ও বিদেশী শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারবো। বন্ধুগণ, *স্বীয় নিয়ন্ত্রণে ও নেতৃত্বে সুশৃংখলার মধ্য দিয়ে প্রতিটি ইউনিটে আপনারা বিপ্লবী সৈনিক পরিষদ অবিলম্বে গঠণ করুণ*। সুবেদার মেজর পর্যন্ত এই পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন। কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশন হতে এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করতে হবে। কোনো বক্তব্য রাখতে হলে তার জন্য পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের কর্মসূচীঃ (১) সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাথে সাথে অফিসার ও সিপাহীদের মধ্যকার পার্থক্য দূর করতে হবে। (২) আজ হতে অফিসারদের ব্যাটমেন প্রথা বন্ধ করতে হবে। (৩) কোনো জেসিও সাহেবকে যদি কুচক্রী অফিসারদের সাথে সহযোগীতা করতে দেখা যায়, তাহলে তাকে বিপ্লব-বিরোধী বলে বিবেচনা করা হবে। (৪) বিপ্লবী সৈনিক পরিষদের উপরোল্লিখিত দাবীগুলো পূরণ না করা পর্যন্ত কোনো সাধারণ সৈনিক অস্ত্র জমা দেবেন না।

সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ

তারিখ: ৮-১১-৭৫ ইং *বিপ্লবী সৈনিক পরিষদ জিন্দাবাদ*

দুনিয়ার মজদুর এক হও।

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণীর পুঁজিবাদী শোষণ চলতেই থাকবে এবং বিদেশী শক্তিসমূহের অশুভ পাঁয়তারাও শেষ হবে না। বুর্জোয়ারা তাদের অস্তিত্বের জন্য বিদেশী শক্তিসমূহের সংগে কখনো আপোষ কখনো দ্বন্দ্বের ভাব দেখায়— কারণ এটা না করলে তো তাদের শাসনের অবসান ঘটবে।

বুর্জোয়া শাসনের আরও কয়েকটি দিক হলো বুর্জোয়া আইন-আদালত, বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা, বুর্জোয়া রীতিনীতি, বুর্জোয়া আচার-ব্যবহার, বুর্জোয়া সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও বুর্জোয়া ধ্যানধারণা। বুর্জোয়া শাসনের পতনের সংগে সংগেই গড়ে উঠতে হবে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, উৎপাদননীতি, উৎপাদন পদ্ধতি, বন্টন ব্যবস্থা, গণপুলিশ, গণআদালত, গণমুখী শাসন ব্যবস্থা, গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, গণমুখী অর্থনীতি, গণমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। বুর্জোয়াদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তে গড়ে উঠবে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি জনতার উপযোগী যৌথ চিন্তাধারা। সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে রুচি-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য-শিল্প, সৌন্দর্যবোধ, সমাজজীবন, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, যা বুর্জোয়া জীবন ধারা ও সমাজজীবন থেকে অনেক বেশী উন্নতমানের। সেই সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে তোলার জন্য বাঙলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী-ব্যবসায়ী-সিপাহী-তথা সমগ্র জনতা আজ বহু বাস্তব ও কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বুর্জোয়ারা তাদের মৃত্যুঘণ্টা নিজেরাই শুনতে পেয়েছে। গণবাহিনী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ জনতার সক্রিয় সহযোগিতার ফলস্বরূপ ৭ই নভেম্বরের (১৯৭৫) ঐতিহাসিক সিপাহী অভ্যুত্থান সেই শুভ ইংগিত বহন করে। "ভারত-রাশিয়া ও আমেরিকা, বিশেষ করে ভারতের আগ্রাসন নীতির হাত থেকে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার বলিষ্ঠ প্রয়াস ছিলো ৭ই নভেম্বর। ৭ই নভেম্বর সামরিক বাহিনী এবং শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছে—তার ফলে বুর্জোয়া শাসক ও শোষক শ্রেণী আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'আন্দোলন বা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতার একদিন, সাধারণ অবস্থায় কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার সমান'— এই মহামূল্যবান উক্তিটি আর একবার প্রমাণিত হলো ৭ই নভেম্বর তারিখে। ৭ই নভেম্বরের পরপরই গোটা বুর্জোয়া শ্রেণী, সুবিধাবাদী মহল, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি ও প্রতিবিপ্লবীরা দল, মত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে এক ফ্রণ্টে জমা হয়েছে। তাদের পেছনে মদত যোগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। তাই দেখা যাচ্ছে আপোষের ফর্মুলা হাতে নিয়ে এই সম্মিলিত বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির প্রতিনিধিরা ছুটাছুটি করছে দিল্লী, ওয়াশিংটন ও মস্কোয়। তারা ধনিক শ্রেণীর পুঁজিবাদী শাসনশোষণকে ফিরিয়ে রাখার জন্য বক্তৃতা, বিবৃতি, উপদেশবাণী, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ, প্রচারপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জঘন্য কুৎসা ও অপবাদ রটনা করছে এবং তাদের শ্রেণীগত সুবিধাবাদী স্বার্থকেই তুলে ধরছে গোটা জাতি ও গোটা দুনিয়ার সামনে তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে যে তারা একদিকে এবং গোটা বিপ্লবী জনতা অন্যদিকে।

এ লড়াইয়ে কে জিতবে? এ রাজনৈতিক লড়াই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠি বিশেষের বিরুদ্ধে নয় বা প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করার জন্যও নয়। এ রাজনৈতিক লড়াই মূলতঃ ধনিক গোষ্ঠির পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধ জনতার শোষণ মুক্তির জন্য দেশীয় শোষক ও বিদেশী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে। এ লড়াই ঘুণেধরা, ন্যায়নীতিহীন, পচা, কুসংস্কারপূর্ণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সমতা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিটি মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে একটি শোষণহীন, সমৃদ্ধিশালী ও উন্নয়নমুখী সমাজব্যবস্থা কায়েম করার জন্যই এ লড়াই। সকল বিদেশী হামলা প্রতিহত করা এবং সকল বিদেশী প্রভাবকে নির্মূল করার জন্যই এই রাজনৈতিক লড়াই। লড়াইয়ে কে শত্রু কে মিত্র তা যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো—কে শোষণের পক্ষে আর কে শোষণের বিরুদ্ধে। কাজেকর্মে, চিন্তাধারায় যে ব্যক্তিই বুর্জোয়া শাসনকে সমর্থন করবে এবং বিদেশী শক্তিসমূহের সংগে আঁতাত করবে—সেই জনতার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর যে ব্যক্তিই কাজেকর্মে চিন্তাধারায় মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে—সেব্যক্তিই বিপ্লবী জনতার বন্ধু।

মহামতি লেনিনের মতে, প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই এমন এক সময় আসে, যখন স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া গোষ্ঠি ও তাদের পদলেহীরা জড়ো হয় একদিকে আর বিপরীতে থাকে লক্ষ কোটি নিপীড়িত জনতা ও তাদের রাজ-নৈতিক দল।

কমরেড মাও সে তুঙ-এর মতে শাষক-শোষকেরা যখন অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে আক্রমণ চালায়, তখন মনে করতে হবে যে নিপীড়িত জনতার রাজনৈতিক দল সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে।

www.nagorikpathagar.org

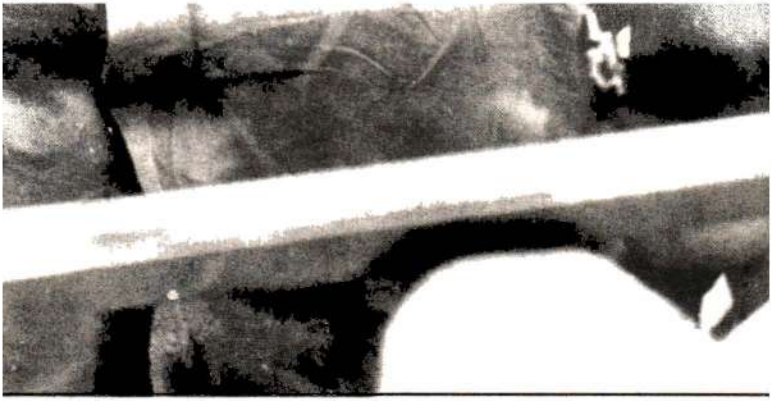

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সিপাহী-জনতার বিপ্লব। সিপাহীরা গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে (x-চিহ্নযুক্ত)। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে ঘিরে উৎফুল্ল সিপাহীরা। ফটো ঃ খালেদ হায়দার

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সেনা সদস্যদের [illegible] [illegible]

www.nagorikpathagar.org

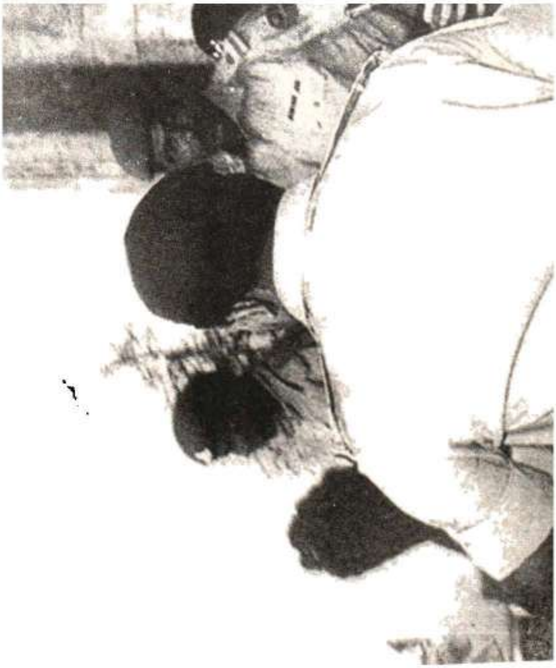

www.nagorikpathagar.org

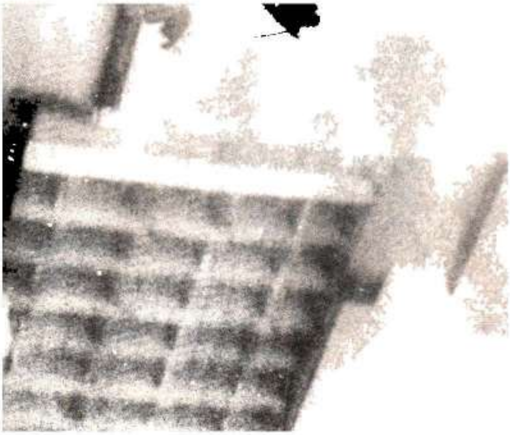

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

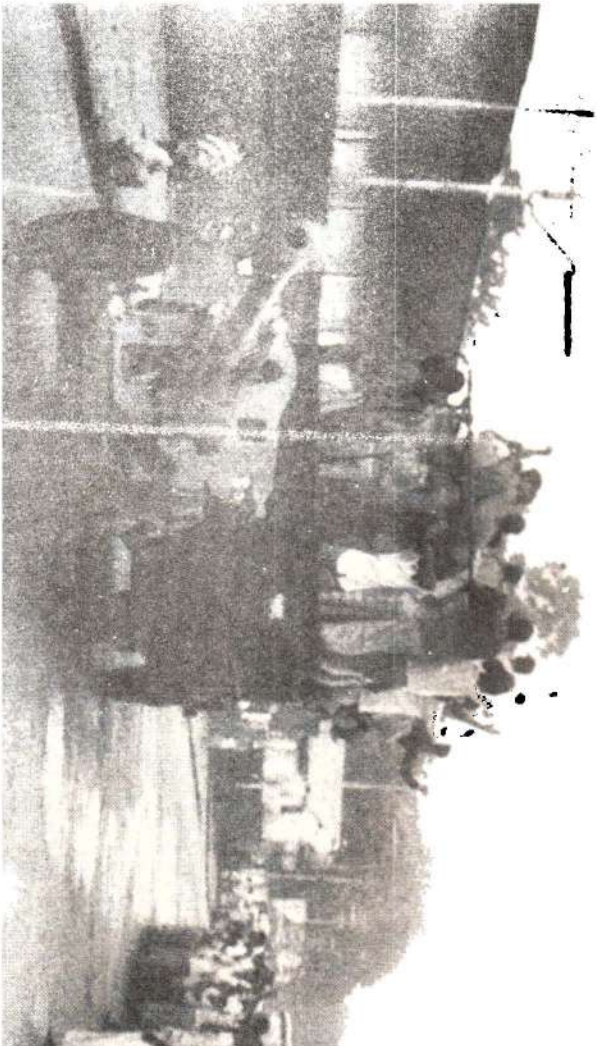

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

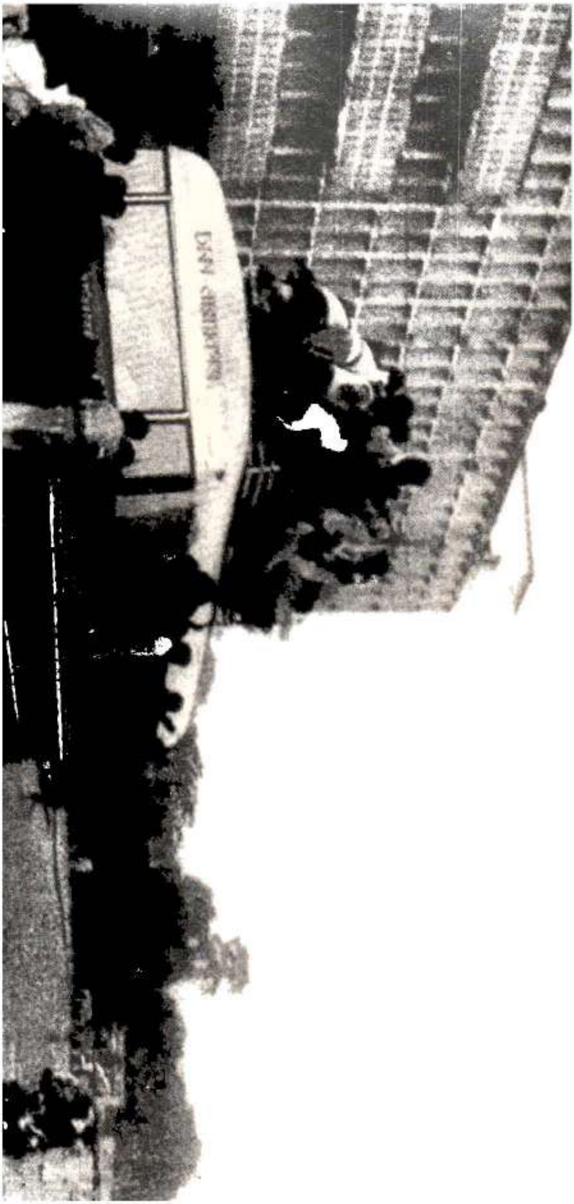

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

দৈনিক বাংলা

আমাদের স্বাধীনতা রাখবোই রাখবো

জিয়ার নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বি

'আমি জিয়া বলছি'

প্রধান সামরিক শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে জিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ

৭ নভেম্বর ১৯৭৫। দৈনিক বাংলার টেলিগ্রাম সংখ্যা।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তাসরীনা বিনতে মুজাহিদ

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com